বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশে সংবাদ-সাময়িকপত্রের ভূমিকা ঃ ১৯০৬-৪৭

পি-এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ

400579

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
400579

শামসুন নাহার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশে সংবাদ-সাময়িকপত্রের ভূমিকা ঃ ১৯০৬-৪৭

পি-এইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভ

শামসুন নাহার

400579

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
প্রফেসর ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ

আগস্ট, ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, 'বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশে সংবাদ-সাময়িকপত্রের ভূমিকা ১৯০৬-৪৭' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণার ফল। জানা মতে, এ শিরোনামে ইতিপূর্বে আর কেউ গবেষণা করেননি। পি-এইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা অথবা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

আগস্ট, ২০০২

শামসুন নাহার

400579

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীর উদ্দেশ্যে শামসুন নাহার-এর দাখিলকৃত 'বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশে সংবাদ-সাময়িকপত্রের ভূমিকা ১৯০৬-৪৭' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে তাঁর এককভাবে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানা মতে এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ ইতিপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রীর উদ্দেশ্যে জমা দেয়া হয়নি। অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পান্ডুলিপি আমি পাঠ করেছি এবং তা পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য জমা দেয়ার সুপারিশ করছি।

২৬/০৮/০২

আগস্ট, ২০০২

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
প্রফেসর
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
তত্ত্বাবধায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাঁর অকুণ্ঠ ও সর্বক্ষণিক পরিশ্রমে এই গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে, তিনি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক, প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। তিনি আমার অভিসন্দর্ভের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং পরিমার্জনে আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। মূল্যবান এবং যথাযথ পরামর্শ দিয়ে আমার অস্পষ্ট ধারণাকে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ করেছেন। শ্রদ্ধেয় প্রফেসর এর কাছে আমার ঋণ স্বীকার করছি। তাঁর প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ।

আমার গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য প্রতিনিয়ত যাঁর সহযোগিতা ও সুপরামর্শ লাভ করেছি তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. এ এফ সালাহউদ্দীন আহমদ। তাঁর কাছে আমার ঋণ নিরবধি। প্রফেসর হামিদা খানম এর আন্তরিক সহযোগিতা ও পরামর্শ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. শওকত আরা হোসেন এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। আমি তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞ।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম-এর কাছেও আমার ঋণ স্বীকার করছি।

আমার গবেষণা কাজের উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, আইবিএস গ্রন্থাগার, রাজশাহী সরকারী কলেজ গ্রন্থাগার, রাজশাহী পুরাতন পাবলিক গ্রন্থাগার, রাজশাহী গোদাগাড়ীর পানিহার গ্রন্থগার, মাদার বক্স হল গ্রন্থাগার, দিনাজপুরের খাজা নাজিমুদ্দীন মুসলিম হল ও গ্রন্থাগার, নওগাঁর চাখরাইলের রোজোয়ান লাইব্রেরী, সিরাজগঞ্জের পাবলিক লাইব্রেরী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'বাণীকুঞ্জ' বাড়ীর ব্যক্তিগত পাঠাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল য় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাইক্রোফিল্ম শাখা, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, ড. সালাহউদ্দীন আহমদ এর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী, কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কলকাতা বঙ্গীয় পরিষদ গ্রন্থাগার প্রভৃতি। গ্রন্থগারসমূহের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল।

Dhaka University Institutional Repository

আমার শিক্ষক মরহুম মুহম্মদ আবদুল বারী গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন করতে জোর তাগিদ দিয়েছিলেন। আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের আমার সকল শিক্ষক ও সহকর্মীদের জানাই কৃতজ্ঞতা।

আমার শাশুড়ী যিনি এ গবেষণাকার্য চলাকালীন সময়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন, আজ তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

গবেষণাকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য শিক্ষাছুটি মঞ্জুর করায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচিছ।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে আমাকে ফেলোশীপ প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সকল শিক্ষক এবং কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানাই।

গবেষণাকার্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাকর্মের তথ্য সরবরাহ করে 'উষালোকে" পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ শাকের উল্লাহ্ আমাকে উপকৃত করেছেন। আমি তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ।

আমার মা সুরাইয়া রহমান চৌধুরী সর্বক্ষণিক ধৈর্য্য সহকারে গবেষণাকার্য্যটি সম্পন্ন করার জোর তাগিদ দিয়েছেন।

আমার সহধর্মী শেখ শরিফুল ইসলাম এ ব্যাপারে সবসময় পাশে থেকে প্রেরণা জুগিয়েছেন। এছাড়া আমার ছোট ভাই খোকন বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন।

আমি ধন্যবাদ জানাচিছ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের সেকশন অফিসার মো. এনামুল হক কে। তিনি আমার অভিসন্দর্ভটি কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছেন।

আগস্ট, ২০০২

শামসুন নাহার
সহকারী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

আঠার শতকের শেষ নাগাদ মুসলমান শাসনের পতনের পর হতে মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় শুরু হয়েছিল, পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসন ও ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে অনীহার ফলে তা মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করেছিল। বাঙলার মুসলমান সাংবাদিকগণ স্বসমাজের দুর্দশা পত্রিকাগুলিতে প্রকাশের মাধ্যমে সমাজের উন্নতি আনয়নের লক্ষে সংবাদপত্র প্রকাশনার কাজে এগিয়ে আসেন। স্বসমাজের ধর্ম, শিক্ষা, অর্থনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে নিয়মিত লেখা প্রকাশিত করে এ ব্যাপারে অধঃপতিত সমাজকে উজ্জীবিত করতে প্রয়াসী হন। সংবাদপত্রকে তাঁরা সমাজসেবার হাতিয়ার মনে করেছিলেন।

রাজনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর মুসলমানদের সচেতন করে তোলার ব্যাপারে সংবাদপত্র প্রকাশকগণ রাজনীতি বিষয়ক সম্পাদকীয় অভিমত, বিভিন্ন লেখকদের রচিত রাজনীতি-সংক্রান্ত প্রবন্ধ, কবিতা, সচিত্র প্রতিবেদন প্রভৃতি প্রকাশ ছাড়াও ১৯০৬-৪৭ সময়কালের চলতি রাজনৈতিক ঘটনাবলী প্রকাশের দ্বারা 'পাকিস্তান' এর পক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। 'বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশে সংবাদ-সাময়িকপত্রের ভূমিকা ঃ ১৯০৬-৪৭" - অভিসন্দর্ভে এ সম্পর্কিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা ঃ	১
প্রথম অধ্যায় ঃ	৫-৪১
বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ ঃ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ	
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	৪২-৯৭
সাংবাদিকতায় বাঙালি মুসলমান	
তৃতীয় অধ্যায় ঃ	৯৮-১৪৫
মুসলমান সাংবাদিকদের সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা	
চতুর্থ অধ্যায় ঃ	১৪৬-১৬৮
রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা ঃ ১৯০৬-৪০ খৃঃ পর্যন্ত	
পঞ্চম অধ্যায় ঃ	১৬৯-১৮৯
পাকিস্তান আন্দোলনে সংবাদপত্রের ভূমিকা ঃ ১৯৪০-৪৭ খৃঃ পর্যন্ত	
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ	১৯০-১৯৪
উপসংহার	
গ্রন্থপঞ্জী	১৯৫-২০৭

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মুসলমান সম্পাদিত প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩১ সালে কোলকাতা থেকে। পত্রিকাটির নাম ছিল 'সমাচার সভা রাজেন্দ্র', এর সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন শেখ আলিমুল্লাহ। এটি বাংলা এবং ফার্সী এই দুই ভাষাতেই প্রকাশিত হত।[১] তবে উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে নিয়মিতভাবে মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। বস্তুত উনিশ শতকের শেষের দিকে যে সকল মুসলিম সম্পাদিত প্রত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে তার মধ্যে সমকালীন মুসলমানদের সামগ্রিক অবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায়।

গত কয়েক দশকে মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার ইতিহাস সম্পর্কে যে সব গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, কাজী আবদুল মান্নান *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* (ঢাকাঃ ইন্ডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৬), আনিসুজ্জামান *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র ১৮৩১-১৯৩০*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯) এবং মুস্তফা নূরউল ইসলাম *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত ১৯০১-১৯৩০*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭)।

আনিসুজ্জামানের গ্রন্থে একশত বছরে প্রকাশিত মুসলমান সম্পাদিত প্রায় দেড়শত সাময়িকপত্রের ইতিহাস সংকলিত হয়েছে। এতে পত্র-পত্রিকাগুলির পরিচিতি, সূচিপত্র এবং উল্লেখযোগ্য রচনার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হয়েছে। মুস্তফা নূরউল ইসলামের গ্রন্থটিতে ১৯০১ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত মুসলমান সম্পাদিত ৪১টি সংবাদপত্রে শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম, আত্মচেতনাবোধ ও আত্মজাগরণ, মুসলিম বিশ্ব, রাজনীতি, হিন্দু-মুসলমান, অর্থনীতি, ভাষা ও সাহিত্য এবং বিবিধ বিষয়ে বাংলার মুসলিম জনমতের সাধারণ প্রতিফলন দেখানো হয়েছে। পরবর্তীকালে লায়লা জামান 'সওগাত' পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা ১৯১৮-৫০, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯) গ্রন্থে মুসলমানদের সমাজ ভাবনা ও সাহিত্য চিন্তার একটা উল্লেখযোগ্য বাহনরূপে 'সওগাত' পত্রিকা যে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে সে বিষয় গবেষনার দ্বারা তুলে ধরেছেন। অতঃপর মুহম্মদ নূরুল কাইয়ুম বাংলার মুসলিম জাগরণে সংবাদপত্রের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভে 'Role of Bengali Muslim Press in Awakening the Muslims of Bengal" 1900-1940 - এ বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে, বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম নারীমুক্তি আন্দোলনে এবং অলস, নির্লিপ্ত, উৎসাহহীন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মামলা-মোকদ্দমায় লিপ্ত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ভগ্নদশাগ্রস্ত মুসলমান সমাজকে শক্তিশালী, উন্নত ও জাগ্রত করে তোলার ক্ষেত্রে বাংলার মুসলিম সংবাদপত্র কি ভূমিকা পালন করেছিল - তা বিস্তারিতভাবে ঐতিহাসিক পটভূমিসহ আলোচনা করেছেন। এর পর পত্র-পত্রিকার উপর ভিত্তি করে শাহজাহান মনির যে গবেষণা কর্ম করেছেন তার শিরোনাম বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা (১৯১৯-১৯৪০), (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)। এই গ্রন্থে তিনি দু'মহাযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ,অর্থনীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বাঙালি মুসলমান লেখকদের চিন্তাধারার পরিচয় তুলে ধরেছেন। এরপর 'সাম্যবাদী' পত্রিকার উপর ভিত্তি করে গবেষণা করেছেন সুনীল কান্তি দে। তাঁর গ্রন্থের নাম মুসলিম সমাজ চিত্রঃ সাম্যবাদী সাময়িকপত্রে (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪)। *সাম্যবাদী* পত্রিকায় মুসলিম সমাজ ও ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস বিষয়ে যে চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছিল এই গ্রন্থে সেগুলি তিনি তুলে ধরেছেন। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ মুসলিম সম্পাদিত সাময়িকপত্রে ধর্ম ও সমাজ চিন্তা (১৯০১-১৯৪৭) এই শিরোনামে পরবর্তীতে একটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন। ১৯০১-১৯৪৭ সালের মধ্যে মুসলমান সম্পাদিত সাময়িকপত্রে মুসলিম মনীষীগণ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের চিন্তাধারার যে ফসল রেখে গিয়েছেন তার মধ্যে ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে এই গ্রন্থে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশ হয়েছে ১৯৯৫ সালে। এই সকল থিসিস ও গ্রন্থে বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনা উন্মেষে সংবাদপত্রে ভূমিকা সম্পর্কে কোন আলোচনা নাই। অন্যদিকে, মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার উপর অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। এসব গ্রন্থের লেখক উপাত্ত হিসাবে সংবাদপত্র ব্যবহার করেন নাই। আমার গবেষণার সময়কাল ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের বিভক্তির মাধ্যমে দু'টি স্বাধীন দেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত ব্যপ্ত। যেহেতু সংবাদপত্রের উপর ভিত্তি করে উক্ত বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোন ব্যাপক ও সুস্পষ্ট গবেষণা হয়নি এ অভিসন্দর্ভে সে অভাব পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

আমার গবেষণার শিরোনামঃ "বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশে সংবাদ-সাময়িকপত্রের ভূমিকা ঃ ১৯০৬-৪৭"। আলোচ্য সময় মুসলমান সম্প্রদায় একটি স্বতন্ত্র পরিচয় লাভের জন্য সচেষ্ট হয়। আর সেই সময়ের মুসলমান সম্পাদিত অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা তাদের এই চিন্তা-চেতনা গঠন ও বিকাশে তৎপর হয়। তাই এই সময়কালের পত্র-পত্রিকাগুলি পাঠ করলে এই দুই ভূমিকা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। গবেষণাকর্মটি বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার বর্ণনা ও ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে রচিত, যা পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় বক্তব্যের পটভূমি তুলে ধরেছে। আঠার শতকের শেষের দিকে মুসলিম রাজশক্তির পতনের পর মুসলমানদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় শুরু হয়েছিল। এ সময় মুসলমানগণ ইংরেজ শাসকদের স্বাগত জানাতে ও ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়নি এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ব্যাপারেও তারা অনীহা প্রকাশ করে এসেছিল। অপর দিকে হিন্দুগণ নুতন শাসকদের বরণ ও ইংরেজী শিক্ষাকে গ্রহণ করে চাকুরী এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভের দ্বারা নিজেদের ভাগ্যের উন্নতি সাধন করেছিল। ফলে মুসলমানদের এই দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। পরবর্তীকালে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বৃটিশরাজ ১৯০৫ সালে বাংলাকে বিভক্ত করলে কংগ্রেস ও হিন্দু সম্প্রদায় এর তীব্র বিরোধিতা করে । এই ঘটনা বাংলার মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করে তোলে। ১৯০৬ সালে ঢাকায় 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' নামে একটি নুতন রাজনৈতিক দল গঠনের মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। পরবর্তীকালে একটি পৃথক আবাসভূমি অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তা পূর্ণতা লাভ করে। এই অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশনার ইতিহাস তুলে ধরে, এ পথ অনুসরণ করে বাঙালি মুসলমান সমাজের যে সকল ব্যক্তি সংবাদ-সাময়িক পত্র প্রকাশের ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত প্রয়াস চালিয়েছিলেন তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

স্বসমাজের ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে নিয়মিত লেখনীর দ্বারা মুসলমান সাংবাদিকগণ অধঃপতিত সমাজকে উজ্জীবিত করতে কিরূপ প্রয়াসী হয়েছিল সে সম্বন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অধিকাংশ পত্র-পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল চলমান রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচনার দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আহবান জানানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে বঙ্গীয় মুসলমানদের সচেতন করে তোলার ব্যাপারে সংবাদপত্রগুলি তৎপর হয়েছিল। সংবাদ-সাময়িক পত্রগুলি সেই সময় চলতি রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিষয়ে লেখালেখি করতো এবং এ ব্যাপারে মুসলমানদের কি করণীয় সে সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করা হতো। ১৯০৬-৪০ এর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারে সংবাদপত্রগুলি কি ভূমিকা পালন করেছিল তা চতুর্থ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকার সম্পাদকগণ স্বসমাজের রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই দেখা যায় পাকিস্তান আন্দোলনে পত্র-পত্রিকাগুলির ভূমিকা ছিল অগ্রণী। এক্ষেত্রে সাপ্তাহিক,

Dhaka University Institutional Repository

মাসিক, পাক্ষিক, বার্ষিক প্রভৃতি সংবাদপত্র মুসলমানদের জন্য স্বাধীন বাসভূমি স্থাপনের দাবীকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কংগ্রেস সমর্থিত পত্র-পত্রিকার বিরুদ্ধে যে অঘোষিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল সে সম্পর্কে পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারে সংবাদপত্র যে অনন্য অবদান রেখেছিল এবং যে আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষে 'পাকিস্তান' নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম লাভ করেছিল সে সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে কি ভূমিকা রেখেছিল তা আমার গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তু।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ ঃ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়েই ভারতের ইতিহাসে ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনা হয়।[১] ১৭৬৫ সালে নামেমাত্র মুঘল সম্রাট শাহ আলমের নিকট থেকে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করলে রবার্ট ক্লাইভ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, যাতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় নবাবের হাতে। ফলে, রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি পায় এবং জনগণের অর্থনৈতিক ভগ্নদশা শুরু হয়।[২] মূলতঃ ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত সময়কালে বাঙলার নবাব বানানো এবং অপসারনের ব্যবসায় কোম্পানী ও এর কর্মচারীরা কমপক্ষে ৫,২৬৬,১৬৬ পাউন্ড লাভ করেছিল যার পর্যাপ্ত অংশই সম্পদ অথবা অন্য কোন আকারে ইংল্যান্ডে পাঠানো হত।[৩] দেশীয় সম্পদ শোষণ করে তা ক্রমাগত ইংল্যান্ডে প্রেরণ করা হয়। এই সম্পদ নিঃসরণ বা 'Drain of Wealth' দেশে মারাত্মক অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করে। কারণ সেই তুলনায় বাংলায় সমপরিমাণ অর্থ বা সম্পদ ফেরত আসতো না।[৪]

১৮৩৫ সালে 'পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাপ্রদান প্রাচ্য ভাষায় নয়, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে করতে হবে'- বৃটিশ সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্ন রকম লক্ষ্য করা গিয়েছিল।[৫] যেহেতু হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য ভারতে বৃটিশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ছিল নেহাত প্রভু পরিবর্তন। তাই, নতুন বৃটিশ প্রভুদের প্রবর্তিত ভাষা ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বাভাবিকভাবেই 'শুভ সূচনা' বলে তারা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু দেশের অতীত শাসক হিসেবে গর্বিত মুসলমান সম্প্রদায় এই পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেছিল। এর ফলে, নতুন শাসকদের অধীনে হিন্দু সম্প্রদায় সব রকমের সরকারী চাকুরীতে নিজেদের নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এতে তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি তেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই। কিন্তু মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় দিক থেকে ফার্সী ভাষায় শিক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল।[৬] তাছাড়া ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যাপকহারে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হবার সম্ভাবনা নিহিত- এই ধারণার বশবর্তীতে মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষাকে ভয়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিল।[৭] ১৯০৭ সালে ভারত সরকাররের এক শিক্ষা রিপোর্টে মন্তব্য

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছিল যে, 'The traditions of the Muhammadans do not impel them towards English education', রিপোর্টটিতে মুসলমানদের মনোভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে : "The difficulties which beset the problem of Muhammadan education in India are due in great measure to the traditions and character of the Muhammadans themselves. The British Government instituted English education in India. The Hindus embraced it eagerly, but the Muhammadans stood aloof; and the English education offered by the ordinary University college and high school is still regarded by a great number of them with considerable suspicion.[৮]

১৮৩৭ সালে উচ্চ এবং নিম্ন আদালতসমূহে ফার্সীর ব্যবহার বন্ধ করে সেগুলিতে ইংরেজী এবং দেশীয় ভাষা প্রবর্তন করা হয়।[৯] যেহেতু হিন্দু সম্প্রদায় প্রথম থেকেই হিন্দু কলেজ হতে ইংরেজী ভাষায় ব্যাপক দক্ষতা লাভ করেছিল সেই হেতু সরকারী ভাষার এই পরিবর্তন তাদের জন্য লাভজনক হয়েছিল। অপরদিকে কলিকাতা মাদ্রাসা ছাড়া মুসলমানদের জন্য আর কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। যেখানে তারা ইংরেজী শিক্ষা লাভ করতে পারে। এমনকি এই প্রতিষ্ঠানেও ১৮২৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত কোন ইংরেজী ক্লাশ খোলা হয়নি।[১০]

ফলে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র পরিবর্তন ঘটেছিল। বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করে হিন্দুরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উন্নতি লাভ করে এবং সম্পদ ও অবস্থানগত দিক দিয়ে বলীয়ান হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে বিমুখতার কারণে মুসলমানরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে পশ্চাতে পড়ে যায়।[১১] বৃটিশ সরকারের প্রতি রুষ্ট মুসলমানগণ তাদের সন্তানদের সরকারী ও মিশনারী স্কুলগুলিতে শিক্ষা লাভের জন্য পাঠায় নাই। দেশীয় মক্তব ও মাদ্রাসাগুলিতে সন্তানদের প্রেরণ করায় ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলিতে মুসলমানদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম ছিল।[১২] যখন হিন্দু যুবকেরা একটিমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা অর্জনের পশ্চাতে সকল উদ্যম ব্যয়ে যত্নশীল, সেখানে মুসলমান যুবকেরা ধর্ম ভিত্তিক ও বৈষয়িক- এই দুই জাতীয় শিক্ষা অর্জনের জন্য চেষ্টা করে।[১৩] পরবর্তীকালে, 'ইংরেজীতে দক্ষতার উপর ভিত্তি করে সকল ভারতীয় নাগরিক বিচার বিভাগে চাকরী পাবার যোগ্য' - এই নীতি বৃটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত হলে বাঙলার বিচার বিভাগীয় চাকরীতে প্রাধান্য পেতে মুসলমানরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়। ১৮৫৬ সালে বাঙলার বিচার ও রাজস্ব বিভাগে পঞ্চাশরুপি এবং তদুর্দ্ধে বেতনভুক্ত তালিকাভুক্ত ৩৬৬ জন কর্মচারীর মধ্যে মুসলমান সংখ্যাছিল মাত্র ৫৪ জন।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, ভারতের মোট মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক ছিল অবিভক্ত বাংলার অধিবাসী - যারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন করে যা তাদের পৃথক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সত্তা বজায় রাখে। স্থানীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ জনসাধারণের ধর্মান্তরের ফলে দেশজ মুসলমানদের সঙ্গে বহিরাগত মুসলমান যারা আরব, পারস্য, তুরস্ক, আফগানিস্তান প্রভৃতি স্থান থেকে ভাগ্য অন্বেষণে বাংলায় এসেছিল তাদের সঙ্গে প্রধানতঃ ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। তের শতকের শুরু থেকে আঠার শতকের প্রায় মধ্য পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়কালে বাংলার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে থাকলেও তার অধিকারী ছিলেন বহিরাগত মুসলমানগণ। যাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন তুর্কী, আফগান, হাবশী, মুঘল ও পারসিক বংশজাত এবং তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন নগরবাসী আর তাঁদের ভাষা ছিল ফার্সী কিংবা উর্দু। কিন্তু বাঙলার মুসলমান সমাজ গঠিত ছিল কৃষক, তাঁতী, জেলে, কারিগর প্রভৃতি শ্রেনী নিয়ে এবং তাদের ভাষা ছিল বাঙলা। তাদের সঙ্গে নগরবাসী অভিযাত শ্রেণীর যোগাযোগ ছিল না বলা যায়। সুতরাং, ঐ সময় মুসলমান সমাজ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ঃ ১) আশরাফ (উচ্চ), ২) আত্‌রাফ (সাধারণ)।[১৫]

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে উত্তর ভারতের মুসলমানরা আর্থিক দিক থেকে বাঙলার মুসলমানদের তুলনায় স্বচ্ছল ছিল। কিন্তু বাঙালী মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি সব সময়ই দুর্বল ছিল। কারণ তারা সাধারণতঃ ব্যবসা-বানিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিল না।

প্রথম থেকেই মুসলমান সমাজ যেমন ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করেছিল, তেমনি দেশীয় ভাষা বাংলা চর্চার প্রতিও চরম ঔদাসীন্য দেখিয়েছিল। ফলে ১৮৩৫ সালে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক কর্তৃক নতুন শিক্ষানীতি ঘোষণার দ্বারা আইন-আদালতে ফার্সীর প্রচলন রহিত করে তার পরিবর্তে উচ্চ আদালতে ইংরেজী এবং নিম্ন আদালতে বাংলার প্রচলন প্রবর্তিত হলে মুসলমানরা অসুবিধায় পড়ে। কিন্তু হিন্দু সমাজ প্রথম থেকেই ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে। সরকারী সাহায্যের অপেক্ষায় না থেকে কলকাতার নেতৃস্থানীয় হিন্দুরা কিছু সংখ্যক উদারমনা ইংরেজ কর্মচারী ও ব্যবসায়ীর সহযোগিতায় ১৮১৬ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপন করে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সঙ্গে হিন্দুদের পরিচিত করার জন্য। একই সঙ্গে তারা বাঙলা ভাষার চর্চাও অব্যাহত রাখে। এতে নগরবাসী উচ্চ শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু অভিজাত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের হিন্দুদের শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে একটি সংযোগ সৃষ্টি হয় - যা হিন্দু সমাজের অগ্রগতিকে তরান্বিত করে। কিন্তু বাঙলার মুসলমান সমাজে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান থাকায় তারা দ্বিধাগ্রস্ত ও বিভক্ত সমাজ ছিল। ফলে তাদের অগ্রগতি ও বিকাশ ব্যহত হয়েছে।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

আঠার শতকের শেষের দিকে বাঙলায় বৃটিশ ক্ষমতা সুসংহত হওয়ায় বাঙালি মুসলমান শাসকশ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশা চরমে পৌঁছেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত্তিতে নতুন ভূমি-ব্যবস্থার প্রবর্তন, সৈন্যবাহিনীতে মুসলমানদের একাধিপত্য রহিতকরণ, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী কর্তৃক রাজস্ব-প্রশাসন পরিচালনা ও হিন্দু এজেন্ট নিয়োগ- এ সমস্তই শেষ আঘাত হিসেবে কাজ করেছিল মুসলমানদের ক্ষমতা, অবস্থান এবং সম্পদ ও শিক্ষা পদ্ধতির ধ্বংস সাধনে। এর ফলে ইংরেজ শাসনের প্রতি আশরাফ শ্রেণীর মনোভাব অত্যন্ত বিরূপ ছিল।[১৭]

অধিকাংশ বাঙালি মুসলমান অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল এবং শিক্ষাগত ক্ষেত্রে অনগ্রসর থাকায় তারা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ ও এর সুফল অনুধাবনে ব্যর্থ হয়। কিন্তু হিন্দু সমাজ আর্থিক দিক থেকে উন্নত এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহন করার কারণে তাদের মধ্যে একদল শক্তিশালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এই শ্রেণী বাঙলার রেনেসাঁ সংঘটনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।[১৮] যেহেতু, মুসলমান সমাজ ইংরেজী শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও সংস্কৃতি বিমূখ ছিল সেইহেতু বাঙলার রেনেসাঁ সংঘটনে তাদের অনুপস্থিতি লক্ষ্যণীয়; কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষাই ছিল বাঙলার রেনেসাঁর চালিকাশক্তি (motive-force)।[১৯]

উনিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে হিন্দু সমাজে যখন নবজাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছিল, সে সময় গ্রামাঞ্চলের মুসলমান জনসাধারণ যাদের অধিকাংশই কৃষক শ্রেণীভূক্ত ছিল তারা স্থানীয় জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্তভাবে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। এইসব বিদ্রোহের নেতৃত্বও এসেছে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে, যেমন- তিতুমীর, হাজি শরীয়তউল্লাহ প্রমুখ ব্যক্তি। গ্রামীণ পরিবেশে লালিত এবং প্রচলিত অর্থে অশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও এই সব নেতা দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু জনসাধারণের প্রকৃত সমস্যাগুলি সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান ও উপলব্ধি ছিল অত্যন্ত সীমিত। আধুনিক অর্থে শ্রেণীচেতনা ছিল অনুপস্থিত। উনিশ শতকের আধা-সামন্ত-আধা-ঔপনিবেশিক সমাজের বিশেষ সমস্যাগুলি যে প্রাচীন বিধান দিয়ে সমাধান করা যায় না - এ উপলব্ধি সেকালের নেতৃত্বের মধ্যে ছিল না। ফলে ধর্মীয় গোঁড়ামিকে আশ্রয় করে অত্যাচারী জমিদার ও সরকারী আমলার বিরুদ্ধে হিংসাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে তাঁরা অবস্থার মোকাবেলা ও পরিবর্তন করতে গিয়ে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবে, তাঁদের আন্দোলনের গুরুত্বকে এবং আত্মত্যাগের মহিমাকে অস্বীকার করা যায় না।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতা মুসলমানদের চিন্তা-চেতনায় এক বিরাট পরিবর্তন আনয়নে সাহায্য করেছিল। মুসলমান সমাজের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে আসেন। বাঙলার স্বল্প সংখ্যক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীসহ অন্যান্য স্থানের মুসলমানগণ বিদেশী শাসকবর্গের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়োজন অনুভব করেন এবং মুসলমান সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির স্বার্থে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। যাতে মুসলমান প্রজার সঙ্গে ইংরেজ শাসকদের সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়, বৃটিশ সরকার প্রবর্তিত নতুন শাসন ব্যবস্থায় মুসলমানরা যেন সহজে অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় সে জন্য তাদেরকে ইউরোপীয় কলা এবং বিজ্ঞান বিষয়ে সুশিক্ষিত করে তোলা, নতুন শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ শাসকদের সন্দেহ হ্রাস করা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রবর্তী বাংলার হিন্দুদের সঙ্গে সমকক্ষতা অর্জন করা- এ সবই লক্ষ্য ছিল।[২১]

স্বসমাজের উন্নয়নের স্বার্থে মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৪), সৈয়দ আহমদ খান এবং সৈয়দ আমির আলী (১৮৪৯-১৯২৮)।

আবদুল লতিফ মুসলমানদের জন্য উচ্চতর ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করবার দাবিতে ইংরেজ শাসকের নিকট আবেদন করেন। তবে সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানদের মাদ্রাসার আরবী-ফার্সী শিক্ষার প্রচলনেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন।[২২] কারণ রক্ষণশীল মুসলিম অভিজাত শ্রেণী তাঁদের সন্তানদের হিন্দু ও খৃষ্টান পরিচালিত বিদ্যালয়ে পাঠাতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাই কলকাতা মাদ্রাসাতেই Anglo-Persian বিভাগ খোলার জন্য তিনি ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন।[২৩] ১৮৬৩ সালে তিনি কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটী' প্রতিষ্ঠা করেন যা মূলতঃ উচ্চ এবং উচ্চতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের নিয়ে গঠিত ছিল এবং এলাকার কিছু উলেমাও ছিলেন যাঁরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় প্রশ্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। 'ইংরেজ তাদের ধর্ম ধ্বংস করতে চায়' - এই ভ্রান্ত ধারণা মুসলমানদের মন থেকে দূর করতে নিজেদের নিয়োগ করেন।[২৪] এখানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও বক্তৃতা দেওয়া হত উর্দু, ফার্সী, আরবী এবং ইংরেজী ভাষায়। সেখানে বাঙলা ভাষার কোন প্রচলন ছিল না।[২৫]

তবে আবদুল লতিফের চিন্তাধারার মধ্যে কিছু স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে তিনি যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের জন্য উদগ্রীব ছিলেন, অপরদিকে তিনি ছিলেন পাশ্চাত্যের উদার মতবাদের ঘোর

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী। বস্তুত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল রক্ষণশীল। তিনি মুসলমানদের কুসংস্কারকে দূর না করে তার সঙ্গে আপোষ করতে চেয়েছিলেন।[২৬] তাছাড়া বাঙলার মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব দান করলেও তাদের মাতৃভাষা বাঙলার প্রতি কোন শ্রদ্ধা দেখান নাই। ১৮৮২ সালে ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি সুপারিশ করেন যেন উর্দুকে বাংলার উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর মুসলমানদের একমাত্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সুতরাং বাঙলা জানা সত্ত্বেও উর্দু ভাষার প্রতি অনুরাগ এবং রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে আবদুল লতিফ তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেন নাই। তুলনামূলকভাবে তাঁর সমসাময়িক উত্তর ভারতের মুসলিম নেতা সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) ঐ অঞ্চলের মুসলমান জনসাধারণের ভাষা উর্দুর মাধ্যমে তাঁর প্রগতিশীল মতামত প্রকাশ করায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিলেন।[২৭]

সৈয়দ আহমদ খান পশ্চাৎপদ স্বসমাজের নিকট ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং ১৮৬৩ সালে 'Translation Society' গঠন করেন,যা পরবর্তীকালে 'Scientific Society' নামে পরিচিত। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষিত মুসলমান ছাড়াও সমাজের সকল স্তরের কাছে প্রবর্তনই ছিল এই সোসাইটির মূল লক্ষ।[২৮]

পরে, নবাব আবদুল লতিফের সমসাময়িক সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) মুসলমানদের চিন্তা ক্ষেত্রে আরও উচ্চতর মননের স্বাক্ষর রাখেন। একজন ধর্ম-সংস্কারক হবার কোন আকাঙ্খাই তাঁর ছিল না। তাঁর প্রকৃত আগ্রহ নিহিত ছিল রাজনীতি বিষয়ে এবং তিনি হলেন ভারতের মুসলমান নেতাদের মধ্যে অন্যতম একজন যিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন এর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেছিলেন।[২৯] তাঁর প্রতিষ্ঠিতি 'The National Muhammadan Association' কে ভারতের প্রথম মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ন্যায্য ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মুসলমানদের কল্যাণ সাধন করা। আরও উদ্দেশ্য ছিল- অতীত ঐতিহ্য হতে প্রেরণা লাভ করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং সমকালীন যুগের প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে একটি সমন্বয় সাধন করা; ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক পুনঃর্জাগরণ আনয়নে সাহায্য করা; তাদের নৈতিক উন্নতি সাধন এবং সরকারের নিকট থেকে তাদের ন্যায্য দাবীসমূহ আদায় করা।[৩০]

১৮৮২ সালে আমীর আলী বিলেত থেকে প্রকাশিত *The Nineteenth Century* পত্রিকায় 'A Cry for the Indian Mohammadans' নামক একটি প্রবন্ধে মহামেডান এসোসিয়েশনের দাবিগুলি পুনরুল্লেখ করে প্রস্তাব করেন যে, সরকার কেবলমাত্র প্রাচ্য ভাষায় পরিচালিত স্কুল-মাদ্রাসা তুলে দিয়ে তার অর্থ দ্বারা

Dhaka University Institutional Repository

যেন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় এবং প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আমীর আলী বলেন ঃ

> "It was unwise for the Government to maintain institution for imparting merely oriental education, as this fosters in the people the old ideas of exclusiveness which are inconsistant with the exigencies of British rule".[৩১]

সরকার যখন উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করছিল ঠিক সেই সময় আবদুল লতিফ তাঁর মহামেডান লিটারারী সোসাইটীর পক্ষ হতে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে পাল্টা একটি আবেদন সরকারের নিকট পেশ করেন। যেহেতু আমীর আলী ছিলেন শিয়া মুসলমান অপরদিকে, আবদুল লতিফ এবং বাঙলার অধিকাংশ মুসলমান ছিলেন সুন্নী মতাবলম্বী, মনে হয় ইংরেজ সরকার শেষ পর্যন্ত আবদুল লতিফ এর মতামতকেই প্রাধান্য দিয়ে মাদ্রাসার পরিবর্তে ইংরেজী কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবকে বাতিল করে দেয়। সুতরাং শিক্ষা পদ্ধতির প্রশ্নে কলকাতার মুসলমান সমাজ দুইটি ভিন্ন মতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।[৩২]

এই সময় একজন মুসলিম বুদ্ধিজীবী দেলওয়ার হোসেন একইভাবে আমীর আলীর মত মাদ্রাসা শিক্ষার অসারতা এবং আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলছিলেন। স্বসমাজের কাছে আবেদন জানিয়ে তিনি বলেছিলেন ঃ

> "In the name of the Mohammadans of Bengal, in the name of the Mohammadans of all India, in the name of all Mohammadans throughout the world, I call upon the various parties of the Mohammadan gentry in Bengal to lay aside their personal animosities and to combine together for the purpose of ameliorating the condition of their community and raising the status of their society – for the purpose of discussing and inaugurating measures for the improvement of our education and our educational system., for the reform of our domestic and social economy,and for the advancement of our social and political privileges."[৩৩]

স্যার সৈয়দ আহমদ খান, আবদুল লতিফ প্রমুখদের প্রচেষ্টায় মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষা ও চর্চার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠলে ১৮৭০ সালে এবং পরবর্তীতে তারা ভাইসরয়ের আইন পরিষদ, শিক্ষাক্ষেত্র এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনে মনোনয়ন লাভ করতে থাকে।[৩৪]

১৮৮৫ সালে অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিল কর্মকর্তা এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম উচ্চ পদস্থ বৃটিশ কর্মকর্তা ও শিক্ষিত হিন্দু নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করার পর ১৮৮৬ সালে সৈয়দ আহমদ

Dhaka University Institutional Repository

খান 'Muslim Educational Conference' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের শিক্ষা ছাড়াও সাধারণ অবস্থা বিষয়ে আলোচনা করা। প্রত্যেক বছর এর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হত। এই সভায় যুক্তিপূর্ণ আলোচনা হত এবং মুসলমানদের দুর্ভাগ্য রহিতের দ্বারা যাতে তারা ভারতের অন্যান্য জাতির মত সমভাবে উন্নতির পথে ধাবিত হতে পারে সে পথ অনুসরণের চেষ্টা করা।[৩৫]

পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুকরণে নির্বাচন প্রথার উপর ভিত্তি করে যে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রণয়নের দাবি করেছিল তা বাস্তবায়িত হলে এ দেশের মুসলমানরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে- সৈয়দ আহমদ খান এ বিশ্বাস করতেন। যেহেতু হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেহেতু সাধারণ নির্বাচনের ফলে তারাই ক্ষমতার সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে এবং মুসলমানরা বঞ্চিত ও অবহেলিত থেকে যাবে। বস্তুতঃ ১৮৯২ সালে Indian Councils Act অনুযায়ী দেখা গেল, খুব স্বল্প সংখ্যক মুসলমানই নির্বাচিত হতে পেরেছে। তাছাড়া বাল গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৭-১৯২০) এর মত কিছু সংখ্যক রক্ষণশীল ও সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হিন্দু নেতা কংগ্রেসে থাকার ফলে মুসলমান জনসাধারণের মনে কংগ্রেস সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। কেননা এই সময় হিন্দুত্বের পুনঃরুত্থান আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়া উঠে এবং তিলক ও তার অনুসারীরা এর সংগে সক্রীয় ছিলেন। তাদের উদ্যোগে ঘটা করে শিবাজী উৎসব পালন এবং গো-হত্যা নিবারণের জন্য গো-রক্ষা সমিতি গঠিত হয়। এর ফলে উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ, আবদুল লতিফ এবং সৈয়দ আমীর আলী সকলেরই ধারণা হয় যে, কংগ্রেসের দ্বারা ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে না। এইভাবে দেখা যায় যে, উনিশ শতকের শেষ দিকে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে স্বতন্ত্র স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্খা সম্বন্ধে একটি সচেতনতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল।[৩৬]

বাংলা সেই সময় ভারতবর্ষের বৃহত্তম এবং সর্বাধিক জনবহুল প্রদেশ ছিল। তদানিন্তন বাংলা বলতে বাংলা, বিহার, ছোট নাগপুর এবং উড়িষ্যাসহ ৪৮টি জেলাকে বুঝাতো। এর আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৯০ হাজার বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৮০ লক্ষ।[৩৭] প্রদেশটির আয়তনের বিশালতা উনিশ শতকেই বৃটিশ সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।[৩৮] এই বিশাল প্রদেশকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য লর্ড কার্জন ১৯০৩ সালে পূর্ব বঙ্গের সঙ্গে আসামকে যুক্ত করে একটি নতুন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব করলে হিন্দু সমাজ তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী (১৮৪৮-১৯২৫), যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৩১-১৯০৮), নরেন্দ্রনাথ সেন (১৮৪৩-১৯১১) এবং মতিলাল ঘোষ (১৮৪৭-১৯২২) এর নেতৃত্বে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী এর প্রতিবাদে শহর ও দেশব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[৩৯]

Dhaka University Institutional Repository

কলিকাতার কেন্দ্রীয় মোহামেডান এসোসিয়েশন যার বাংলার প্রত্যেক জেলাগুলিতে এবং ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শহরে শাখা ছিল- ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এক সভায় বৃটিশ সরকারের এই পদক্ষেপ সম্পর্কে নিন্দা করে। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বরিশালের জমিদার মীর মোতাহার হোসেন, বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য চট্টগ্রামের সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং *The Moslem Chronicle* এর সম্পাদক আবদুল হামিদ।[৪০]

ঐ বৎসরেই ফেব্রুয়ারীতে লর্ড কার্জন স্বয়ং ঢাকা পরিদর্শনে যান, সেখানে তিনি মুসলমানদের সমর্থন লাভের জন্য ভূস্বামীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, বিভক্তি পূর্ব বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে একতা এনে দেবে যা ইতিপূর্বে তারা কোন মুসলমান রাজপ্রতিনিধি বা রাজার আমলে ভোগ করে নাই ('The Mohammedans of Eastern Bengal with a unity which they had not enjoyed since the days of the old Mussulman Viceroys and kings.')[৪১]

অনগ্রসর মুসলমানদের অগ্রগতি এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্য বঙ্গ ভঙ্গ প্রস্তাব এক বিরাট সুযোগ বিধায় অধিকাংশ মুসলমান প্রথমদিকে প্রস্তাবটির বিরোধিতা করলেও পরে তা সানন্দে গ্রহণ করে তাদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটায়।[৪২] ঢাকার নওয়াব বাহাদুর খাজা সলিমুল্লাহ যিনি মুসলমান সমাজের সবচাইতে প্রভাবশালী নেতা ছিলেন তিনি ১৯০৬ সালের প্রথম দিকে আশাবাদ ব্যক্ত করে যে বিবৃতি দেন তা হলো ঃ There are many good things in store for us . . . and the Mahomedans being the largest in number in the New Province, they will have the largest share . . . . This is the golden opportunity, which God and His Prophet have offered us, but if we do not now profit ourselves by the opportunity, we may not get another chance. Now or never. Our destiny is in our hands. We must strike while the iron is hot.[৪৩]

প্রথমদিকে বিভক্তির বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করলেও এর কার্যকারিতার গুরুত্ব অনুধাবন করে The Moslem Chronicle পত্রিকাও তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন প্রদেশকে স্বাগত জানায় এবং এর জনগণের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিবৃতি প্রকাশ করে।[৪৪]

নবাব সলিমুল্লাহ ও তার সহযোগীগণ খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইউসুফ, ত্রিপুরার খান বাহাদুর আলী নওয়াব চৌধুরী, সিলেটের মোহাম্মদ এহিয়া, ময়মনসিংহের আবদুল হাই আকতার, বগুড়ার খন্দকার হাফিজুদ্দিন, ধনবাড়ীর নওয়াব আলী চৌধুরী এবং বরিশলের ফজলুল হক অতঃপর মুসলমানদের সংঘবদ্ধকরার সিদ্ধান্ত নেন এবং একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেন যা মুসলমান সমাজের সকল সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

এবং রাজনৈতিক স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়াদি প্রকাশের মুখপত্র হবে। এ সম্পর্কে সংগঠনকারীগণের অভিমত হলো- Consolidation and conservation of the strength of the Mohammadans of the new province as a whole for all public purposes. মুসলমানদের অন্যান্য সকল সংঘ এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই সংগঠনের সঙ্গে একত্রিত হবার জন্য আহবান জানানো হয়।[৪৫] কলকাতার প্রখ্যাত মুসলমানগণ একটি ঘোষণা প্রদান করেন যা কলকাতার লিটারারী সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে 'সরকারী নীতিকে সব রকম সম্ভাব্য উপায়ে বিশ্বস্ততার সঙ্গে সমর্থন দান এবং বিভক্তির সঙ্গে যুক্ত যে কোন ধরণের রাজনৈতিক সভা ও আন্দোলন থেকে বিরত থাকবার জন্য তাদের পরামর্শ দেওয়া হয়।'[৪৬]

অবশ্য মুসলমানদের বঙ্গভঙ্গ সমর্থনের কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এই নতুন প্রদেশকে এবং সেই সাথে সরকারী চাকরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মুসলমানদের সুযোগদানের নীতিকে তারা স্বাগত জানিয়েছিল কারণ, ১৯০১ সালে বাংলায় ইংরেজী ভাষা জ্ঞান সম্পন্ন মুসলমানের সংখ্যা ছিল প্রতি ১০,০০০ জনের মধ্যে মাত্র ২২ জন। সে তুলনায় হিন্দুদের মধ্যে এর সংখ্যা ছিল ১১৪ জন।[৪৭] সরকারী 'উচ্চপদের' মাত্র ৪১টি ছিল মুসলমানদের দখলে। অন্যদিকে জনসংখ্যার দিক থেকে হিন্দুরা মুসলমানদের অর্ধেকের কম হওয়া সত্ত্বেও তাদের দখলে ছিল প্রায় ১,২৩৫ টি পদ।[৪৮] বঙ্গভঙ্গের পরে সরকার শিক্ষা এবং চাকরীর ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।[৪৯]

যেহেতে মুসলমান সম্প্রদায় তখনো শিক্ষা, অর্থ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ, তাই মুসলমান নেতৃবৃন্দ ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা দান করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি আনয়নে সচেষ্ট ছিলেন।[৫০]

১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর সমগ্র বৃটিশ ভারতের ৩৫ জন মুসলিম নেতৃবৃন্দ সিমলায় অবস্থানরত ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর বাসভবনে গমন করেন। মূলতঃ প্রতিনিধি দলটি মুসলিম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ, জায়গীরদার, জমিদার, তালুকদার, আইনবিদ, ব্যবসায়ী এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। সিমলা ডেপুটেশন তাৎপর্যপূর্ণ ছিল এই কারণে যে, এই প্রথমবারের মত মুসলমানরা নিজেদের শুধু সুসংগঠিতই করে নাই উপরন্তু দেশের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে তাদের পূর্ণ অংশ গ্রহণ দাবী করে।[৫১] প্রতিনিধিবৃন্দ মুসলমানদের পক্ষ থেকে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট দাবী-দাওয়া উত্থাপন করেন যার মধ্যে প্রধান ছিল মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন। বড়লাট মুসলমানদের এই দাবী প্রথমে বিবেচনার আশ্বাস দেন এবং পরে ১৯০৯ সালে 'মর্লে-মিন্টো সংস্কার' আইনে তা মেনে নেওয়া হয়।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

এই ঘটনায় হিন্দু সমাজের প্রতিক্রিয়া ভিন্নরকম লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগ ঘোষিত হলে উদ্বোধনী দিনটিকে তারা জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করে এবং প্রতিবাদ স্বরূপ বৃটিশ দ্রব্য বর্জনেরও সিদ্ধান্ত গ্রহন করে।[৫৩] এমনকি, হিন্দু নেতারা জোর দিয়ে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বিভক্তির দ্বারা কোন সম্প্রদায়ই লাভবান হয় নাই। পূর্ব বাঙলা ও আসাম প্রদেশকে তারা 'Curzonian Bengal' নামে অভিহিত করে।[৫৪] *Amrita Bazar Patrika* হিন্দু-মুসলমান এর অতীতের সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে এক সম্পাদকীয়তে লিখেছিল, "The Mahomedans trust fully depended on their Hindu fellow-citizens for help and advice in all matters . . . "But now the partition had come, and it was not merely territorial in its intent – the British wanted to make it 'a Partition between the Hindus and Mahomedans as well as between landlords and tenants... ..[৫৫]

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের আন্দোলনকে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক সবচাইতে বিধিবদ্ধ ও সুসংগঠিত ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। অধিকাংশ প্রতিবাদ সভাগুলি সংগঠিত এবং পরিচালিত হতো কংগ্রেস নেতাদের দ্বারা। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- নাটোরের মহারাজা, লালমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, অম্বিকা চন্দ্র মজুমদার, রাশবিহারী ঘোষ প্রভৃতি।[৫৬] বিভক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে অধিকতর কার্যকরী করার অভিপ্রায়ে কংগ্রেস ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট স্বদেশী আন্দোলনের সুত্রপাত ঘটায়। এই পরিকল্পনা পাবনার এক সভায় প্রথম প্রকাশিত হয় এবং শীঘ্রই হিন্দুদের মধ্যে চরম জনপ্রিয়তা লাভ করে।[৫৭] বয়কট অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়েছিল দুটি ক্ষেত্রে যথাঃ- Industrial and Political.[৫৮] বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে চালিত স্বদেশী আন্দোলন যদিও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের উত্থান ঘটিয়েছিল কিন্তু এটি অচিরেই একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয় এবং এই রাজনৈতিক আন্দোলন পরবর্তীতে ধর্মীয়রূপ পরিগ্রহ করে।[৫৯] এ সম্পর্কে স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বলেন, Swadeshism had evoked the fervour of a religious movement. It had become part of our Dharma.[৬০] বস্তুতঃ শিক্ষা বিষয়ক, রাজনৈতিক এবং শিল্প- সকল ক্ষেত্রেই স্বদেশী আন্দোলন এর কর্মীদের শক্তি যুগিয়েছিল।[৬১]

উল্লেখ্য, হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণী ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর অর্থাৎ বঙ্গবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন সংবাদপত্রে ইংরেজী ভাষায় প্রবন্ধ, বিবৃতি, স্মারকলিপি, আবেদনপত্র, প্রতিবাদ সভা ও প্রতিনিধিদল প্রেরণ প্রভৃতির মাধ্যমে বৃটিশ সরকারকে বঙ্গভঙ্গ বাস্তবায়ন থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। যে সকল সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে বিভক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের নিয়মতন্ত্রী প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সেগুলির মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য দুটি পত্রিকা হলো সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর *The Bengalee* ও মতিলাল ঘোষ সম্পাদিত *Amrita Bazar Patrika*। তাছাড়া বাঙালি পরিচালিত অন্য ইংরেজী পত্রিকাগুলি ছিল *Hindoo Patriot, The Indian Mirror, Indian Nation* ও বিপিনচন্দ্র পালের *The New India* বাঙলা দৈনিক ছিল পাঁচটি এগুলির মধ্যে মাত্র দুটি *দৈনিক হিতবাদী* ও *সন্ধ্যা*র রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল। সাপ্তাহিকগুলির মধ্যে *বসুমতী, সঞ্জীবনী* ও *বঙ্গবাসী* ছিল বিখ্যাত।[৬২]

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ইংরেজী 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন যে, 'এই বঙ্গভঙ্গ আমরা কিছুতেই মানিয়া লইব না। যতদিন ইহা রহিত না হয় ততদিন আইনসঙ্গত উপায়ে আমরা যে আন্দোলন চালাইব ব্যাপকতা ও তীব্রতায় তাহার সমতুল্য কোন আন্দোলন ইহার পূর্বে এদেশে আর কখনও হয় নাই।'[৬৩]

The Amrita Bazar Patrika লিখেছিল ঃ "The partition of Bengal is not a provincial but an imperial question of the first importance. It is a pity the leaders, in other parts of the country, did not realize it. They evidently thought it was purely a Bengal matter and, as such, should be fought out by the people of that Province themselves. On the other hand, it was an all-India question in which the Madrasees, the Bombayites, the Punjabees, and the N.W.P. men were as vitally interested as the Bengalees. Strangely enough even the Congress leaders, who are for uniting the various Indian races into an undivided and homogeneous whole, kept themselves aloof from the Bengal agitation, utterly forgetting that if the Government could humiliate the Bengalees, the strongest community in India, it could deal with weaker communities in the same manner with greater facility.[৬৪]

বঙ্গ বিভক্তি সকল ভদ্রলোকের[৬৫] মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাঁদের সংস্কৃতির জগৎকে সমান দুটি ভাগে বিভক্ত করে : কলকাতা কেন্দ্রিক এবং মফস্বল। তাছাড়া এর ফলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছে তাঁদের জনপ্রিয়তাও কমে যায় অনেকখানি। ওড়িয়া, বিহারী, এবং পূর্ব বাংলার মুসলমান রাজনীতিবিদগণ ভদ্রলোকদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার হাত থেকে রেহাই লাভের জন্য এই বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছিল। তাই বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বদেশী পণ্য উৎপাদন ও বয়কট নীতি মুসলমান, নমশুদ্র এবং মাড়োয়ারীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং তারা এই আন্দোলন থেকে নিজেদের বিরত রাখে। কিন্তু নব্য ভদ্রলোকদের নেতৃত্বে তাদের জাতীয়তার পরিচয় দিতে 'হিন্দু প্রতিকী' ব্যবহার করলে তা বিশেষ করে মুসলমানদের নিকট

Dhaka University Institutional Repository

আপত্তিকর হয় এবং যখন কিছু সংখ্যক ভদ্রলোক জমিদার ও আইনবিদ তাঁদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার দ্বারা অধিনস্থদের দমন করতে গেলে[৬৬] মুসলমানরা সংঘবদ্ধ হয়ে তা প্রতিহত করে। এর ফলস্বরূপ কলকাতাসহ পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন স্থানে মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছিল।[৬৭]

সুতরাং, মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ বঙ্গ বিভক্তির মধ্যে নিজেদের উন্নতির সম্ভাবনা লক্ষ্য করে একে আশির্বাদরূপে গ্রহণ করে, কিন্তু হিন্দুদের বিভক্তি বিরোধী ভূমিকা মুসলমানদের মধ্যে এই বিশ্বাসের জন্ম দেয় যে, তাদের (মুসলমান) অগ্রগতিতে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে হিন্দুরা যে কোন ভাবেই বিভক্তিকে বাতিল করতে সচেষ্ট।[৬৮] এর ফলে সন্দেহ, ঘৃণা এবং অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়।[৬৯] বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বাঙলা ছাড়াও সারা ভারতবর্ষে দুটি জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ঘটায়- একটি হিন্দু, অপরটি মুসলমান।[৭০]

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাবৎ বিভক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত স্বদেশী এবং বয়কট আন্দোলন যা কংগ্রেস কর্তৃক সমর্থিত ছিল এবং বাংলায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সরকারকে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে বাধ্য করে এবং বাংলা বিভক্তিকে বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৭১] ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে খাজা সলিমুল্লাহকে জি.সি.আই.ই. খেতাব দেওয়া হয় এবং ঐ দরবারেই সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গ বিভাগ রদ ঘোষণা করলে মুসলমানরা মর্মাহত হয় এবং ২০শে ডিসেম্বর খাজা সলিমুল্লাহ লর্ড হার্ডিঞ্জকে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ক ৮টি দাবি সম্বলিত পত্র দেন।[৭২] আর বঙ্গ বিভাগ রদ ঘোষিত হওয়ায় হিন্দু-মুসলমান এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের কারণ দৃঢ়তর হয়। কারণ বঙ্গবঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ছিল গভীরভাবে মুসলমান স্বার্থের পরিপন্থী।[৭৩]

বিশ্বের সকল মুসলমান ভাই ভাই এবং তুরস্কের খলিফা ভারতীয় মুসলমানদেরও ধর্মীয় নেতা - এই ধারণা ও বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ (Pan-Islamism) ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান থাকায় ১৯১২ সালে বৃটিশের সমর্থন নিয়ে মিত্র বলকান শক্তি তুরস্ক আক্রমন করলে ভারতীয় মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হয়। কারণ এই যুদ্ধে তারা তুরস্ককে সমর্থন জানিয়েছিল। ফলে, ভারতীয় মুসলমান সমাজে ইংরেজ শাসকদের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয়। ১৯১৩ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ আত্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী গ্রহণ করে।[৭৪] এই ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় বৃটিশ বিরোধী মনোভাব জাগ্রত হয় যা রাজনীতি ও খেলাফত সমন্বয়ে এক নতুন রূপ গ্রহণ করে।[৭৫]

এই বছরই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগে যোগদান করেন। তাঁর উদ্‌যোগেই আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই বিষয়ে আগা খানের সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় আগা খান লীগের সভাপতি পদে

Dhaka University Institutional Repository

ইস্তফা দেন। তখন জিন্নাহর নেতৃত্বে উদারপন্থীরা একতাবদ্ধ হয়।[৭৬]

১৯১৩ সালে আবুল কাশেম ফজলুল হক বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হন। একই বছরে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক হন। এই সময় নবাব সলিমুল্লাহ ছিলেন সভাপতি। তাছাড়া ফজলুল হক সমগ্র ভারত মুসলিম লীগের সহ-সম্পাদকও ছিলেন। ১৯১৪ সালে নবাব সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর উপর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের দায়িত্বভারও অর্পিত হয়। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে বিশ্বাসী ফজলুল হক জাতীয় কংগ্রেসেও যোগদান করে নেতৃত্ব পদে আসীন হন। একই সঙ্গে তিনি লীগ ও কংগ্রেস উভয় দলে থেকে কাজ করেন।[৭৭]

এই সময় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ ভ্রাতৃসুলভ অবস্থান গ্রহণ করে। উভয়েই ভারতের প্রতিষ্ঠানসমূহে গণতন্ত্রের বিস্তৃতির দাবী জানায়। ১৯১৩ সালের পর থেকে লীগ এবং কংগ্রেস প্রায় একই সময় একই স্থানে তাদের বার্ষিক অধিবেশন করে এবং উভয় সংগঠনের প্রতিনিধিগণ একে অপরের অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন।[৭৮]

১৯১৬ সালে সর্বভারতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের প্রতিনিধিগণ কলকাতায় মিলিত হন এবং আইন পরিষদে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন ও প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের দাবি জানান। তাছাড়া কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেন যেগুলি পরবর্তী ডিসেম্বরে কংগ্রেস এবং লীগের বার্ষিক অধিবেশনে পেশ করেন তাদের অনুমোদনের জন্য। উভয় দল যুগপৎভাবে লক্ষ্ণৌতে মিলিত হয় এবং উভয়ের একতা ও বোঝাপড়ার মধ্যে আলোচনা হয়। তবে এই সম্মেলন হিন্দু এবং মুসলমান একত্রে একটি রাজনৈতিক দল'- এর উপর ভিত্তি করে নয় বরং, দুইটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় এই স্বীকৃতির উপর হয়েছিল। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক রামগোপাল লিখেছেন ঃ "This was on the basis not of the fusion of Hindus and Muslims into one political community, but of an agreement to recognize them as two distinct communities, and by proceeding on this basis to confront the British with a united demand for constitutional reforms." ১৯১৬ সালের এই চুক্তি 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট' নামে পরিচিত এবং ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি একটি বিখ্যাত ঘটনা (a landmark in India's Political history)।[৭৯]

লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট মুসলমানদের মূলতঃ তিনটি সুস্পষ্ট সুবিধাদি প্রদান করে- ১) বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বমূলক পরিষদে স্বতন্ত্র নির্বাচন, ২) মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশে তাদের প্রতি গুরুত্বদান এবং ৩) কোন বেসরকারী

Dhaka University Institutional Repository

বিল তাদের স্বার্থহানিকর হলে এবং তিন-চতুর্থাংশ মুসলমান তার বিরোধিতা করলে, সে প্রস্তাব পরিষদে বিবেচিত হবে না। হিন্দুদের ক্ষেত্রেও এই আইন সমান প্রযোজ্য।[৮০]

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সংঘটিত লক্ষ্ণৌ চুক্তি পরবর্তীতে ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারে সামান্য রদবদল করে সম্পূর্ণরূপে সরকার গ্রহণ করে। এর পর উভয়দল একসূত্রে 'স্বাধীনতা' আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে - যার মধ্যে খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন অন্যতম।[৮১]

ইংরেজ কর্তৃক ভারতীয়দের জন্য প্রবর্তিত রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে ১৯১৯ সালের ৩০শে মার্চ গান্ধী হরতাল আহবান করলে হিন্দু-মুসলিম তাতে সাড়া দিয়ে সম্মিলিতভাবে হরতাল পালন করে। প্রতিবাদী জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার গুলিবর্ষণের নির্দেশ দিলে বোম্বে, লাহোর, অমৃতসর ও আহমেদাবাদে হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে।[৮২] এই ঘটনার প্রতিবাদের জন্য ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল প্রায় দশ হাজার লোক অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক সভায় মিলিত হয়। কিন্তু ইতিপূর্বেই জেনারেল ডায়ার শহরে সব রকমের সভা-সমিতি এবং মিছিল-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।[৮৩] এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সভা করলে জেনারেল ডায়ার প্রায় পঞ্চাশ জন গুর্খা সৈন্য ঐ বাগে প্রবেশ করিয়ে কোন প্রকার সতর্ক প্রদান ছাড়া গুলির নির্দেশ দিলে তাতে প্রায় চারশত জন নিহত এবং হাজারেরও বেশী লোক আহত হয়।[৮৪]

সুতরাং রাউলাট আইনকে কেন্দ্র করে সংঘটিত ঘটনা প্রবাহ পরবর্তীতে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনকে রূপায়িত করে এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বার্থে হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিতভাবে বৃটিশ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।[৮৫]

উল্লেখ্য, ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে বৃটিশ-তুরস্কের অখন্ডতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলে ভারতীয় মুসলমানরা যুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে দেখা যায় যে, তুরস্কের ব্যাপারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি গ্রেট বৃটেন রক্ষা করে নাই এবং গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স তুরস্ক সাম্রাজ্যের এশীয় অঞ্চলসমূহ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। একজন হাইকমিশনারের মাধ্যমে মিত্রশক্তি তুরস্কের শাসনভার গ্রহণ করে। বৃটিশ তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় ভারতের মুসলমানদের সঙ্গে অন্যান্য সম্প্রদায়ও বিক্ষুব্ধ হয়।[৮৬]

তুরস্কের খলিফাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তার অঞ্চলসমূহ প্রত্যার্পনের দাবীতে মুসলমানগণ এক ব্যাপক আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয় এবং লক্ষ্ণৌয় সর্বভারতীয় খেলাফত কমিটি গঠন করা হয়। ১৯১৯ সালের ২৪শে নভেম্বর দিল্লীতে বাঙলার এ.কে. ফজলুল হকের সভাপতিত্বে খেলাফত কনফারেন্সের প্রথম প্রকাশ্য

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশন হয়। গৃহীত প্রস্তাব সমূহের একটিতে মুসলমানদের প্রতি আবেদন জানানো হয় যেন তারা বৃটিশ সরকারের বিজয় উৎসবে অংশগ্রহণ না করে। আরেক প্রস্তাবে বৃটিশ পণ্য বর্জন করার সিদ্ধান্ত হয় এবং সরকার খেলাফতের ব্যাপারে তাদের দাবী না মানলে বৃটিশ সরকারের সাথে অসহযোগের ডাক দেয়া হয়। এই অধিবেশনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো - হিন্দু ও মুসলমানদের এক যৌথ সভায় গান্ধী খেলাফত কনফারেন্সের সাথে সহযোগিতা করার ঘোষণা দেন। তিনি উভয় সম্প্রদায়কে ইংরেজ বিজয় উৎসব পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেন।[৮৭] তিনি হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত খেলাফত সম্মেলনে বক্তব্য দিয়ে এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ If Government should betray us in a great cause like the Khilafat we could not do otherwise than non-co-operate.[৮৮]

কিন্তু ১৯২২ সালে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরীচৌরা নামক গ্রামে উন্মত্ত কংগ্রেস কর্মীদের দ্বারা একুশ জন পুলিশ ও চৌকিদার জীবন্ত দগ্ধ হলে, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধী ১৯২২ সালের ১১ই ও ১২ই ফেব্রুয়ারী বারদলিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করলে গান্ধী নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা দেখা দেয়। কর্মীরা পক্ষে-বিপক্ষে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[৮৯]

অসহযোগ আন্দোলন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে বাংলাসহ সারা দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ বদলে যায়। খেলাফতের বিষয়টি মুসলমানদেরকে চরমভাবে উত্তেজিত করে এবং আন্দোলনের ব্যর্থতা মুসলমাদের মধ্যে ব্যাপক বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। 'মসজিদের সম্মুখে বাদ্য বাজানো' এবং 'গরু জবাই' কে কেন্দ্র করে ধর্মীয় সহনশীলতা লোপ পায় এবং হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ককে তা প্রভাবিত করে।[৯০]

আইনের দৃষ্টিতে রাজপথে হিন্দুর বাজনা বাজাবার এবং মুসলমানের গো-কোরবাণীর অধিকার দুটিই সমান অনস্বীকার্য হলেও কংগ্রেস প্রশ্ন দুটির যথার্থ সমাধান দিতে পারে নাই।[৯১]

অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম কার্য্যসূচি ছিল সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বয়কট করা।[৯২]

কিন্তু বাঙালি মুসলমান নেতৃবৃন্দ অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করলেও তাঁরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বয়কট করার ঘোর বিরোধী ছিলেন।[৯৩] কারণ তাঁরা মনে করতেন যে, এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে অনুন্নত মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষতি হবে।[৯৪]

অতঃপর ১৯২৩ সালে রক্ষণশীল হিন্দু গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠন' আন্দোলন শুরু করলে এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে রক্ষণশীল মুসলমানদের পক্ষ থেকে 'তবলিগ' ও 'তাঞ্জিম' আন্দোলন শুরু করে।[৯৫]

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং ফজলুল হক প্রমুখ মুসলিম নেতার সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় সেটা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে খ্যাত। ১৯২৩ সালে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ পার্টির সম্মেলনে এই চুক্তিটি অনুমোদিত হয়। চুক্তিতে বলা হয় যে, বঙ্গীয় বিধান পরিষদ জনসংখ্যার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হবে। স্থানীয় জেলা পরিষদে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জন্য শতকরা ৬০ ভাগ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য শতকরা ৪০ ভাগ আসন বরাদ্দ থাকবে। তাছাড়া এই চুক্তিতে স্থির হয় যে, সরকারী পদসমূহের শতকরা ৫৫ ভাগ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে। বস্তুতঃ ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তির পর প্রাদেশিক পর্যায়ে হলেও এই চুক্তিটি ছিল হিন্দু-মুসলিম বিরোধ নিষ্পত্তির প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস।[৯৬]

বেঙ্গল প্যাক্ট বাঙালি মুসলমানের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করেছিল। এর পক্ষে সমর্থন দিয়ে 'দি-মুসলমান' পত্রিকা এক সম্পাদকীয়তে লিখেছিল ঃ 'The Musalman as a community must be made to understand that Swaraj does not mean the predominance of any anyone Indian community are another, but that it means freedom for all. Only a pact could make them so understand.'[৯৭]

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং এই চুক্তিকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং কংগ্রেসী সংবাদপত্রসমূহ এই চুক্তির তীব্র সমালোচনা প্রকাশ করে।[৯৮] হিন্দু মহাসভা যা ১৯২৪ সালে একটি হিন্দু রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে সেই সংগঠনও ১৯২৪ সালে বেলগাঁও অধিবেশনে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে স্বাক্ষরিত লক্ষ্ণৌ চুক্তির (১৯১৬) ঘোর বিরোধিতা করে।[৯৯] শেষ পর্যন্ত ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বাঙলার স্বরাজ পার্টিও এই চুক্তিকে বাতিল করে। এইভাবে কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাদের অদূরদর্শিতা এবং অনমনীয় মনোভাবের কারণে বাঙলার হিন্দু-মুসলমান সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধানের প্রচেষ্টা রুদ্ধ হয়ে যায়।[১০০]

১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে একটি 'স্বরাজ শাসনতন্ত্র' এর খসড়া প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরে কংগ্রেস একটি সর্বদলীয় সভা আহবান করে এবং তা ১৯২৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি হতে ২২শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্থায়ী হয়। কিন্তু মতোবিরোধিতার কারণে এই সভা সর্বসম্মত একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হয়।[১০১] অতঃপর অধিবেশনের শেষ দিনে মতিলাল নেহরুকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়।[১০২]

Dhaka University Institutional Repository

নেহরু কমিটি প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে যে রিপোর্ট প্রদান করে তা হলো ঃ

১. সমগ্র ভারতে যুক্ত মিশ্র নির্বাচন হবে।

২. কেন্দ্রীয় আইনসভায় কোন আসন সংরক্ষিত থাকবে না; তবে যে সকল প্রদেশে মুসলমান সংখ্যালঘু তাদের জন্য এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হিন্দুদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। যে সব প্রদেশে হিন্দু কিংবা মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষিত হয়েছে, সেখানে অতিরিক্ত আসনের জন্যও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার তাদের থাকবে।

৩. (ক) পাঞ্জাব এবং বাংলায় কোন সম্প্রদায়ের জন্য কোন আসন সংরক্ষিত থাকবে না। খ) বাঙলা এবং পাঞ্জাব ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশে মুসলমান সংখ্যালঘুদের জন্য লোকসংখ্যা অনুযায়ী আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং অতিরিক্ত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকারও থাকবে। গ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অমুসলিমদের জন্য অনুরূপভাবে আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং বাড়তি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করারও অধিকার থাকবে।

৪. যে সকল প্রদেশে আসন সংরক্ষিত হয়েছে সেগুলিতে দশ বৎসরের জন্য তা বহাল থাকবে।

৫. বোম্বে থেকে সিন্ধুকে পৃথক করে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ করা হবে, এক্ষেত্রে তার অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে তা কার্যকর হবে।

৬. নতুন প্রদেশসমূহ অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় সরকার গঠন করবে।[১০৩]

নেহরু রিপোর্টের ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র। কংগ্রেসের মুসলিম সদস্যগণ যেমন- আবুল কালাম আজাদ, এম এ আনসারী, মাহমুদাবাদের রাজা এবং ডাঃ সাইফুদ্দিন কিচলু নেহরু রিপোর্ট গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন। পুরাতন খেলাফত আন্দোলনকারীদের মওলানা মুহম্মদ আলী এর তীব্র বিরোধী ছিলেন; মুসলিম লীগের অপর দল মহম্মদ শফির নেতৃত্বে এই রিপোর্ট সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে এবং জিন্নাহ শর্ত সাপেক্ষে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে জিন্নাহর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সর্বদলীয় কনভেনশনে প্রেরণ করা হয় নেহরু রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করার জন্য। বাংলা এবং পাঞ্জাবের জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন সংরক্ষণ, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে এক-তৃতীয়াংশ মুসলিম প্রতিনিধিত্ব প্রদান এবং ভারতীয় ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলিকে ক্ষমতা অর্পনের ব্যাপারে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেন। কিন্তু সর্বদলীয় কনভেনশন এই সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।[১০৪]

Dhaka University Institutional Repository

এই রিপোর্টে নির্বাচনের ব্যাপারে যে সুপারিশ রাখা হয়েছে তা মুসলমানদের হতাশ করে।[১০৫] নেহরু রিপোর্টে শুধুমাত্র মুসলমানদের দাবীকেই বর্জন করা হয়নি, অধিকন্তু ১৯১৬ সালের হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকেও অস্বীকার করেছে। এতে, মুসলমানদের বৃহৎ অংশ মনে করে যে তারা বঞ্চিত হয়েছে।[১০৬]

সর্বদলীয় কনভেনশন কর্তৃক নেহরু রিপোর্ট গৃহীত হলে জিন্নাহ 'নেহরু রিপোর্টের প্রস্তাবগুলিকে মুসলমানদের প্রস্তাবের বিপক্ষে হিন্দুদের প্রস্তাব' বলে উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি মুসলিম দাবীসমূহ বিন্যস্ত আকারে প্রকাশ করেন, ইতিহাসে যা 'চৌদ্দ দফা' নামে পরিচিত।[১০৭] ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে সর্বদলীয় মুসলিম কনফারেন্সের পক্ষ থেকে এই প্রসিদ্ধ 'চৌদ্দ দফা' তিনি ঘোষনা করেন।[১০৮] এগুলি হলো ঃ

১. ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের গঠন ফেডারেল পদ্ধতিতে হবে এবং প্রদেশের হাতে অবশিষ্ট ক্ষমতা ন্যস্ত করতে হবে।

২. সকল প্রদেশকে স্বায়ত্বশাসন প্রদানের সম-ব্যবস্থা দিতে হবে।

৩. কোন প্রদেশের সংখ্যাগুরুকে সংখ্যালঘুতে পরিণত না করে, প্রত্যেক প্রদেশে সংখ্যালঘুদের পর্যাপ্ত এবং কার্যকর প্রতিনিধিত্বের উপর ভিত্তি করে দেশের সকল আইন পরিষদ ও অন্যান্য নির্বাচিত সংস্থাগুলিকে পুনঃর্বিন্যাস বা পুনঃগঠিন করতে হবে।

৪. কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব এক-তৃতীয়াংশের কম হতে পারবে না।

৫. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব হবে বর্তমানের ন্যায় পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে, তবে যে কোন সম্প্রদায় যে কোন সময় ইচ্ছা করলে যেন পৃথক নির্বাচন বাদ দিয়ে যুক্ত নির্বাচনে অংশ নিতে পারে।

৬. ভূখন্ডগত কোন পুনঃর্গঠন কখনও প্রয়োজন হলে তা এমনভাবে হতে পারবে না যাতে পাঞ্জাব, বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ক্ষুন্ন হয়।

৭. সকল সম্প্রদায়কে তাদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা তথা - বিশ্বাস, ধর্মকর্ম, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন, প্রচার, সংস্থা গঠন এবং শিক্ষার স্বাধীনতা দিতে হবে।

৮. কোন আইন বা প্রস্তাব অথবা এর কোন অংশবিশেষ কোন আইন পরিষদ বা কোন নির্বাচিত সংস্থায় পাশ হতে পারবে না, যদি কোন সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য সে আইন বা প্রস্তাবকে ঐ সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী বলে প্রত্যাখ্যান করে।

৯. বোম্বে প্রেসিডেন্সী থেকে সিন্ধুকে পৃথক করতে হবে।

১০. অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানেও সংস্কার প্রবর্তন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১১. সকল রাষ্ট্রীয় ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের চাকুরীতে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখে অন্যান্য ভারতীয়দের ন্যায় মুসলমানদেরকে পর্যাপ্ত অংশ প্রদানের আইন শাসনতন্ত্রে থাকতে হবে।

১২. মুসলমানদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ব্যক্তিগত আইন সংরক্ষণ এবং মুসলমানদের শিক্ষা, ভাষা, ধর্ম, মুসলমান দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন এবং রাষ্ট্র ও স্বশাসিত সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানসমূহে তাদের ন্যায্য পাওনা রক্ষা করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকতে হবে।

১৩. কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ আনুপাতিক হারে মুসলমান মন্ত্রী ছাড়া কোন কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করা যাবে না।

১৪. ভারতীয় ফেডারেশনে অন্তর্ভূক্ত রাষ্ট্রসমূহের সম্মতি ছাড়া কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক শাসনতন্ত্রে কোন পরিবর্তন করা যাবে না।[১০৯]

ইতিপূর্বে বৃটিশ সরকার ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক সমস্যা নিরসনের লক্ষে স্যার সাইমন এর নেতৃত্বে ১৯২৭ সালের নভেম্বরে একটি কমিশন নিয়োগ করে। বৃটিশ পার্লামেন্টের সাতজন সদস্য সম্বলিত এ কমিশন ভারতে দু'বার দীর্ঘ সফর করে। প্রথম সফর ৩রা ফেব্রুয়ারী থেকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় সফর ১৯২৮ সালের ১১ই অক্টোবর থেকে ১৯২৯ সালের ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। যেহেতু ভারতীয় কোন সদস্য এতে অন্তর্ভূক্ত করা হয় নাই সেইহেতু কংগ্রেস এ কমিশনের সাথে কোন রকম সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকে। অন্যদিকে জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ একে বয়কট করে, কিন্তু লাহোরের মিয়া মুহাম্মদ শফীর নেতৃত্বাধীন লীগ এর সঙ্গে সহযোগিতা করে। দুটি প্রধান দলের অসহযোগিতা সত্বেও সায়মন কমিশন ১৯৩০ সালে দুখন্ডে তার রিপোর্ট প্রকাশ করে। রিপোর্টে কমিশন দ্বৈত সরকার বিলোপ এবং প্রদেশের হাতে স্বায়ত্বশাসন দিয়ে ফেডারেল পদ্ধতির সরকার গঠনের সুপারিশ করে। আরও সুপারিশ করে যে, পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি রাখা হোক এবং মুসলিম সংখ্যালঘু এলাকাগুলিতে তাদের আসন সংরক্ষণ করে (Weightage) দেয়া হোক। অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে সিন্ধুকে বোম্বে থেকে পৃথক করা হোক।[১১০]

বৃটিশ সরকার সাইমন রিপোর্ট আলোচনার জন্য লন্ডনে বিশিষ্ট ভারতীয়দের গোল টেবিল বৈঠক আহবান করেন।[১১১] 'কিন্তু ভারতকে তাৎক্ষণিক ডোমিনিয়নের মর্যাদা প্রদান করতে হবে' - কংগ্রেসের এই দাবী বৃটিশ সরকার প্রত্যাখ্যান করায় কংগ্রেস ১৯৩০ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকে অনুপস্থিত থাকে এবং ভারতে সংঘবদ্ধভাবে তারা অসহযোগ পরিচালনা করে। অতঃপর ভাইসরয় লর্ড আরউইন (যিনি ১৯২৯ সালের ৩১শে অক্টোবর নতুন শ্রমিক দলীয় সরকারকে নিশ্চিত করান যে, বৃটিশ নীতির লক্ষ্যই হলো

Dhaka University Institutional Repository

ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা প্রদান করা) এবং গান্ধীর মধ্যে ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসে আলোচনার পর 'গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট' সম্পন্ন হলে, ১৯৩১ সালের দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের একক প্রতিনিধি হিসাবে গান্ধী উপস্থিত থাকেন। বৈঠকে মুসলিম প্রতিনিধিগণ জিন্নাহর 'চৌদ্দ দফা' দাবী পেশ করেন এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবী না মানলে তারা কেন্দ্রের দায়িত্বপূর্ণ সরকারের পক্ষে প্রতিজ্ঞা করতে অস্বীকার করেন। এর ফলে মুসলিম প্রতিনিধি এবং গান্ধীর মধ্যে আপোষ অসম্ভব হয়ে পড়ে।[১১২]

তখন ১৯৩২ সালের আগষ্টে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড 'Communal Award'এর দ্বারা প্রাদেশিক পরিষদ সমূহে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিরূপণ করে। এর দ্বারা পৃথক নির্বাচন বহাল রাখা হয়। মুসলিম সংখ্যালঘু অঞ্চলসমূহে মুসলমানদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। একইভাবে, ইউরোপীয়দের জন্য বাংলায় ও আসামে, শিখদের জন্য পাঞ্জাবে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং হিন্দুদের জন্য সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আসন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। অর্থনৈতিক কারণ দর্শিয়ে সিন্ধুকে পৃথক করার পরিকল্পনা স্থগিত করা হয় । তবে, এই Award শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাব এবং বাঙলার আইন পরিষদে আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দানে ব্যর্থ হয়। তথাপি প্রদেশদ্বয়ের বিশেষ স্বার্থে প্রতিনিধিত্ব প্রদান করা হলেও, মুসলমানরা এর সুফলতাকে অস্বীকার করে, আর অমুসলিমরা এই ব্যবস্থাকে তাদের জন্য ক্ষতিকর বলে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। সুতরাং এই অকার্যকর ক্ষমতা (negative power) অধিকাংশ মুসলমানকেই অসন্তুষ্ট করে।[১১৩]

উল্লেখ্য যে, ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর এলাহাবাদে ডঃ মুহম্মদ ইকবাল সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সভাপতির ভাষণে বলেন যে, 'পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তানকে একত্রে যুক্ত করে একটি একক রাষ্ট্র দেখতে চান'।[১১৪] ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে কেম্ব্রিজের আইনের ছাত্র পাঞ্জাবের চৌধুরী রহমত আলী (১৮৯৭-১৯৫১) 'Now or Never' নামক একটি পুস্তিকায় পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মির এবং বেলুচিস্তান নিয়ে একটি পূর্ণ স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, এই এলাকা পূর্ব থেকেই একটি জাতির আবাসভূমি - পাকিস্তানের মুসলমানদের। (This area was already the home of a nation, the Muslims of Pakistan)।[১১৫]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৩ সালে মুসলিম রাজনীতিবিদগণ এই প্রস্তাব পেশ করলে পার্লামেন্টারী জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি ভারতীয় সাংবিধানিক সংস্কারে পাকিস্তান পরিকল্পনা 'একটি ছাত্রের পরিকল্পনা যা' উদ্ভট ও 'অবাস্তব' বলে একে বাতিল করে দেয়।[১১৬]

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে, মুসলমানদের জন্য ৪৮২টি নির্ধারিত আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ জয়লাভ করে মাত্র ১০৯টি আসন। এর মধ্যে পাঞ্জাবে ৭টি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ২টি আসন লাভ করে। বাংলায় ১১৭টি আসনের মধ্যে ৩৯টি লাভ করে। যুক্ত প্রদেশে লীগ ৬৬টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৩৫টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২৯টি আসন পায়। কংগ্রেসী মুসলমানরা ভাল করতে পারেনি। কংগ্রেসের মনোনীত একটি মুসলমান প্রার্থীও বাংলা, সিন্ধু, পাঞ্জাব, আসাম, বোম্বে, মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যায়ও একটি মুসলিম আসন লাভ করেনি। এগুলির মধ্যে কংগ্রেস মাত্র ২৬টি আসন লাভ করে, বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বিহার এবং মাদ্রাজে।[১১৭]

এই নির্বাচনে বাঙলায় কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করায় সেখানে কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য এ,কে, ফজলুল হক কংগ্রেসের সহযোগিতা কামনা করেন। কিন্তু কংগ্রেস তাতে সম্মত না হওয়ায় মুসলিম লীগের সঙ্গে তাঁর সমঝোতা হয়।[১১৮] উল্লেখ্য যে, পূর্বেই স্যার আল্লামা ইকবাল ১৯৩৬ সালের ২৩শে আগষ্ট সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে লিখিত এক পত্রে মুসলিম লীগের সঙ্গে ফজলুল হক এর সমঝোতার সুফল সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করে লিখেছিলেন যে, 'যেহেতু কৃষক প্রজাপার্টি একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল সেইহেতু সেই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সমঝোতা স্থাপন ভবিষ্যতে আপনার সহায়ক হতে পারে' (Since the Proja Party is non-communal like the Unionist, your compromise in Bengal may be helpful to you)।[১১৯]

১৯৩৭ সালের ১৫ই অক্টোবর লীগ কাউন্সিল সভায় ফজলুল হক প্রকাশ্য মুহম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্ব স্বীকার করে তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করেন।[১২০]

লক্ষ্ণৌ অধিবেশন বাঙলার মুসলিম লীগের রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। প্রথমতঃ এটা মন্ত্রিত্বের স্থায়িত্ব এনে দেয় ও বাংলার মুসলমানদের উপর ফজলুল হকের নেতৃত্বকে শক্তিশালী করে। দ্বিতীয়তঃ এরফলে লীগ বাঙলার একমাত্র মুসলিম রাজনৈতিক দল হিসেবে এর পরিচয় প্রতিষ্ঠা করে। অতঃপর বাঙলায় লীগ রাজনীতি সুদৃঢ়করণ শুরু হয়।[১২১]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৭ সালের অক্টোবরে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে ফজলুল হক বলেন ঃ No settlement with (the) majority community is possible as no Hindu leader speaking with any authority shows any concern or any genuine desire for it. Honourable settlement can only be achieved between equals and unless the two parties learn to respect and fear each other, there is no solid ground for settlement. Offers of peace by the weaker party always mean confession of weakness and invitation to aggression. Politics means power and not relying only on cries of justice or fair-play or good will. [১২২]

১৯৩৮ সালের অক্টোবরে সিন্ধুর প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে জিন্নাহ প্রস্তাব দিয়ে বলেনঃ This Sind Muslim League conference considers it absolutely essential in the interests of abiding peace of the Vast Indian continent and in the interests of unhampered cultural development, the economic and social betterment and political self-determination of the two nations, known as Hundus and Muslims, that India may be divided into two federations, viz, the federation of Muslim states and the federation of Non-Muslim states." [১২৩]

কংগ্রেস সরকার গঠিত হবার পর ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে বাঙলার ফজলুল হক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যা পরবর্তীকালে "Muslim sufferings under Congress Rule" নামক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে বলেন 'তারা (কংগ্রেস) সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের উপর তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে চায় এবং তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল? ... দেবী গরুকে (Mother cow) অবশ্যই রক্ষাকরণ ... মুসলমানদের কোনভাবেই গরুর মাংস ভক্ষণ বিবেচনা করা হবে না ... মুসলমান ধর্মকে হেয় করা, কারণ, এই ভূমি কি হিন্দুদের ছিল না? এ কারণে আজান নিষিদ্ধ করা, মসজিদে নামাজে রত ব্যক্তিদের আক্রমণ করা, নামাজের সময় মসজিদের সম্মুখ দিয়ে জাঁকজমক সহকারে আনন্দ উল্লাস মিছিলের উপর জোর দেওয়া। ... আশ্চর্য্যজনক ছিল যে, ঐ দুঃখজনক ঘটনা অনুসরণ করেছিল দুঃখজনক ঘটনাকেই? (Was it strange, then, that tragedy followed tragedy?)[১২৪]

অতঃপর ঐ বক্তব্যে বিহারে সংঘটিত ৭২টি ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল এবং উত্তর প্রদেশে ৩৩টি এবং মধ্য প্রদেশের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা হয়েছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ 'বিদ্যামন্দির' (Temple of learning) করলে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে তা আঘাত করে। কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে লীগের অভিযোগ দীর্ঘদিন যাবৎ ছিল। লীগের অভিযোগ হল, কংগ্রেস শাসনকালে

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী হিন্দু কর্মকর্তারা মুসলমান কর্মকর্তাদের সঙ্গে যে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী প্রদর্শন করতো, কংগ্রেস তার প্রতিকারের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতো না। [১২৫] সুতরাং, কংগ্রেসের চেষ্টার ত্রুটি, মুসলিম দলসমূহের নেহরু রিপোর্ট গ্রহণে অস্বীকৃতি এবং জিন্নাহর প্রস্তাবিত "চৌদ্দ দফা" 'প্রত্যাখ্যান' - ভারত বিভক্তির পথ রচনার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিল।[১২৬]

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লীগের গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক অধিবেশনে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শত সহস্র মুসলমান জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করে, জিন্নাহ তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন ঃ It is extremely difficult to appreciate why our Hindu friends fail to understand the real nature of Islam and Hinduism . . . it is a dream that the Hindus and Muslims can ever evolve a common nationality. This misconception of one Indian notion has gone far beyond the limits and is the cause of most of our troubles and will lead India to destruction if we fail to revise our notions in time. The Hindus and Muslims belong to two different religious philosopies, social customs, literature. . . . Their aspects on life and of life are different. It is quite clear that Hindus and Mussalmans derive their inspirations from different sources of history. They have different epics, their heroes are different, and different episodes. .... To yoke together two such nations under a single state, one as a numerical minority and the other as a majority, must lead to growing discontent and final destruction of any fabric that may be so built up for the government of such a state. [১২৭]

অতঃপর ১৯৪০ সালের মার্চে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয় যা ইতিহাসে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত।[১২৮] প্রকৃতপক্ষে লাহোর লীগ ছিল ভারতের ইতিহাসে এবং মুসলমানদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ, এর পূর্বে মুসলমানদের রাজনীতি এবং অভিপ্রায় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য ছিল না এবং তাদের স্বার্থের মধ্যেও স্বতন্ত্রতা ও দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু এখন ভারতের মুসলমানরা সংগঠিত হয় এবং সকল কিছুর চাইতে তাদের সংগঠনের গুরুত্ব অধিক - এ কথা তারা অনুধাবন করে।[১২৯] এরপর লীগ নেতৃবৃন্দ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করতে শুরু করেন।[১৩০]

১৯৪০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর সর্বভারতীয় হিন্দু মহাসভা মাদ্রাজের সেথুপটি হাইস্কুলে তিনদিন ব্যাপী এক সম্মেলন করে। এই সম্মেলনে দুই হাজার প্রতিনিধি এবং হাজার হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি দেওয়ান বাহাদুর কে.এস, রামেস্বমী বলেন ঃ Hindu Mahasabha was not sectarain but a pan-Hindu national organisation including the Harijans, Sanatanists,

Dhaka University Institutional Repository

Buddhists, Sikhs and others within its folds. …They must both work for Hindu social unity and uplift. The aim of the Sabha was the protection and promotion of the strength and glory of the Hindu race, Hindu culture, Hindu civilisation and Hindu politic. Its objects were the organisation and consolidation of Hindu interests and rights ... Let us clearly tell Mr. Jinnah `India is our goal for which Hindus will live and die. It is not a counter for bargaining pakistan shall never be while we are alive.[১৩১]

বাংলায় উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রকাশ দেখা যায় বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে পরিচালিত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মধ্যে, যে আন্দোলনকারীরা "মা কালী - কে কেন্দ্র করে" বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মহারাষ্ট্রের তিলকের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন এবং বাঙলায় সন্ত্রাসবাদীদের আন্দোলন - দুইই ছিল শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি বহির্ভূত সহিংস আন্দোলন। এই আন্দোলনকারীগণ হিন্দুযুগের গৌরবোজ্জল অধ্যায় জনগণের সামনে তুলে ধরেছিল যে কারণে স্বাভাবিকভাবে মুসলিম নেতাগণ আশংকিত হয়ে পড়েছিলেন।[১৩২]

১৯৪২ সালে গান্ধী ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়' এর দাবী তুললে জিন্নাহ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। কারণ, তাঁর আশংকা ছিল যে, ইংরেজ ভারত ত্যাগ করলে হিন্দু প্রধান কংগ্রেসের হাতে ভারতের শাসন-ক্ষমতা চলে যাবে।[১৩৩]

১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগ বাংলায় যখন পুনরায় ক্ষমতাসীন হয় সেই সময়ে সর্বভারতব্যাপী পাকিস্তান আন্দোলন চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল।[১৩৪] মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নেতা এবং কর্মীদের সাংগঠনিক সাফল্য এ কার্য্যকে ত্বরান্বিত করেছিল ।[১৩৫]

বাংলায় মুসলিম লীগের আধিপত্য স্থাপন নিঃসন্দেহে এখানকার রাজনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর ফলে মুসলিম লীগ প্রকৃত পক্ষে মুসলমানদের মুখপত্র হিসেবে পরিগণিত হল। বাঙলার সাধারণ মুসলমানদের নিকট মুসলিম লীগের পতন বা উন্নতি তাদের সম্প্রদায়েরই পতন বা উন্নতি বলে বিবেচিত হতে থাকে।[১৩৬] সুতরাং দেখা যায় যে, মুসলমান গণমানসের সম্বুদ্ধ চেতনার জন্যই লীগের প্রভাব এতখানি বৃদ্ধি পায়, এতে মুসলিম লীগের সংগঠন ও প্রকৃতির বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন সংঘটনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক প্রভাবও আশ্চর্য্য রকম বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনে বাঙালি মুসলমানগণ পাকিস্তানের প্রতি তাদের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ঘোষণা করে এবং ১২১টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৩টিতে মুসলিমলীগ সদস্যকে নির্বাচিত করে; যে নির্বাচন সমগ্র ভারতে মুসলমানদের নিকট পাকিস্তান ইস্যুকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল।[১৩৮] আর পাকিস্তান আন্দোলনের অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা বাঙলার দারিদ্র-পীড়িত মুসলিম জনসাধারণের নিকট যথেষ্ট আকর্ষণীয় ছিল বিধায় বাঙলার কৃষক সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে মুসলিম লীগকে ভোট প্রদান করেছিল।[১৩৯] ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনের ফল থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম জনমত সম্পূর্ণরূপে লীগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত যেমন-কংগ্রেস কর্তৃক হিন্দু জনমত নিয়ন্ত্রিত।[১৪০]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্ত হওয়ার পর ১৯৪৬ সালে বৃটিশ সরকার ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ভারত প্রশ্নের সমাধানের জন্য সিমলা কনফারেন্স এর সূত্রপাত করে যা একটি সাধারণ নির্বাচন ও ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান এর দ্বারা অনুসরণ করা হয়।[১৪১] ১৯৪৬ সালের মার্চে লন্ডনের বৃটিশ সরকার লর্ড পেথিক লরেন্স (১৮৭১-১৯৬১), স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং এ.ভি, আলেকজান্ডার (১৮৮৫-১৯৬৫) এর সমন্বয়ে গঠিত ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণ করেন। আলোচনায় জিন্নাহ তাঁর 'ছয়-প্রদেশ পাকিস্তান' এর দাবীতে অবিচল থাকেন অন্যদিকে, এই দাবির বিরুদ্ধে কংগ্রেস দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। এই অচলাবস্থায় ক্যাবিনেট মিশন তিন-ধাপের ফেডারেশন (Three-tiered federation) এর প্রস্তাব নিয়ে অগ্রসর হয় যাতে ছয় 'পাকিস্তান প্রদেশ সমূহ' ছিল, যেমন- দুইটি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ এবং পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশসমূহ। তবে বৈদেশিক, প্রতিরক্ষা এবং যোগাযোগ ভারতীয় ইউনিয়নের হাতে ন্যাস্ত থাকবে।[১৪২]

১৯৪৬ সালের ১৬ই মে ক্যাবিনেট মিশন তার নিজস্ব পরিকল্পনা প্রকাশ করে। এই মিশন ভারতীয় প্রদেশগুলিকে ক, খ, গ- এই তিনটি সেকশনে বিভক্ত করে। সেকশন ক এর অর্ন্তভূক্ত করা হয় মাদ্রাজ, বোম্বে, মধ্যপ্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ এবং বিহার। সেকশন খ- উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং সিন্ধু নিয়ে গঠিত। আর সেকশন গ-এ ছিল বাঙলা এবং আসাম। এই সাংবিধানিক পরিকল্পনায় একটি অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার (Interim Government) গঠনেরও প্রস্তাব করা হয়।[১৪৩] আর এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বলা হয়, প্রধান দুটি দলের যে কোন একটি অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে ভাইসরয় অন্যান্য দল বা গ্রুপকে এ সরকারে যোগ দিতে বলবেন।[১৪৪]

অতঃপর ৬ই জুন মুসলিম লীগ কাউন্সিল ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনাটি গ্রহণ করে লর্ড ওয়াভেল এর নিকট থেকে এই নিশ্চয়তা লাভের পর যে, যদি লীগ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করার পর কংগ্রেস যদি পরবর্তীকালে

Dhaka University Institutional Repository

এই পরিকল্পনাকে বর্জন করে, তবে ইতিপূর্বে ১৬ই মে এর মিশনের ভাষ্য অনুযায়ী লীগ নতুন একটি অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার প্রবর্তন করবে।[১৪৫]

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও এর অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারে যোগদানের প্রস্তাবকে বর্জন করে। ২৫শে জুন ক্যাবিনেট মিশন জিন্নাহকে এই মর্মে অবহিত করে যে, যেহেতু কংগ্রেস অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে ইচ্ছুক নয় সেইহেতু লীগকে সরকার গঠনে আমন্ত্রণ জানানো যাচ্ছে না। ফলে, ১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই মুসলিম লীগ আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনাকে প্রত্যাহার করে এবং 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৬ই আগষ্ট মুসলমানদের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' এর ডাক দিয়ে জিন্নাহ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ "Never have we in the whole history of the league done anything except by constitutional methods and by constitutionalism". " But now . . . we bid goodbye to constitutional methods", "we have exhausted all reason", "There is no tribunal to which we can go. The only tribunal is the Muslim nation."[১৪৬]

অতঃপর ১৯৪৬ সালের ১৬ থেকে ২০শে আগস্ট ভয়াবহ কলকাতা হত্যাকান্ড (Great Calcutta Killing) সংঘটিত হয় যা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলশ্রুতি ছিল এবং এই ঘটনায় কমপক্ষে ৪ হাজার নিহত এবং ১৫ হাজার লোক আহত হয়। বিহারে ৭ হাজার মুসলমান এবং বাঙলার নোয়াখালী জেলায় স্বল্প সংখ্যক হিন্দু নিহত হয়েছিল। ইতিমধ্যে জওহরলাল নেহরু অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করেন, কিন্তু মুসলিম লীগ প্রথমে তাতে যোগদান করতে অস্বীকার করলেও পরে যোগদান করে। তবে জিন্নাহ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার অধীন গণপরিষদে যোগদান না করার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন। আর কংগ্রেস বাধ্যতামূলক প্রাদেশিক শ্রেণী বিন্যাস (Compulsory grouping of provinces) মেনে নিতে অস্বীকার করে। এর ফলে সাংবিধানিক বন্দোবস্তের (Constitutional settlement) অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ হয়ে যায়।[১৪৭] ভারতের সবর্ত্র পাকিস্তান ও অখন্ড হিন্দুস্তানের দাবিতে দুই সম্প্রদায় হিন্দু এবং মুসলমান পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও তিক্ততা অবসানের বিষয় চিন্তা করে কংগ্রেস ভারত বিভাগের অনিবার্যতা অনুধাবন করে।[১৪৮]

দেশ বিভাগের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল তাই বলেন যে, 'আমরা পছন্দকরি আর নাই করি ভারতবর্ষে দুটি জাতি রয়েছে। তিনি এখন বুঝতে পেরেছেন, হিন্দু ও মুসলমানকে এক জাতিতে একতাবদ্ধ করা যাবে না। এ সত্যকে স্বীকৃতি না দিয়ে আর কোন বিকল্প নেই। এ পথেই কেবল

Dhaka University Institutional Repository

আমরা হিন্দু-মুসলিম বিবাদের মীমাংসা করতে পারি।' তিনি উদাহরণসহ আরও বলেন, 'যদি দু'ভাই একত্রে না থাকতে পারে, তারা আলাদা হয়ে যায়। তাদের স্ব স্ব অংশ নিয়ে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর তারা আবার বন্ধু হয়। আর যদি তাদের একত্রে থাকতে জোর করা হয় তবে তারা প্রত্যেকদিনই ঝগড়া করে। প্রত্যেকদিন খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়া করার চাইতে একটি সুস্পষ্ট বিরোধ হওয়া এবং তারপর আলাদা হয়ে যাওয়া অনেক ভাল।'[১৪৯] জওহরলাল নেহরু, বল্লভ ভাই প্যাটেল এর সঙ্গে গান্ধীও দেশ বিভাগ অনিবার্য্য বলে মেনে নেন।[১৫০]

১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হয়ে আসেন এবং ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে মিশনের সঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ১৯৪৭ সালের ২রা জুন 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা' ঘোষিত হয়। তাতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের মুসলিম দাবিকে স্বীকার করা হয়। ১৮ই জুলাই বৃটিশ পার্লামেন্টে "Indian Independence Act' পাশ হয় এবং বলা হয় - "As from the fifteenth day of August, nineteen hundred and forty seven, two independent Dominions shall be set up in India, to be known respectively as India and Pakistan." সেই অনুযায়ী ১৫ই আগষ্ট বৃটিশ ভারতে পাকিস্তান এবং বর্তমান ভারত রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।[১৫১]

সুতরাং, কুড়ি শতকে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন জোরদার হয়ে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল তার পটভূমি রচিত হয়েছিল উনিশ শতকে এবং ১৯০৫ সাল নাগাদ এটি একটি সুস্পষ্ট আকার লাভ করে।[১৫২]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. Percival Spear, *The Oxford History of Modern India 1740-1975*, Second Edition, (Delhi and Madras : Oxford University Press, 1978), p.2

২. বিস্তারিত/W.W. Hunter বিবরণের জন্য দেখুনঃ 'Annals of Rural Bengal', 7th ed. London, smith ; Elder, And Co. 1897.

৩. *The Third Report of the Select Committee of the House of Commons on the Nature, State and Condition of* E.I. Co. (1773) pp.311-12. J.C. Sinha এর *Economic Annals of Bengal* (London : Macmillan and co. limited, 1927), গ্রন্থে উদ্ধৃত, pp.41-42

৪. Steuart, *The Principles of Money Applied to the Present State of the Coin of Bengal*, 1772, pp.57-62, J.C. Sinha, কর্তৃক প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, p.42.

৫. Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal (1884-1912),* (Bangladesh: Oxford University Press, 1974), pp.7-8.

৬. *Ibid*.

৭. Philip Hartog, *Some Aspects of Indian Education : Past and Present*, p.13; উদ্ধৃতঃ Sufia Ahmed, p.8.

৮. W.W. Hornell, B.A. *Progress of Education in Bengal,* 1902-03----1906-07. Third Quinquennial Review, (Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot, 1907), p.159.

৯. Act xxix of 1837; Substitution of the Vernacular Languages for the Persian in Judicial Proceedings Board's Collections 73770. উদ্ধৃতঃ ঐ, pp.8-9

১০. Sufia Ahmed, *op cit.*, p.9.

১১. *Ibid*, pp.9-10.

১২. Nurullah S., and Naik, J.P., *A History of Education in* India, p.202; উদ্ধৃতঃ Sufia Ahmed, p.10

১৩. *The Aligarh Institute Gazette, Dated August 8,* 1882, উদ্ধৃত Ram Gopal, *Indian Muslims: A Political History 1858-1947,* NewYork: 1959), p.56

১৪. P. Hardy, *The Muslims of British India*, (Cambridge At the University Press, 1972.) pp.37-38

Dhaka University Institutional Repository

১৫. সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *বাংলাদেশঃ জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা গণতন্ত্র*, (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃঃ ৩১-৩২।

১৬. *ঐ*, পৃঃ ৩৬-৩৮, ৩৯-৪১,৪৩ ।

১৭. M. Fazlur Rahman, *The Bengali Muslims and English Education* (Dacca: 1973), p.18. উদ্ধৃত : Chandiprasad Sarkar, *The Bengali Muslims* : A Study in their Politicization, 1912-1929, (Calcutta: K.P. Bagchi and Company, 1991), p. 4-5.

১৮. N.S. Bose, *Indian Awakening and Bengal,* (Calcutta: 1976), p.15

১৯. Safiuddin Joarder, "The Bengal Renaissance and the Bengali Muslims : Some Reflections", David Kopf and Safiuddin Joarder(ed.), *Reflections on the Bengal Renaissance.* (Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1977), p. 43.

২০. আ.ফ. সালাহউদ্দীন আহমদ, "উনিশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও কর্মকান্ড", সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)* প্রথম খন্ড, (এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশঃ (বাংলা সংস্করণ)ঃ ১৯৯৩), পৃঃ ২৮৪-২৮৫ ।

২১. Muinuddin Ahmed Khan, 'Muslim Struggle for Freedom',*East Pakistan (A Profile)*, Ed. by Dr. S. Sajjad Husain, (London: Orient Longmans Limited, 1962), pp. 71-72.

২২. অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, (কলিকাতাঃ, ১৩৮১), পৃঃ ১৪৭।

২৩. সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৪-৪৫

২৪. Mushirul Haq, " Religion and Muslim Politics in Modern India' ; Iqbal A. Ansari(ed.), *The Muslim Situation in India*, (Dhaka: Academic Publishers, 1989), p. 61.

২৫. সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৬

২৬. W.S. Blunt, *India Under Ripon*, (London:1909), p.97. উদ্ধৃতঃ সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *ঐ*, পৃ: ৪৭-৪৮।

২৭. সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *ঐ*, পৃঃ ৪৮-৪৯ ।

২৮. P. Hardy, *op cit.*, p. 102.

২৯. A.F. Salahuddin Ahmed, *Bangladesh: Tradition and Transformation*, (Dhaka: University Press Limited, 1987), pp. 47-50.

৩০. সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ১৯৯১), পৃ: ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

৩১. K.K. Aziz (ed.) *Ameer Ali: His Life and Works*, (Lahore, 1968), p.68. সালাহ্উদ্দীন আহমদ, কর্তৃক উল্লেখিত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ: ৬৩ ।

৩২. সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *বাংলাদেশঃ জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা গণতন্ত্র, প্রাগুক্ত*, পৃ: ৫৩ ।

৩৩. Sultan Jahan Salik(ed.), *Muslim Modernism in Bengal Selected Writings of Delawarr Hosaen Ahmed Meerza 1840-1913*, Vol.I, (Dacca: Centre for Social Studies, 1980), p.116.

৩৪. P. Hardy, *op cit.*, p.125.

৩৫. R.C. Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*, Vol.I, p.433.

৩৬. দেখুন ঃ সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ, প্রাগুক্ত*, পৃ: ৬৭-৬৮ এবং "উনিশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও কর্মকান্ড", সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত *বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খন্ড), প্রাগুক্ত*, পৃ: ২৮৩-২৮৪ ।

৩৭. *The Imperial Gazetteer*, Vol.II, p.269, (Oxford: 1908),

৩৮. See: A.R. Mallick, "The Muslims and the Partition of Bengal 1905", *A History of the Freedom Movement*, vol.III, 1906-1936, part-I, (Karachi : Pakistan Historical Society, 1961)

৩৯. P. Hardy, *op cit.*, p.149.

৪০. A.R. Mallick, *op cit.*, p.15.

৪১. P. Hardy, *op cit.*, p.150.

৪২. *Ibid.*

৪৩. K. Salimolla: 'The New Province - Its Future Possibilities', *Journal of the Moslem Institute*, Vol.I, No.4, Apr.-June, 1906, pp.410-411. উদ্ধৃতঃ J.H. Broomfield, *Elite Conflict in a Plural Society : Twentieth Century Bengal*, (University of California Press: 1968). p.45.

৪৪. *Moslem Chronicle*, 9 September, 1905, p.361, A.R. Mallick কর্তৃক প্রাগুক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত, p.16.

৪৫. *Ibid*, 14 October,1905, p.422, *Ibid*, pp.16-17

৪৬. *Ibid*, 21 October,1905, p.6, *Ibid*, pp.17

Dhaka University Institutional Repository

৪৭. General Report of the Census of India, 1901, p.175 উদ্ধৃতঃ জন. আর. ম্যাকলেন, "বঙ্গবিভাগ(১৯০৫)ঃ হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক", সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, প্রথম খন্ড, (এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ: ৩৩৩ ।

৪৮. General Report of the Census of India, 1901, p.217, উদ্ধৃতঃ *ঐ*, পৃ: ঐ ।

৪৯. জন. আর. ম্যাকলেন, *ঐ*, পৃ: ৩৩৫ ।

৫০. হুমায়ুন কবির, *মোসলেম রাজনীতি*, (কলিকাতাঃ পূর্ব্বাশা লিমিটেড, ১৩৫২), পৃ: ৭ ।

৫১. Matiur Rahman, " The Simla Deputation on 1906", *Journal of the Asiatic Society of Pakistan"* Vol.xv, No.I, April, 1970,(Published by the Asiatic Society of Pakistan), p.83.

৫২. সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *বাংলাদেশঃ জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা গণতন্ত্র, প্রাগুক্ত*, পৃ: ৫৮ ।

৫৩. G.S. Chhabra, *Advanced Study in the History of Modern India*, Vol.II, (Jullundur city: 1962), p.270.

৫৪. Abdul Hamid, *Muslim Separatism in India: A brief survey (1858-1947).* (Panjab: Oxford University Press, 1967), p.60

৫৫. *Amrita Bazar Patrika*, 14 December,1905, উদ্ধৃতঃ Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908*, (New Delhi: People's Publishing House, 1977), p.412.

৫৬. See: India Office Tract, 1037, All About Partition. pp.56-86, 131-32; I*bid*, The Case Against Break-up of Bengal, pp.36-40; Friend of India and Statesman, 10 August, 1905, উদ্ধৃতঃ A.R. Mallick, *op cit.*,p. 18.

৫৭. A.R. Mallick, *op cit.*, p.19.

৫৮. Surendranath Banerjee, *A Nation in Making*,(Second Inpression, Humphrey Milford, Oxford University Press : London New York, Toronto Mellourne Bomboy Calcutta Madras : 1925) p.191.

৫৯. Sufia Ahmed, *op cit.*, p.258.

৬০. Surendranath Banerjee, *op cit.*, p.228.

৬১. *The Partition of Bengal (1905-1911)*, Select Documents, edited by V.K. Saxena, (Delhi: Kanishka Publishing House, 1987), p.62.

৬২. আসহাবুর রহমান, "বঙ্গভঙ্গ ও ভদ্রলোক শ্রেণী", মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত *বঙ্গভঙ্গ*, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), পৃ: ৪৬-৪৭

Dhaka University Institutional Repository

৬৩. শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৪৭)*, ৪র্থ খন্ড, (কলিকাতাঃ জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৫), পৃ: ২৪ ।

৬৪. *The Amrita Bazar Patrika*, Monday, September 11, 1905, p.4.

৬৫. 'ভদ্রলোক' বলতে উচ্চ বর্ণের হিন্দু সমাজকে বুঝানো হয়েছে। এই হিন্দু সমাজ- ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ- এই তিনটি উচ্চ বর্ণ নিয়ে গঠিত ছিল। বিস্তারিত জানার জন্য ঃ J.H. Broomfield, *Elite Conflict in Plural Society: Twentieth Century Bengal*, (University of California Press: 1968), p.5-6.

৬৬. GI, Home Police, A140-148 and B112-114, May 1906; A.H.L. Fraser to Sir Earle Richards, 20 February, 1907 No.2(e), Erle Richards Collection, India Office Library, MSS Eur. F122, উদ্ধৃতঃ J.H. Broomfield, *ঐ, p.31-32.*

৬৭. J.H.Broomfield, *Elite Conflict in a Plural Society*, *op cit.*, p.32.

৬৮. *Eastern Bengal and Assam Era*, 28 April,1906, p.4, উদ্ধৃতঃ A.R.Mallick, p.20.

৬৯. A.R. Mallick, *op cit.*, p.20.

৭০. বিমলানন্দ শাসমল, *ভারত কী করে ভাগ হলো*, (কলকাতাঃ হিন্দুস্তান বুক সার্ভিস, ১৯৯১), পৃ: ২৪ ।

৭১. V.K. Saxena, *op cit.*, p.28.

৭২. ঢাকার আহসান মঞ্জিল এ *নওয়াব সলিমুল্লাহর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী*, বোর্ড নং-২ থেকে সংগৃহীত, তাং-১৪-১২-৯৮ইং।

৭৩. বিমলানন্দ শাসমল, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ২০ ।

৭৪. Sharif Al-Mujahid, "Pan Islamism", *A History of the Freedom Movements*, Vol.III, pp.107-108.

৭৫. Ram Gopal, *Indian Muslims: A Political History, 1858-1947*, (NewYork: Asia Publishing House, 1959), p.128.

৭৬. K.B.Sayeed, *Pakistan the Formative Phase 1857-1948*, (London:1986), pp.38-39.

৭৭. Abdur Rab, *Fazlul Huq*, pp.17, 28, 59-60. উদ্ধৃত : অমলেন্দু দে, *পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক*, (কলিকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯), পৃ: ১-২ ।

৭৮. Ram Gopal, *op cit.*, p.129.

৭৯. *Ibid*

৮০. Dr. Mahmud Husain, Ph.D., "The Lucknow Pact", *History of the Freedom Movement*, Vol. III, Part-I, *op. cit.*, p.137.

Dhaka University Institutional Repository

৮১. মুহম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, ১৭০৭-১৯৪৭*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ: ১৬৭ ।

৮২. *ঐ*, পৃ: ১৭১ ।

৮৩. Rushbrook Williams, *India in 1919: A Report for the Parliament*, p.36. উদ্ধৃতঃ মুহম্মদ ইনাম-উল-হক, *ঐ*, পৃ: ১৭১ ।

৮৪. T.W. Wallbank, *A short History of India and Pakistan*, p.146. উদ্ধৃতঃ ইনাম-উল-হক, *ঐ*, পৃ: ১৭২।

৮৫. মুহম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ১৭২ ।

৮৬. Sitaramiya, *The History of the Indian National Congress*, Vol.1, p.189. উদ্ধৃতঃ মুহম্মদ ইনাম-উল-হক, *ঐ*, পৃ: ১৭৪ ।

৮৭. মুহম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ১৭৪-১৭৫

৮৮. Gandhi, *An Autobiography*, pp.590-1. Ram Gopal কর্তৃক *প্রাগুক্ত* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ: ১৪২

৮৯. Hossinur Rahman, *Hindu-Muslim Relations in Bengal, 1905-47*, (Bombay: 1974), p.47.

৯০. Shila Sen, *Muslim Politics in Bengal, 1937-1947*, (New Delhi: Impex India, 1976), pp.50-51.

৯১. হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ:১৯ ।

৯২. সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *বাংলাদেশঃ জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা গণতন্ত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৬২

৯৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৬শে নভেম্বর, ১৯২১ ।

৯৪. সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত* ।

৯৫. Shila Sen, *op-cit.*

৯৬. সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত* ।

৯৭. *The Mussalman*, Jan.11, 1925, p.4.

৯৮. *Indian Quaterly Register*, (Calcutta, 1924), Vol. I, p.63 সালাহ্উদ্দীন আহমদ, কর্তৃক *প্রাগুক্ত* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ: ৬২ ।

৯৯. রত্না চক্রবর্তী (বাগচী),"হিন্দু মহাসভা ও সাম্প্রদায়িকতা" গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *ইতিহাস অনুসন্ধান-৫* (পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদঃ ১৯৯০), পৃ: ৪৬৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

১০০. সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত* ।

১০১. Ram Gopal, *op cit.*, p.198.

১০২. *Ibid*, p.199.

১০৩. *Ibid*, pp.199-201.

১০৪. P.Hardy, *op cit.*, pp.212-213.

১০৫. Ram Gopal, *op cit.*, p.203.

১০৬. Abdul Hamid, *op cit.*, p.199.

১০৭. Ram Gopal, *op cit.*, p.218

১০৮. P.Hardy, *op cit.*, p.213

১০৯. Ram Gopal, *op cit.*, pp.218-219.

১১০. মুহম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ১৯৪-১৯৫ ।

১১১. P.Hardy, *op cit.*, p.214.

১১২. *Ibid*, pp.214-215.

১১৩. *Ibid*, p.215

১১৪. Relevant extracts from text of speech in : Wm. Theodore de Bary(ed) *Sources of Indian Tradition*, (NewYork:1958), pp.763-7. P. Hardy কর্তৃক প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, p.219.

১১৫. Text of "Now or Never", :Syed Sharifuddin Pirzada, *Evolution of Pakistan*, (Lahore: The All-Pakistan Legal Decisions, 1963), pp.263-9.

১১৬. P. Hardy, *op cit.*, p.220.

১১৭. *Ibid.*, pp.224-225.

১১৮. হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ:২১ ।

১১৯. Letters of Iqbal to Jinnah, with a foreword by M.A. Jinnah, (Lahore: 1963), p.12.

১২০. Shila Sen, *op. cit.*, p.100.

১২১. *Ibid.*

১২২. Jamil ud-din Ahmed (ed), *Some Recent Speeches and Writings of Mr. Jinnah*, 5th ed., Vol. I, (Lahore, 1952), p.33.

১২৩. Ram Gopal, *op cit.*, p.265.

১২৪. *Ibid*, p.260.

১২৫. *Ibid*, pp.260-62.

Dhaka University Institutional Repository

১২৬. P. Hardy, *op cit.*, p.213.

১২৭. Ram Gopal, *op cit.*, pp.268-269.

১২৮. Shila Sen, *op cit.*, p.251.

১২৯. Matlubul Hasan Saiyid, *Mohammad Ali Jinnah*, (A Political Study), (Lahore: 1953), p.438.

১৩০. মওলানা আবুল কালাম আজাদ, *ইন্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডম*, অনুবাদঃ আসমা চৌধুরী-লিয়াকত আলি, (ঢাকাঃ স্বপ্নিল প্রকাশনী, ১৯৮৯), পৃ: ১৭৬ ।

১৩১. *The Indian Annual Register, July-Dec*, 1940, Vol.II, Editor: Nripendra Nath Mitra, Published by: The Annual Register office, Calcutta. p.270.

১৩২. Hugh Tinker, *India and Pakistan: A Short Political Guide*, London and Dunmow: Pall Mall Press, 1962, p.23.

১৩৩. বিমলানন্দ শাসমল, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১১ ।

১৩৪. Shila Sen, *op cit.*, p.252.

১৩৫. বিস্তারিত জানার জন্য ঃ আবুল হাশিম, *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, অনুবাদঃ শাহাবুদ্দীন মহম্মদ আলী, (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৭) ।

১৩৬. Shila Sen, *op cit.*, p.250

১৩৭. হুমায়ুন কবির *প্রাগুক্ত*, পৃ:২৬ ।

১৩৮. Shila Sen, *op cit.*, p.253.

১৩৯. Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh* : Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1936-1947, (Asiatic society of Bangladesh, Dhaka : 1987), pp.341-343.

১৪০. V.A. Smith, *The Oxford History of India*, (Oxford At The Clarendon Press:1958), p.830.

১৪১. Shila Sen, *op cit.*, p.253.

১৪২. P. Hardy, *op cit.*, pp.247-248.

১৪৩. *Ibid*, p.248.

১৪৪. K.K. Aziz, *Britain and Muslim India*, p.166. ইনাম-উল-হক,কর্তৃক প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত,পৃঃ২৬১ ।

১৪৫. P. Hardy, *op cit.*, p.248.

Dhaka University Institutional Repository

১৪৬. Stanley A. Wolpert, *A New History of India*, (NewYork: Oxford University Press,1977), p.344.

১৪৭. P.Hardy, *op cit.*, p.249.

১৪৮. অমলেন্দু দে, *স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনাঃ প্রয়াস ও পরিণতি*, (কলিকাতাঃ রত্না প্রকাশন, ১৯৭৫), পৃ: ২।

১৪৯. মওলানা আবুল কালাম আজাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ২২৯

১৫০. *ঐ*, পৃ: ২৩২ ।

১৫১. *The Evolution of India and Pakistan, 1858 to 1947 : Select Documents*, Edited by C.H. Philips, (The English Language book Society and Oxford University Press,1962), p.407.

১৫২. Rafiuddin Ahmed, *The Bengal Muslims, 1871-1906 : A Quest for Identity*, (Delhi: Oxford University Press, 1981), p.190.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংবাদিকতায় বাঙালি মুসলমান

ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, বাঙলা এক্ষেত্রে এক বিরাট গৌরবময় স্থান অধিকার করে রয়েছে।[১] ১৭৮০ সালে ভারতে যদিও সংবাদপত্র প্রকাশনার সূত্রপাত ঘটেছিল, মূলতঃ ১৮১৮ সালে স্বদেশী সংবাদপত্রসমূহ জননত প্রকাশের সবচাইতে কার্যকর মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল।[২]

বাঙলা তথা ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র ইংরেজি 'Bengal Gazette or Calcutta General Advertiser' নামক পত্রিকাটি ১৭৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারী, শনিবার জে,এ, হিকি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক। হিকির ভাষায় তাঁর এই পত্রিকা "A Weekly Political and Commercial Paper open to all Parties but influenced by None."[৩] অতঃপর একে একে 'ইন্ডিয়া গেজেট', 'ক্যালকাটা গেজেট', 'হরকরা' প্রভৃতি সংবাদপত্রগুলির প্রকাশ ঘটেছিল। ১৮১৮ সনের এপ্রিল মাসে বাঙলা হতে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিষ্ট মিশন কর্তৃক জন ক্লার্ক মার্শম্যান এর সম্পাদনায় "দিগদর্শন" নামক প্রথম বাঙলা ভাষায় মুদ্রিত মাসিক সাময়িক পত্রটি বের হয়। এর মাস খানেকের মধ্যেই জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় (১৮১৮ সনের ২৩শে মে) 'সমাচার দর্পণ' নামক আর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

এর পর ১৮১৯ সালে Baptist Auxiliary Missionary Society কর্তৃক 'গস্‌পেল ম্যাগাজীন' নামক দ্বিতীয় মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি দ্বিভাষিক (বাঙলা ও ইংরেজি) ছিল। অতঃপর ১৮২১ সালে রামমোহন রায় দ্বিভাষিক পত্রিকা 'ব্রাহ্মন সেবধি' ব্রাহ্মন ও মিশনারী সম্বাদ সং ১ 1821' নামে একটি সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন, যার এক পৃষ্ঠায় বাঙলা ও অপর পৃষ্ঠায় তার ইংরেজি অনুবাদ থাকত। এছাড়াও দেওয়ান তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় এর যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১, ৪ঠা ডিসেম্বর), ভবানীচরন এর 'সমাচার চন্দ্রিকা' (৫ই মার্চ, ১৮২২), কৃষ্ণমোহন দাসের 'সম্বাদ তিমির নাশক' (অক্টোবর, ১৮২৩), নীলরত্ন হালদার এর 'বঙ্গদূত' (১০ই মে, ১৮২৯), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' (২৮শে জানুয়ারী, ১৮৩১) এবং প্রেমচাঁদ রায়ের সম্পাদিত 'সম্বাদ সুধাকর' (২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৩১) প্রভৃতি বাঙলার সংবাদপত্রের ইতিহাসে পথিকৃৎ এর ভূমিকা রাখে।[৪]

এর পরই বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে সংবাদপত্র বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চর্চ্চা লক্ষ্য করা যায়। বাঙলার

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান সম্পাদিত প্রথম বাঙলা সংবাদপত্র 'সমাচার সভারাজেন্দ্র'। পত্রিকাটি ১৮৩১ সালের ৭ইমার্চ (বাঙলা সন ২৫শে ফাল্গুন, ১২৩৭) কলিঙ্গার শেখ আলীমুল্লা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি বাঙলা ও ফার্সী- এই দুই ভাষায় প্রকাশিত হয়। তবে পত্রিকাটি প্রাচীনপন্থী ছিল।

মুসলমান পরিচালিত দ্বিতীয় বাঙলা সংবাদপত্র ছিল 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর'। বাঙলা ছাড়াও আরও চারটি ভাষায় ইংরেজি (Indian Sun), হিন্দী, ফার্সী ('দফত বেওয়াকেয়াত') এবং উর্দু বা হিন্দুস্থানীতে 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' প্রকাশিত হত। ১৮৪৬ সালের ১১ই জুন মৌলবী নাসীর উদ্দীন পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। এটি তিন মাস মত চালু ছিল। 'সমাচার সভা রাজেন্দ্র' এবং 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' উভয় পত্রিকাই ছিল সাপ্তাহিক।[৫]

তবে 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' কেবলমাত্র সংবাদ পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এ সম্পর্কে 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকায় বলা হয়েছিলঃ '.... প্রথম সংখ্যা দৃষ্টি করিয়াছি তাহাতে তৎপ্রকাশকের প্রতিজ্ঞা বা অভিপ্রায় কিছুই ব্যক্ত হয় নাই কেবল কএকটি সম্বাদ ও তাহারি অবিকল অনুবাদ ....'। সুতরাং, মুসলিম সাংবাদিকতা এবং সাময়িকপত্র সাধনার ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে যে রকম সংঘবদ্ধ প্রয়াস লক্ষ করা গিয়েছিল তিরিশের যুগে 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' সে আন্দোলনের গোড়াপত্তন না করলেও একজন বাঙালি মুসলমান সাংবাদিকতার পেশায় সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন তা মুসলিম সাংবাদিকতার ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ।[৬]

'সমাচার সভারাজেন্দ্র' এর মত 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর'ও বাঙালি মুসলমানের সাময়িকপত্র প্রকাশের আর একটি বিচ্ছিন্ন প্রয়াস ছিল যা ১৮৪৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। যেহেতু ক্ষনজীবী এই পত্রিকার ফাইল পাওয়া যায় নাই, সেহেতু এর সংবাদ সাময়িকীর গুরুত্ব মূল্যায়ন করা সুকঠিন। তবে এইটুকু বলা যায় যে, পাঁচটি ভাষায় পত্রিকা প্রকাশের এই প্রয়াস সাময়িকপত্রের ইতিহাসে চির স্মরণীয়।[৭]

অতঃপর ১৮৭৪ সালের এপ্রিলে মীর মশাররফ হোসেন হুগলী কলেজের কয়েকজন মুসলিম ছাত্রের সহযোগিতা নিয়ে 'আজিজ-উন-নাহার' নামক একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। যতদূর জানা যায় তাতে মাসিক পত্রের ইতিহাসে এটিই মুসলমান পরিচালিত প্রথম পত্রিকা। এই পত্রিকাটিও দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ১৮৭৪ সালে ঢাকা জেলার পারিল গ্রাম থেকে প্রকাশিত হত 'পারিল বার্ত্তাবহ' (পাক্ষিক) নামক আরেকটি পত্রিকা। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন আনিছউদ্দীন আহমদ।[৮]

১৮৭৪ সালে 'আজিজ-উন-নাহার' প্রকাশের পর থেকে ১৯০৩ সালে 'নবনূর' এর প্রকাশ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর সময়কালে বাঙলার মুসলমানগণ একাধিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন।[৯] পত্রিকাগুলির মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য হলো - মৌলভী মোহাম্মদ নইম উদ্দীনের সম্পাদনায় 'আখবারে এসলামীয়া' (১৮৮৪), আবদল হামিদ খান ইউসফজয়ী সম্পাদিত 'আহ্‌মদী' (১৮৮৬), শেখ আবদুর রহিম সম্পাদিত 'সুধাকর' (১৮৮৯), 'মিহির' (১৮৯২) ও 'হাফেজ' (১৮৯২), মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত 'ইসলাম-প্রচারক' (১৮৯১), এস,কে এম, মহম্মদ রওশন আলী সম্পাদিত'কোহিনূর' (১৮৯৮), ময়েজ উদ্দীন আহ্‌মদ সম্পাদিত 'প্রচারক'(১৮৯৯), মোজাম্মেল হক সম্পাদিত 'লহরী' (১৯০০) প্রভৃতি।[১০]

বস্তুতঃ পক্ষে আধুনিক ও উন্নয়নমূলক শিক্ষা গ্রহণে মুসলমান সমাজের যে অনীহা, ধর্মীয় জীবনে যে সকল অনাচার, সামাজিক কুসংস্কার তাদেরকে জাতি হিসেবে নিম্নতর পর্যায়ে উপনীত করেছিল- তার বিরুদ্ধে উনিশ শতকের শেষের দিকে করেকজন সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি বিভিন্ন চিন্তাযুক্ত ও পথ নির্দেশনামূলক লেখনীর দ্বারা স্বসনাজকে সচেতন করে তাদের নবজাগরণ আনয়নের স্বার্থে উল্লিখিত পত্র-পত্রিকাগুলি প্রকাশে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।[১১]

উনিশ শতকের শেষ ও কুড়ি শতকের চার দশক পর্যন্ত যে সকল মুসলমান ব্যক্তিগণ পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের নাম এবং প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলি হলো ঃ

মুন্সি মোহাম্মদ রিয়াজুদ্দীন আহমদ সম্পাদিতঃ *সুধাকর* (১৮৮৯), *ইসলাম প্রচারক* (১৮৯১), *মুসলমান* (১৮৮৪), *ছোলতান* (১৯০২), *রায়ত-বন্ধু* (১৯২৬)।

শেখ আবদুর রহিম সম্পাদিতঃ *মিহির* (১৮৯২), *হাফেজ* (১৮৯২, পাক্ষিক), *মিহির ও সুধাকর* (১৮৯৫), *হাফেজ* (১৮৯৭, মাসিক), *মোসলেম প্রতিভা* (১৯০৭), *মোসলেম হিতৈষী* (১৯১১), *ইসলাম দর্শন* (১৯১৬)।

মুন্সি ময়েজুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত ঃ *প্রচারক* (১৮৯৯), *ইসলাম* (১৯০০)।

আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী সম্পাদিত *'আহ্‌মদী''* (১৮৮৬)।

মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী সম্পাদিত ঃ *নূর-অল-ঈমান* (১৯০০)।

মোহাম্মদ নইম উদ্দীন সম্পাদিত ঃ *আখবারে এসলামীয়া* (১৮৮৪)।

মোজাম্মেল হক সম্পাদিত ঃ *লহরী* (১৯০০) এবং *মোসলেম ভারত* (১৯২০)।

এস, কে, এম, মহম্মদ রওশন আলী সম্পাদিত ঃ *কোহিনুর* (১৮৯৮)।

এম,এস, নূরুল হোসেন কাশিমপুরী সম্পাদিত ঃ *হানিফি* (১৯০৩)।

সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত ঃ *নবনূর* (১৯০৩)।

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত ঃ *মোহাম্মদী* (১৯০৩), *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী* (১৯০৮), *দৈনিক সেবক* (১৯২১), *মাসিক মোহাম্মদী* (১৯২৭), *দৈনিক আজাদ* (১৯৩৬)।

শেখ ফজলুল করিম সম্পাদিত ঃ *বাসনা* (১৯০৮)।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পাদিত ঃ *আল-এসলাম* (১৯১৫), *হোলতান* (১৯২৩), *দৈনিক আমির (১৯২৯)*।

মোহাম্মদ আইয়ুব খান সম্পাদিত ঃ *প্রভাকর* (১৯১২)।

মোহাম্মদ বাবর আলী সম্পাদিত ঃ *আহ্‌লে হাদিস* (১৯১৫)।

খান বাহাদুর আমান আলী সম্পাদিত ঃ *সুনীতি।*

মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সম্পাদিত ঃ *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা* (১৯১৮)

মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন সম্পাদিত ঃ *সওগাত* (১৯১৮), *সাপ্তাহিক সওগাত* (১৯২৮)।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ও আবদুর রশীদ সিদ্দিকী সম্পাদিত ঃ *সাধনা* (১৯১৯)।

শেখ হবিবর রহমান সম্পাদিত ঃ *বঙ্গনূর* (১৯১৯)।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী সম্পাদিত ঃ *নূর* (১৯২০)।

কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত ঃ *নবযুগ* (১৯২০), *ধূমকেতু* (১৯২২), *লাঙ্গল* (১৯২৫)।

সৈয়দ নওশের আলী সম্পাদিত ঃ *সহচর* (১৯২২)।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সম্পাদিত ঃ *সাম্যবাদী* (১৯২৩)।

আহমদ আলী এনায়েতপুরী সম্পাদিত ঃ *শরিয়ত* (১৯২৪), *শরিয়তে এসলাম* (১৯২৬)।

নূরল হোসেন কাশিমপুরী সম্পাদিত ঃ *দেশের কথা* (১৯২৪)।

মওলানা সিংকাপনী ও সুজাআত আলী সম্পাদিত ঃ *আল্-জ্বালাল* (১৯২৪)।

মোহাম্মদ ইব্‌রাহীম সম্পাদিত ঃ *রওশন হেদায়েৎ* (১৯২৪)।

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী সম্পাদিত ঃ *সত্যাগ্রহী* (১৯২৪)।

গোলাম সামদানী বি.এ. ও নৌকত আহমদ খান বি.এ. সম্পাদিত ঃ *আহ্‌মদী* (১৯২৫)।

মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সম্পাদিত ঃ *হানাফী* (১৯২৬)।

আবুল হুসেন সম্পাদিত ঃ *শিখা* (১৯২৭)।

মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ও চৌধুরী মোহাম্মদ শামসুর রহমান সম্পাদিত ঃ *তবলীগ* (১৯২৭)।

মোহাম্মদ আফজাল-উল-হক সম্পাদিত ঃ *নওরোজ* (১৯২৭)।

Dhaka University Institutional Repository

এম, আহমদ আলী সম্পাদিত ঃ *জাগরণ* (১৯২৮)।

সৈয়দ আবদুর রব সম্পাদিত ঃ *নোয়াজ্জিন* (১৯২৮)।

কে.এম,আবদুর রহমান সম্পাদিত ঃ *সঞ্চয়* (১৯২৮)।

আবদুল কাদির সম্পাদিত ঃ *জয়ন্তী* (১৯৩০)।

মোহাম্মদ মোয়েজ্জদ্দীন হামিদী সম্পাদিত ঃ *হেদায়াত* (১৯৩৫)।

মুহম্মদ নূরুল হক দশঘরী সম্পাদিত ঃ *আল্-ইস্‌লাহ* (১৯৩৯)।

আবুল হাশিম সম্পাদিত ঃ *মিল্লাত* (১৯৪৫)।

সংক্ষেপে তাঁদের কয়েকজনের পরিচয় তুলে ধরা হলোঃ-

মুন্সী মোহাম্মদ রিয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ (বাঙলা ১২৬৯-১৩৪০ সন) ১২৬৯ সনে বরিশাল শহরের কাউনিয়ার জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা ঢাকা জেলার বাঙ্গীমাইনা গ্রামের অধিবাসী এবং তাঁদের প্রায় সকলেই পন্ডিত ছিলেন। পীর মুরিদী ও শিক্ষকতা তাঁদের পেশা ছিল।

প্রথমতঃ পিতার কাছেই তিনি বাঙলা পড়া আরম্ভ করেন কিন্তু অল্প বয়সে পিতৃ-বিয়োগঘটলে এ,কে, ফজলুল হক সাহেবের পিতৃক তাঁকে নিজ বাড়ী নিয়ে যান এবং বরিশাল বঙ্গ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করেন। এর পর তাঁকে ত্রিপুরা জেলার রূপ্‌সা গ্রামে জমিদার চৌধুরী মোহাম্মদ গাজী মরহুমের বাড়ী নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি সেখানে আরবী-পার্শী পড়াশুনা করতে থাকেন।অতঃপর ১২৮৩ সালে বাজাপ্তী গাজীপুর সার্কেল স্কুলে ভর্ত্তি হন। কয় বৎসর পর তিনি বাঙ্গলা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে ত্রিপুরা জেলায় প্রথম হন। এরপর তিনি রূপ্‌সার একটি পাঠশালায় শিক্ষকতা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠাগারও স্থাপন করেন। পরে পাঠশালাটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিনত হয়।

তাঁর কর্ম জীবনকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় - শিক্ষকতা, সাহিত্য-সেবা এবং সাংবাদিকতা।

মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বোধোদয়' পুস্তকে একটি ভুল বের করে দেওয়াতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন।

তাঁর সাহিত্য প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তিনি চুঁচুড়ার এডুকেশন গেজেটে প্রথম প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন। পন্ডিত রজনীকান্ত গুপ্তের বাঙ্গলার ইতিহাসে মুসলমান সম্রাটগণের নামগুলি তিনি যোগ করে দেন। পরবর্তীকালে জীবিকার সন্ধানে কোলকাতায় গিয়ে তিনি "রিয়াজুল ইসলাম প্রেস" নামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে সাহিত্য চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হলোঃ- 'বোধোদয় তত্ত্ব', 'পদ্য প্রসূন',

Dhaka University Institutional Repository

'তোহফাতুল মোসলেমীন', 'এসলাম তত্ত্ব', 'গ্রীক-তুরস্ক যুদ্ধ', 'কৃষক বন্ধু', 'আমার সংসার জীবন', বৃহৎ হীরক-খনি', 'জোলেখা', 'রত্নাবলী', 'হক নসিহৎ' প্রভৃতি।

তবে, তিনি সাংবাদিকতার পিছনে জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন। সাংবাদিকতাকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে তিনি আজীবন কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তাঁর সময়ে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অনগ্রসর বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে সংবাদপত্র এবং সাংবাদিক সৃষ্টির লক্ষে তিনি চির পরিচিত নিজ গ্রাম ত্যাগ করে ১২৯০ সনে অপরিচিত পরিবেশ কোলকাতায় যান। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন ঃ "অবশেষে ১২৯০ সালের ভদ্র মাসে প্রায় ২,০০০ টাকার জিনিসপত্র সম্বলিত দোকানটি কর্মচারীদের হস্তে ফেলিয়া অত বড় হিতৈষী আত্মীয় জমিদার সাহেব এবং অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুবর্গের মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া সম্পূর্ন অপরিচিত স্থান কলকাতা আসিয়া পড়িলাম"।

এ সময় মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনে এক দুর্যোগ লক্ষ করা যায়। পাদ্রীদের প্রচারের ফলে অনেক মুসলমান খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে ধর্মান্তরিত হতে থাকে। এই অবস্থায় তিনি, শেখ আবদুর রহিম, রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী, মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ প্রমুখদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ইসলামের মর্মবাণী সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। আর এ জন্য সংবাদপত্র অত্যাবশ্যক। কারন, সংবাদপত্র জনমত গঠন ও আদর্শ প্রচারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। অবশেষে তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১২৯৬ সনে 'সুধাকর' প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে 'মুসলমান' (বাঙলা), 'নব-সুধাকর' প্রভৃতি সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করেন। 'সুধাকর' এর পর মাসিকপত্র 'ইসলাম-প্রচারক' প্রকাশ করেন। তিনি 'হোলতান' পত্রিকায়ও সহকারী সম্পাদকের কাজ করেছেন। এ ছাড়াও 'মিহির ও সুধাকর', 'নবযুগ', 'রায়ত-বন্ধু' এবং 'মোসলেম বাণী'তেও সহযোগী সম্পাদকের কর্ত্তব্য সমাধা করেছেন। তাঁর সম্পর্কে ১৩৩৩ সালের *বার্ষিক সওগাত* এ তাই লেখা হয়েছিল ঃ ".... অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ঘোর তমিস্র যুগে যে দুই চারি জন ক্ষনজন্মা পুরুষ আলো জ্বালিয়া এ ভ্রান্ত সমাজকে সর্ব্ব প্রথম পথ দেখাইয়া ছিলেন, তাঁদের মধ্যে যে মুন্সী মোঃ রেয়াজুদ্দীন আহমদ অন্যতম, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"[১২]

মুন্সী শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১) চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহাকুমার মোহাম্মদপুর গ্রামে ১৮৫৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। টাকীর মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় থেকে ছাত্রবৃত্তি পাশ করার পর কলকাতার সিটি স্কুলে ভর্তি হন এবং এন্ট্রান্স ক্লাশ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। কিন্তু অসুস্থতার কারনে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে পারেনি।

অতঃপর সাংবাদিকতাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে পরবর্তীতে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক রূপে খ্যাতি

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করেন। তিনি বাঙলা ও ফার্সীতে অভিজ্ঞ ছিলেন।

সাংবাদিকতার জীবনে তিনি যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনা করেন সেগুলি হলোঃ- 'মিহির', (মাসিক,১৮৯২), 'সুধাকর' (সাপ্তাহিক,১৮৯৪), 'মিহির ও সুধাকর' (সাপ্তাহিক,১৮৯৪), 'হাফেজ'' (মাসিক, ১৮৯৬), 'মোসলেম ভারত' (মাসিক,১৯০০), 'মোসলেম হিতৈষী' (সাপ্তাহিক,১৯১১), 'ইসলাম দর্শন' (মাসিক, ১৯১৬) প্রভৃতি।

তিনি কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক বহু প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। কলকাতা মোহামেডান ইউনিয়নের সদস্য, আঞ্জুমান ওয়ায়েজিনে ইসলামের প্রথম সম্পাদক, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য ও পরে সহ-সভাপতি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য ছিলেন।

বাঙলা ভাষার প্রশ্নে তাঁর ধারণা ছিল উদার এবং স্বচ্ছ। তিনি 'বঙ্গ ভাষা ও মুসলমান সমাজ' প্রবন্ধে বলেছেন, 'অন্ধকার যুগে যখন আমি নিজের ক্ষীণ শক্তিটুকু লইয়া সম্পূর্ন নিরবলম্বন ও নিঃসহায় অবস্থায় বাঙ্গালার সাহিত্য আসরে আসিয়া দন্ডায়মান হইলাম তখন একটিমাত্র চিন্তা আমার সমস্ত দেহমন অধিকার করিয়া লইয়াছিল। সেই চিন্তাটি এই যে- কেমন করিয়া আমার প্রিয়তমা স্বজাতি বাঙ্গালি মুসলমানদিগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার অবাধ প্রচার করিব, কেমন করিয়া তাহাদের ভ্রান্ত কুহেলিকা ও জড়তা মোচন করিয়া তাহাদিগকে মাতৃভাষার পূণ্যমন্দিরে লইয়া আসিব এবং কেমন করিয়া তাহাদের মনের মধ্যে মাতৃভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য গঠনের প্রেরনা জাগাইয়া দিব"?

তাঁর লক্ষ ছিল, ইসলামের ভাবধারার আলোকে বাঙলার মুসলমান সমাজে নব-জাগরণের আন্দোলন সৃষ্টি। তাঁর শক্তিশালী লেখনী মুসলিম জাগরণের কাজে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।[১৩]

আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী (১৮৪৫-১৯১০) ১৮৪৫ সালে টাঙ্গাইলের চাড়ান গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

কর্মজীবনে তিনি এবং মীর মশাররফ হোসেন একই সময়ে টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার এষ্টেটের দুই অংশের ম্যানেজার ছিলেন। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসাবে সুপরিচিত। 'আহমদী' (১৮৮৬) নামক একটি অসাম্প্রদায়িক পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সহকর্মী ছিলেন এবং ১৯০৫-১৯১১ পর্যন্ত স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করে দীর্ঘদিন বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন। মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'গাজী মিয়ার বস্তানী'-তে, তিনি একটি প্রধান চরিত্ররূপে অঙ্কিত হয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ ঃ কাহিনীকাব্য 'উদাসী উদাসী', 'কিরণপ্রভা' এবং 'অরুণভাতি'।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) ১৮৬৮সালের ৭ই জুন পশ্চিম বাঙলার চব্বিশ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমার হাকিমপুর গ্রামে খাঁ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলানা আবদুল বারী খাঁর উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষগণ পিরালী ব্রাহ্মণ ছিলেন শুনা যায়, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ একই বংশোদ্ভুত। সে সময়ের পারিবারিক রীতি অনুযায়ী আকরম খাঁ গ্রামের মক্তবে পড়াশুনার মধ্যদিয়ে শিক্ষাজীবনে প্রবেশ করেন। মাত্র ১১ বৎসর বয়সকালে তিনি পিতামাতাকে হারান। মাতামহ তাঁকে এক নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। এই স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে বর্ধমানের প্রখ্যাত মওলানা নেয়ামত উল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কুলশুনা মাদ্রাসায় বছর খানেক পড়াশুনা করেন। পরে তাঁর মামা তাঁকে কলকাতায় জুবিলী ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করে দেন। কিন্তু আরবী ভাষার উচ্চতর শিক্ষা লাভের প্রতি বিশেষ ঝোঁক এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিমুখ আকরম খাঁ ১৮৯৬ সালে জুবিলী স্কুল ছেড়ে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯০১ সালে কলকাতা মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন। এর মধ্য দিয়ে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের ইতি ঘটে।

"মোহাম্মদী"পত্রিকার সম্পাদকরূপেই মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর কর্মজীবন আরম্ভ হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় সাত বৎসর অন্যের মালিকানায় ও নিজের সম্পাদনায় কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকার পর ১৯১০ সালে তিনি সম্পূর্ন নিজ কর্তৃত্বাধীনে 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। অতঃপর তাঁর পরিচালনা ও সম্পাদনায় 'দৈনিক জামানা' (উর্দু, ১৯২০), 'সাপ্তাহিক ও দৈনিক সেবক' (১৯২১), 'মাসিক মোহাম্মদী' (১৯২৭), 'দৈনিক আজাদ' (১৯৩৬) প্রভৃতি। এছাড়াও 'আল এসলাম' পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। উল্লিখিত পত্রিকাগুলি প্রকাশনার মধ্য দিয়ে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ মুসলিম সাংবাদিকতাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। একই সঙ্গে পত্রিকাগুলিতে মুসলমানদের জাগ্রত হয়ে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসার জন্য অনুপ্রেরণামূলক লেখনী পরিচালনা করেন। তিনি 'মোস্তফা-চরিত' গ্রন্থ রচনা করেন। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের সময় তিনি 'দৈনিক সেবক' এ "অগ্রসর অগ্রসর" শিরোনামে একখানি উত্তেজনামূলক সম্পাদকীয় লেখার কারণে কারাদন্ড ভোগ করেন। এই সময় কারাগারে তিনি কোরআন শরীফের শেষ পারা "আমপারা" অনুবাদ করেন।

রাজনীতি ক্ষেত্রে, তিনি ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন এবং স্বদেশী দ্রব্যাদি ব্যবহারে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯১১ সালে বঙ্গ ভঙ্গ রদ ঘোষনার পর পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি মুসলিম লীগেও যোগ দেন।বস্তুতঃ ১৯২৮ সাল পর্যন্ত একই সঙ্গে বাঙলায় লীগ ও

Dhaka University Institutional Repository

কংগ্রেসের নেতা হিসাবে তিনি হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির রাজনীতিতে এক অনন্য ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের প্রশ্নে দল নির্বিশেষে সব হিন্দু সদস্যরা জমিদার পক্ষে এবং দল নির্বিশেষে সব মুসলিম সদস্যরা প্রজার পক্ষে ভোট দিলে আইনসভা স্পষ্টতঃ সাম্প্রদায়িক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯২৯ সালে কৃষ্ণনগর কংগ্রেস সম্মিলনীতে দেশবন্ধুর বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল করা হলে মুসলমান কংগ্রেসীরা মওলানা আকরম খাঁ এর নেতৃত্বে কংগ্রেস বর্জন করেন। তিনি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গেই মুসলিম লীগ অনুসৃত রাজনৈতিক আদর্শ গ্রহণ করে তা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুসলিম লীগের রাজনীতি করতে এসেই তিনি 'দৈনিক আজাদ' প্রকাশ করেন ১৯৩৬ সালে। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে অবিভক্ত বাঙলায় 'দৈনিক আজাদ' স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা আজো নজিরবিহীন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। এই সময়ে তাঁর নেতৃত্বে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ বাঙলার মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতার লক্ষে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়।[১৫]

মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) ১৮৭৫ সালের ২২শে আগষ্ট চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানার অন্তর্গত বরমা ইউনিয়নের আড়ালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মতিউল্লাহ্ প্রাইমারী স্কুলের পন্ডিত ছিলেন। মওলানা এছলামাবাদী স্থানীয় মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষে হুগলী সিনিয়র মাদ্রাসায় ১৮৮৯ সালে শশম (৬ষ্ঠ) জামাআতে ভর্তি হন এবং ১৮৯৫ সালে সেখান থেকে ফাইনাল মাদ্রাসা উত্তীর্ণ হন।

আনুষ্ঠানিক মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করে তিনি জীবিকার জন্য 'রেভিনিউ আইন' করত মোক্তারী পরীক্ষা পাশ করার উদ্দেশ্যে নিজেকে তৈরী করেন। মোক্তারী আইন পড়তে উদ্যত হয়েই তিনি প্রথমতঃ মাতৃভাষা বাঙলা শিখতে শুরু করেন। তিনি রংপুরের মুন্সীপাড়া জুনিয়র মাদ্রাসায় হেড মৌলবী পদে যোগদান করে সেখানে দুই বছর (১৮৯৬-১৮৯৭) শিক্ষকতা করেন। অতঃপর পীরগঞ্জের অন্তর্গত কুমেদপুর মাদ্রাসায় হেড মৌলবী পদে দুই বছর (১৮৯৮-১৯০০) চাকরী করেন। মাদ্রাসাটি বন্ধ হয়ে গেলে তিনি চট্টগ্রামে এসে মৌলবী আবদুল আজিজ প্রতিষ্ঠিত মুসলিম বোর্ডিং এ সুপারিন্টেনডেন্ট পদে ৬ মাস ছিলেন। এরপর সীতাকুন্ড সিনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক পদে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। তিনি আরবী, ফার্সী এবং উর্দুতে অসাধারণ পন্ডিত ছিলেন। সীতাকুন্ডে শিক্ষকতা করাকালীন সময়ে তিনি উত্তর ও মধ্য ভারতের নামকরা উর্দু পত্রিকাসমূহে প্রবন্ধ লিখেন। মিশরের 'আল্‌মিনার', 'আল্ এহ্‌রাম' প্রভৃতি বহু বিখ্যাত পত্রিকায় তিনি অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। শিক্ষকতা ত্যাগ করে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য তিনি মনস্থ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তিনি রাজশাহীর মির্জা ইউসুফ আলী সাহেবের (সৌভাগ্য স্পর্শমনির গ্রন্থকার) সাহায্য ও সহযোগিতায় 'ছোলতান' নামক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর যোগ্য সম্পাদকতায় 'ছোলতান' পত্রিকা দেশের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। এই পত্রিকাটি ১৯১০ সালে বন্ধ হয়ে যায়। তবে ১৯২৩ সালে পত্রিকাটি পুনঃ প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ সালের সাপ্তাহিক 'ছোলতান' ছিল খেলাফত-স্বরাজ-অসহযোগ আন্দোলনের মুখপত্র। এটি ছিল মুসলিম জাগরণের প্রয়াসী এবং হিন্দু-মুসলমান মিলনপন্থী পত্রিকাটি বাঙালি মুসলমান জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রেখেছিল। মুসলিম রাজনীতির দুঃসময়ে দৈনিক 'ছোলতান' (১৯২৬) ভারতীয় মুসলমানদের বিশেষ করে মুসলিম বাঙলার জাতীয় স্বার্থকে বড় করে তুলে ধরেছিল। পত্রিকাটি দৃঢ়তার সঙ্গে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারন করেছিল। তিনি বহুদিন 'আল-এসলাম' পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। তাছাড়া, ১৯১৮ সালে 'মোহাম্মদী' পত্রিকার যোগ দিয়ে মৌলানা আকরম খাঁ সাহেবকে সহযোগিতা করেছিলেন। ১৯২৯ সালে তিনি এ,কে, ফজলুল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতা থেকে 'দৈনিক আমীর' প্রকাশ করেন। তিনি বাঙলার অন্যতম কৃতি পুরুষ মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এর সঙ্গে 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গলা', 'ইসলাম মিশন', খাদেমুল ইসলাম-সমিতি' ইত্যাদি বহু প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ- 'ভারতে মুসলমান সভ্যতা', তুরস্কের সোলতান', 'ভারতে ইসলাম-প্রচার', 'ইসলাম-জগতের অভ্যুদয়', 'সমাজ সংস্কার', 'সুদ সমস্যা', 'বাঙ্গালার মুসলমান সমাজ ও উন্নতির উপায়','খাজা নেজামুদ্দীন আউলিয়া', ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান', 'আওরঙ্গজেব', 'কন্সটান্টিনোপল' প্রভৃতি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেমন- 'প্রচারক', 'ইসলাম প্রচারক', 'নবনূর', 'আল্-এসলাম', 'ছোলতান', 'হাবলুল-মতিন', 'মোহাম্মদী' ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর রচিত অসংখ্য প্রবন্ধের মধ্যে তাঁর সমাজ,ধর্ম, শিক্ষা, রাজনীতি ও আযাদী সংগ্রাম বিষয়ক চিন্তাধারা ও কার্যাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা লাভ করা যায়।

তিনি ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে কদম মুবারক এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। 'আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য কামনা।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি আজীবন ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এ জন্য তিনি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে পরিচালিত বঙ্গ-ভঙ্গ রদ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং তাঁর সম্পাদিত 'ছোলতান' পত্রিকায় এর সমর্থনে একাধিক প্রবন্ধ ও মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাছাড়া তিনি একই সঙ্গে প্যান-ইসলামিক চিন্তাধারারও অনুসারী ছিলেন। এ কারণে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে তাঁকে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। ১৯৩৭ সালে তিনি চট্টগ্রাম-দক্ষিণ এলাকা থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী

Dhaka University Institutional Repository

হিসাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে কংগ্রেস-নীতির প্রতি আস্থা হারিয়ে সুভাষ বসুর 'ফরওয়ার্ড-ব্লক' এ যোগ দেন। ১৯৪৪ সালে তিনি কারারুদ্ধ হন এবং ১৯৪৫সালে মুক্তি লাভ করেন।

তিনি ১৯৪৬ সালে জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দ-এর প্রার্থীরূপে চট্টগ্রাম থেকে বঙ্গীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে মুসলিম লীগ প্রার্থীর কাছে (আলী আহমদ চৌধুরী)কয়েক হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন এবং তাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। তাঁর মতে, পাকিস্তান আন্দোলন মুসলমানদের জন্য একটি আত্মঘাতি পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং, ১৯৪৭সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি মাতৃভূমি পূর্ববঙ্গে ফিরে না এসে কলকাতায় থেকে যান। শেষ জীবনে তিনি চট্টগ্রামে ফিরে আসেন। তাঁর সম্পর্কে *বার্ষিক সওগাত* এ লেখা হয়েছিল ঃ "মৌলানা সাহেবের কর্মশক্তি, দেশাত্ববোধ ও রাজনীতিজ্ঞান অসাধারণ। ... মওলানা ইসলামাবাদী সাহেব তাঁর দীর্ঘ জীবনে দেশ ও সমাজ-কল্যাণ সাধনের পথে যে বিরাট সেবা-সাধনা করিয়াছেন, তার পরিচয় প্রদান এ স্থানে অসম্ভব।তাঁর ত্যাগ, কর্ম্ম, সাধনা, বুদ্ধি, পান্ডিত্য, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ইত্যাদি একরূপ অতুলনীয়।"[১৬]

শেখ ফজলুল করিম ১২৮৯ সালের ২৭শে চৈত্র সোমবার রংপুর জেলার অন্তর্গত কাকিনা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ আমিরুল্লা। বাল্যকালে তাঁর গৃহ শিক্ষক ছিলেন 'রঙ্গপুর দিক প্রকাশ' এর সম্পাদক হরশঙ্কর মৈত্রেয়। বালো সাহিত্যিক সংসর্গ লাভ করেছিলেন বলে স্বভাবতঃই তাঁর মন সাহিত্য-সাধনার দিকে আকৃষ্ট হয়। মাত্র এগার বৎসর বয়সেই তাঁর বাল্য-রচনা 'সরল পদ্য বিকাশ' প্রকাশিত হয়। এর পর কতকগলি উর্দ্দু গজলের ভাব অবলম্বনে তিনি 'তৃষ্ণা' নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য প্রকাশ করেন। এই সময় তিনি 'মানসিংহ' এবং 'হজরত এমান রব্বানী সাহেবের জীবন চরিত' নামক দুইখানা গ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন। এইভাবেই কৈশোরের প্রারম্ভেই তাঁর সাহিত্য সাধনা শুরু হয়। উনিশ বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে কাকিনা ষ্টেশনের নিকটবর্তী মেসার্স এম, ডি, আপকার কোম্পানীর জুট ফার্ম্মে চাকরী গ্রহণ করে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। কর্ম দক্ষতা গুনে তিনি সহকারী ম্যানেজার হন এবং সাত বৎসর এই দায়িত্ব পালন করে তিনি কর্ম্মত্যাগ করেন। এই সময় তিনি কাকিনা হতে 'বাসনা' নামক একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেই সময় এটি সমগ্র উত্তর বঙ্গের একমাত্র মাসিক পত্রিকা ছিল। প্রায় দুই বৎসর চালু থাকার পর প্রেস এক্টের দ্বারা ১৩১৬ সালে 'বাসনা' বন্ধ হয়ে যায়।

তিনি একজন সুকবি এবং সুলেখক ছিলেন। তাঁর 'পথ ও পাথেয়' এবং 'চিন্তার চাষ' নামক গ্রন্থ দুখানি নীতি ও ধর্ম্ম গ্রন্থ রচনায় নিখিল ভারতব্যাপী প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করায় ১৯২০ সালে

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের হিন্দু পন্ডিতগন তাঁকে একটি রৌপ্য পদক ও 'নীতিভূষণ' উপাধি প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, ১৩২৩ সালে নদীয়া 'সাহিত্য সভা' তাঁকে 'সাহিত্য বিশারদ' এবং ১৩২৪ সালে 'কাব্য রত্নাকর' উপাধি দান করেন। ১৩৩১ সালে মাইকেল মধুসুদন দত্তের দশম বার্ষিক স্মৃতি উৎসবে 'মধুস্মৃতি' কবিতা রচনার প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করায় খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরী হতে একটি রৌপ্য-পদক লাভ করেন। ১৩৩২ সালে দেশের অন্যান্য সাহিত্য প্রতিষ্ঠান হতে তিনি 'কাব্যভূষণ', 'সাহিত্য রত্ন' ও 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁর রচিত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলি হলোঃ- 'লাইলী মজনু', 'পরিত্রাণ কাব্য', 'হজরত খাজা মুয়ীনুদ্দীন চিশতি', 'বিবি রহিমা', 'পথ ও পাথেয়', চিন্তার চাষ', 'হারুণ রশিদের গল্প', 'সোনার বাতি', 'রাজর্ষি এব্রাহিম', 'গাথা', 'আফগানিস্থানের ইতিহাস', 'প্রেমের স্মৃতি', 'বিবি খদিজা', 'বিবি ফাতেমা', 'বিবি আয়েশা', 'বেহেশতের ফুল', 'হাতেম তাইয়ের গল্প', 'বাগ-ও-বাহার', 'মাথার মণি', 'জোয়ার ভাটা', 'পরশমণি' প্রভৃতি।[১৭]

মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী (১৮৮৬-১৯৫২) বর্ধমানের টুব গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আদি নিবাস চট্টগ্রামের সুলতানপুর। তাঁর পিতা আবদুল হাদী কুরআন,হাদীস, ফিক্‌হ প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপন্ডিত ছিলেন। আহলে হাদীস মতবাদের জন্য পিতা হাদীকে স্বগ্রাম ত্যাগ করে দিনাজপুরের বস্তিআড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করতে হয়। আবদুল্লাহেল বাকী প্রথম দিকে আরবী, ফার্সী ও উর্দু শিক্ষা লাভ করেন রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার লালবাড়ী মাদ্রাসায়। পরে উত্তর ভারতের কানপুরের জামেউল-উলুম মাদ্রাসা থেকে সাহিত্য, ইতিহাস ও হাদীসে পান্ডিত্য লাভ করেন।

১৯০৬ সালে পিতার মৃত্যুর পর মাত্র ২০ বৎসর বয়সে পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাঁকে উত্তর বঙ্গে আহলে হাদীস জামাআতের নেতৃত্ব গ্রহন করতে হয়। তবে,তাঁর সাধনা ও তৎপরতা শুধু জামা'আতে আহলে হাদীসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বাঙলার মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় সমস্যাবলীও তাঁর চিন্তশীল মানসে ভাবনার উদ্রেক করেছিল। তিনি মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখের সহযোগিতায় ১৯১৩ সালে বগুড়া জেলার বানিয়া গ্রামে 'আনজুমান-এ-উলামা-এ-বাঙলা' প্রতিষ্ঠায় এবং উহার কর্ম তৎপরতায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। বাঙলার আলেম সমাজের মধ্যে চেতনা সঞ্চার এবং দায়িত্ববোধ জাগরণে তাঁর জ্ঞানগর্ভ ও অগ্নিবর্ষী ভাষণ বিশেষ ক্রিয়াশীল হয়েছিল।

পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী, মোহনলাল করমচাঁদ গান্ধী প্রভৃতির নেতৃত্বে দেশে খেলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

তাতে সাড়া দিয়েছিলেন। স্বাভাবিক প্রতিভা এবং কর্মশক্তি বলে তিনি বাঙলা দেশে এই আন্দোলনের প্রথম সারির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিগণিত হন।

১৯২০ সালে দিনাজপুর শহরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের উপস্থিতিতে যে ঐতিহাসিক কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে সভাপতি হন তিনি। এই সময় থেকে শুরু করে কংগ্রেসে তাঁর অবস্থিতিকাল পর্যন্ত দিনাজপুর জেলার কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব প্রায়শঃ তাঁরই উপর ন্যাস্ত হয়। ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্ব প্রদান করেন। এই জন্য কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁকেও কারাবরণ করতে হয়। ১৯৩২ সালে তাঁর উপর আরোপিত ১৪৪ ধারা অমান্য করে তিনি ভাষণ দিলে দ্বিতীয়বার কারাবরণ করেন।

১৯৩৩ সালে তিনি প্রজা আন্দোলনে যোগদান করেন। এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন স্যার আবদুর রহীম, মৌঃ এ, কে, ফজলুল হক, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, খান বাহাদুর আবদুল মোমেন, মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ প্রভৃতি রাজনৈতিক নেতা ও সমাজকর্মীবৃন্দ।

তিনি প্রজা এসেম্বলী পার্টির মনোনীত সদস্যরূপে ১৯৩৪ সালে ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। দীর্ঘদিন তিনি প্রজাপার্টির ও কৃষকপ্রজা পার্টির সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করে লীগের শক্তি বৃদ্ধি করেন। পাকিস্তান আন্দোলনের অতি জোরদার মুহূর্তে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্টরূপে বরিত হন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। বহু বিখ্যাত 'আল-এসলাম' পত্রিকায় কোরআন,হাদীস, ইসলামী ইতিহাস এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে তিনি যে গবেষণামূলক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে লিখেছিলেন তা তৎকালীন বিদ্বজ্জন সমাজে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছিল।[১৮]

মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী (১৮৫৮-১৯২০) ১৮৫৮ সালে রাজশাহীর দূর্গাপুর উপজেলার আলীয়াবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৭ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। পরবর্তীতে নর্মাল স্কুলের ত্রৈবাসিক পরীক্ষায় পাশ করার পর তিনি কুচবিহার অঞ্চলের একটি বাঙলা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং পরে রাজশাহীর লোকনাথ স্কুল ও রংপুর সরকারী নর্মাল স্কুলে চাকরী লাভ করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি সাব-রেজিষ্ট্রার এর চাকুরীতে যোগ দেন এবং ১৯১৭ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

চাকরীতে থাকাকালীন সময় থেকেই তিনি সমাজসেবা, সাহিত্যচর্চা, শিক্ষা-বিস্তার ও ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি রাজশাহীর নূর-অল-ইমান সমাজ' (১৮৮৪), 'আঞ্জুমানে হেমায়েতে এসলাম' (১৮৯১), এবং 'জেলা মুসলমান শিক্ষা সমিতি' (১৯১৮) এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন।

বাঙালি মুসলমানদের নবজাগরণের এবং সঙ্ঘবদ্ধ সাহিত্য প্রয়াসের যুগে তিনি সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর প্রথম মৌলিক রচনা হলো 'দুগ্ধ সরোবর (১৮৯১)। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)-এর 'কিমিয়ায়ে সা আদত' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' (৫ম খন্ড, ১৮৯৫-১৯০৩)। এছাড়াও তাঁর আরও দুটি গ্রন্থের নাম ঃ 'খোশখবর' এবং 'অন্তিম কালের কর্ত্তব্য'।

সাময়িক পত্র সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল-অনন্যসাধারণ। তাঁর সম্পাদিত তিনটি পত্রিকা হলোঃ- (১) নুর-অল-ইমান, (২) মুসলমান শিক্ষা-সমবায়, (৩) শিক্ষা সমাচার। প্রথমটি ছিল মাসিক, দ্বিতীয়টি ছিল চতুর্মাসিক এবং তৃতীয়টি দ্বি-মাসিক। "সোলতান" পত্রিকার প্রকাশনার কাজেও তিনি বিশেষ সহযোগিতা করেন।

মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষান্দোলনের অন্যতম অঙ্গ ছাত্রাবাস স্থাপনের কাজেও তিনি এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমে সংগৃহীত অর্থে ১৮৯৯ সালে রাজশাহী শহরের প্রথম মুসলিম ছাত্রাবাস ফুলার হোস্টেল নির্মিত হয়। ১৯০৩ সালে নওগাঁয় একটি মুসলিম ছাত্রাবাস নির্মান করেন। এছাড়াও, রাজশাহী জেলার কালীগঞ্জ ও দাউদকান্দি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। মহাদেবপুরে তিনি একটি পাকা মসজিদ ও মুসাফিরখানা তৈরী করেন।

সংগঠন ও সমাজ-সংস্কারমুলক কাজে, শিক্ষাবিস্তার ও ধর্ম প্রচারে, পত্রিকা প্রকাশ ও গ্রন্থ রচনা-সকল বিষয়ে তাঁর মধ্যে যে আদর্শ ও লক্ষ কাজ করেছে তা হলো-সৎ শিক্ষার বিস্তার ও মনুষ্যত্বের বিকাশ। তাঁর সম্পর্কে মওলানা আকরম খাঁ যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন সেটি আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর 'দৃষ্টিকোণ' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আকরম খাঁ লিখেছেনঃ 'মীর্জা ছাহেবের সহিত ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার যথেষ্ট হইয়াছিল। এমন দূরদর্শী চিন্তানায়ক মনীষী, কর্মশক্তির ও ত্যাগ-তপস্যার এমন অসাধারণ সমাবেশ তখনকার যুগে খুব অল্পলোকের মধ্যেই দেখিয়াছি বলিয়া আমার দৃঢ়বিশ্বাস।"

তিনি অসাম্প্রদায়িক ছিলেন এবং তাঁর 'নূর-অল-ইমান' পত্রিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল- হিন্দু-মুসলমান ঐক্যসাধনের প্রয়াস।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

বাঙলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি ও গদ্য শিল্পী মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) পশ্চিম বঙ্গের নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের বাউইগাছি গ্রামে ১৮৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নাসির উদ্‌দীন আহমদ।

মোজাম্মেল হক মাইনর স্কুল থেকে ১৮৭৪ সালে সেই সময়ের প্রচলিত ভার্নাকুলার পরীক্ষা কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে বৃত্তিলাভ করেন। পরবর্তীতে বাঙলা ১২৮৫ সালে ২৪শে মাঘ তিনি শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু অবস্থা বিপর্যয়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব না হলেও পরে দুই বৎসর ব্যাকরণ বিষয়ে পড়েন।

তিনি কর্মজীবন শুরু করেন শ্রীনাথ দাস সম্পাদিত 'সময়' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা অফিসে যোগদান করে। এখানে কিছুকাল কাজ করার পর 'শান্তিপুর রামনগর ভার্নাকুলার স্কুলে' দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে যোগ দেন। এই স্কুলে প্রায় এক বছর শিক্ষকতা করেন।

১৮৮৬ সালে শান্তিপুরের মুসলমানগণ 'ইসলাম করদাতৃ সভা' নামে একটি সমিতি স্থাপন করে এবং মোজাম্মেল হককে ঐ সভার সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। এই সভা পরে সংস্থায় পরিণত হয়, যা শান্তিপুরের মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে বিপুল প্রভাব রাখে।

১৮৮৭ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী 'শান্তিপুর জুনিয়র জুবিলি মাদ্রাসা' নামক একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হলে মোজাম্মেল হক সেখানে শিক্ষক নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি 'তামাচিকা বঙ্গ বিদ্যালয়ে' সহকারী শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন।

তাঁর 'গদ্য পাঠে' মুগ্ধ হয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ম্যাট্রিকুলেশনের বাঙলা ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত করেন এবং ১৯১৯ হতে ১৯৩৩ পর্যন্ত আমৃত্যু তিনি বাঙলা ভাষার পরীক্ষক ছিলেন। তাছাড়া তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার এবং কিছুকাল তার ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। ত্রিশ বছর তিনি নদীয়া জেলা বোর্ডের শিক্ষা কমিটির সদস্য ছিলেন। প্রায় বিশ বছর তিনি অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সহকারী সভাপতি ছিলেন কিছুকাল।

শিক্ষকতা এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজ ছাড়াও পত্রিকা সম্পাদনার কর্মকান্ডের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা দুটি হলো- (১) 'লহরী'(১৩০৬) এবং (২) 'মোসলেম ভারত'(১৩২৭)।

শান্তিপুর থেকে প্রকাশিত মাসিক 'মুদ্‌গর' পত্রিকাতে 'শ্রী-মো' ছদ্মনামে তিনি বহু কবিতা লিখেছেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'বাণী', 'সোমপ্রকাশ', 'মুসলমান বন্ধু' প্রভৃতি পত্রিকাতেও গদ্যে পদ্যে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

নিয়মিত লেখক ছিলেন। এছাড়াও 'মিহির' 'সুধাকর', মিহির ও সুধাকর', 'হাফেজ' পত্র-পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়।

তিনি প্যান-ইসলামি চিন্তাধারার অনুসারী ছিলেন।[২০]

আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩) ১৮৭১ সালে চট্টগ্রামের পটিয়া থানার সুচক্রদন্ডী গ্রামে জন্ম গ্রহুন করেন। তাঁর পিতার নাম মুনশী নুরউদ্দীন। ১৮৯৩ সালে পটিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করেন। চট্টগ্রাম কলেজে দুই বছর এফ,এ, অধ্যয়ন করেন তবে, এফ,এ, পরীক্ষার পূর্বে সন্নিপাত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় পরীক্ষা না দিয়ে কলেজের পড়াশুনায় ইতি ঘটান।

তিনি কর্ম জীবনে প্রবেশ করেন ১৮৯৫ সালে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলের শিক্ষক নিযুক্তির মধ্যদিয়ে। একই বছর সীতাকুন্ড মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অস্থায়ী পদ গ্রহণ করেন। সেখানে কার্যকাল শেষ হলে চট্টগ্রাম প্রথম সাব-জজ আদালতে ১৮৯৬ সালে শিক্ষানবিস পদে যোগদান করেন।

১৮৯৮ সালে তিনি চট্টগ্রাম কমিশনার অফিসে কেরানির পদে চাকরী লাভ করেন। পুঁথি সংগ্রহের মানসে তিনি স্থানীয় 'জ্যোতি' পত্রিকায় এক বিজ্ঞাপন দিলে একে কেন্দ্র করে তাঁর চাকরীচ্যুতি ঘটে। কিছুদিন বেকার থাকার পর ১৮৯৯ সালে আনোয়ারা মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্তি লাভ করেন। ১৯০৬ সালে চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর অফিসে দ্বিতীয় কেরানীর পদে চাকরী লাভ করেন। ১৯৩৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

অবসর জীবনে তিনি সাহিত্য সেবা এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

তিনি ১৯৩৫-১৯৪৫ পর্যন্ত স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং পটিয়া আঞ্চলিক ঋণ সালিশি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

১৯০৩ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হন। বাঙলা ১৩২৬ সনে এর সহ-সভাপতি হন। ১৯১৮ সালে চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, ১৯৩৯ সালে কলকাতা মুসলিম সমিতির সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। এছাড়াও ১৯৫১ সালে চট্টগ্রাম এবং ১৯৫২ সালে কুমিল্লা সংস্কৃতি সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স ও পরে বি,এ-র বাঙলার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাঙলা অনার্সের একটি পত্রের প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক নিযুক্ত হন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সম্পাদন ও গবেষনায় তিনি অসাধারণ নিষ্ঠা, দক্ষতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় প্রদান করেন। তাঁর সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। এর মধ্যে প্রায় এক হাজার পুঁথি বাঙ্গালি মুসলমানের রচনা। পুঁথি সংগ্রহে অসামান্য অবদান রাখায় আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন 'তিনি ব্যক্তি নহেন, তিনি একটি প্রতিষ্ঠান'। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের গবেষণামূলক রচনাবলীর অনেকাংশ তাঁর সংগৃহীত উপাদানের উপর ভিত্তি করে রচিত। তাঁর গ্রন্থ 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' প্রাচীন পুঁথির উপর অপরাপর লেখকদের রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে অধিকতর সমৃদ্ধ ও আদর্শস্থানীয়। তাঁর সম্পাদিত নরোত্তম ঠাকুরের 'রাধিকার মানভঙ্গ', কবি বল্লভের 'সত্য নারায়ণের পুঁথি', দ্বিজ রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ', রামরাজার 'মৃগলুব্ধ সম্বাদ', দ্বিজ মাধবের 'গঙ্গামঙ্গল', আলী রাজার 'জ্ঞানসাগর', বাসুদেব ঘোষের 'শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস', মুক্তারাম সেনের 'সারদামঙ্গল', শেখ ফয়জুল্লাহর 'গোরক্ষবিজয়' ও আলাওলের 'পদ্মাবতী' (খন্ডাংশ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর সম্পাদনা কর্মের ভূয়শী প্রশংসা করেছেন।

সাহিত্য ক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য ১৯০৯ সলে চট্টল ধর্মমন্ডলী কর্তৃক তাঁকে 'সাহিত্য বিশারদ' উপাধি প্রদান করা হয়। ১৯২০ সালে নদীয়ার সাহিত্য সভার কাছ থেকে তিনি 'সাহিত্য সাগর' উপাধি লাভ করেন।

তাঁর সম্পর্কে *বার্ষিক সওগাত* এ লেখা হয়েছিল ঃ "তাঁহার ন্যায় বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের নিঃস্বার্থ সেবক আর কেহ আছেন কিনা আমরা অবগত নহি। প্রকৃত সাহিত্য সাধনায় তাঁহার উপরে কোন বাঙ্গালী সাহিত্যিকের স্থান আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। নবীন লেখকগণ ইঁহার বড়ই প্রিয়। তিনি নানা উপায়ে তাঁহাদের সাহায্য করিয়া থাকেন। তিনি জীবনে কত পুস্তক ও প্রবন্ধের পান্ডুলিপি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। "নবনূর" "সাধনা" প্রভৃতি সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদকদিগকে তিনি বহু পরিমানে সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক সাহিত্য পত্রিকা নিজের বক্ষে তাঁহার রচনা ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে।"[২১]

মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী (১৮৭৪-১৯৩৩) ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার অন্তর্গত মাওরাভাঙ্গীর পার্শ্ববর্তী নারায়ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম এনায়েতুল্লাহ চৌধুরী।

তিনি পাংশা থানার এম,ই,স্কুলে পড়াশুনা করে ঐ স্কুল থেকে মাইনর পরীক্ষা উত্তীর্ন হয়েছিলেন। পরবর্তীতে উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার জন্য কুষ্টিয়ায় গেলে সেখানে তাঁর পাঠশিক্ষা বেশীদূর পর্যন্ত যায়নি। তিনি সুসাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন এর সাহচর্য্যে আসেন। এই সময়ই মীর মশাররফ হোসেন এর সঙ্গে ব্যক্তিগত ও আন্তরিক সম্পর্ক রওশন আলীকে প্রভাবিত করে এবং তাঁর সাহিত্যিক আকাঙ্খা জাগ্রত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

'কোহিনূর' পত্রিকার সম্পাদনার মাধ্যমে মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরীর (১৮২৪-১৯৩৩) কর্মময় জীবন আরম্ভ হয় এবং পেশা হিসেবে সাংবাদিকতাকে গ্রহণ করেন। আর তখন থেকে মৃত্যু অবধি তিনি "হাবলুল মতিন", "হিতকরী", "সোলতান", "মাসিক মোহাম্মদী" প্রভৃতি পত্রিকায় সম্পাদক, সহযোগী সম্পাদক হিসেবে যুক্ত থেকে কাজ করেন।

এছাড়া, দেশ ও সমাজ সেবার উদ্দেশ্যেও তিনি কতকগুলি সভাসমিতি গঠন এবং অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে বিভিন্ন কাজ করেন। তিনি 'কোহিনূর সাহিত্য সমিতি' (১৯০৩) ও 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি' এর সম্পাদক এবং 'বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতির' (১৯০৪) সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' (১৯০৩), 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' (১৯১১) ইত্যাদি শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক সংগঠনের সঙ্গেও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' এর সভায়ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। তাছাড়া শেষ জীবনে নিজগ্রামে তিনি 'পূর্ণিমা সম্মিলনী' নামক একটি সাহিত্য বিষয়ক সমিতি পরিচালনা করতেন।

মোহাম্মদ রওশন আলী আমৃত্যু স্বসমাজের আবেগ এবং স্বার্থকে লালন করেও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও সমাজ উন্নতির জন্য চিন্তা ও কাজ করেন। 'কোহিনূর' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'আমাদের আবেদন' এ পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল ঃ "হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি, জাতীয় উন্নতি, মাতৃভাষার সেবাকল্পে এবং কলিকাতার অনাথ আশ্রমের সাহায্যার্থ 'কোহিনূর' প্রচারে ব্রতী হইয়াছি"- এ থেকেই তাঁর মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই পত্রিকাটিতে হিন্দু-মুসলমান সকল লেখকের লেখা প্রকাশিত হত। তিনি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন এবং আজীবন কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে ঐ আদর্শের অনুসরণ করেন।

অধ্যাপক আবুল হোসেন মল্লিক 'মাসিক মদিনা', চৈত্র, ১৩৮৯, পত্রিকায় রওশন আলী চৌধুরীর রাজনৈতিক জীবনের যে চিত্র দেন তা হলোঃ-

> "রাজনৈতিক জীবনে রওশন আলী চৌধুরী কংগ্রেসের আদর্শে আস্থাশীল ছিলেন বলিয়া ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকেই সমর্থন করিয়াছিলেন। বঙ্গ বিভাগকে কেন্দ্র করিয়া ভারতব্যাপী যে বিরাট আন্দোলন গড়িয়া উঠে তাহাই পরবর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলনে রূপ নেয়। ... স্বদেশী আন্দোলনকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য তিনি মহাত্মা গান্ধীর ঘোষিত বিদেশী দ্রব্য বয়কট ও স্বদেশী শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও স্বদেশী দ্রব্যের পোষকতা নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের পরবর্তী রূপ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করেন নাই বরং ইহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন বলিয়া

Dhaka University Institutional Repository

জানা যায়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় মুসলমানরা খেলাফত আন্দোলন শুরু করিলে রওশন আলী চৌধুরী খেলাফত আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং পাংশার মুসলমানদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া খেলাফত আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তোলেন।"

রওশন আলী চৌধুরী একজন বাগ্মী হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর রচনার সংখ্যা সামান্য কয়েকটি। 'কোহিনূর' পত্রিকায় তাঁর ছয়টি প্রবন্ধ এবং ছয়টি কবিতার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি কোন গ্রন্থ প্রকাশ করেন নি।

তিনি উদার, ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবতাবাদী এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী একজন ব্যক্তি ছিলেন। ফলে তিনি তাঁর সময়কালের সমাজের প্রথম শ্রেনীর নেতৃবর্গের সঙ্গে একই সারিতে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন, এজন্য তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।[২২]

সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৬-১৯৫৬) ১৮৭৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ নাজিমউদ্দিন। তিনি ১৮৯৫ সালে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ১৮৯৭ সালে এফ,এ (ফার্ষ্ট আর্টস) পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেও কৃতকার্য হন নাই। ১৯০০ সালে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার নন্দপাড়া হাই স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মধ্যদিয়ে। ১৯০৩ সালে তিনি পুলিশের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে সাব-ইন্সপেক্টর পদে যোগদান করেন। পরে কর্মদক্ষতার জন্য ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত হন। চাকুরী ক্ষেত্রে তাঁর সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ বৃটিশ সরকার তাঁকে ১৯৩২ সালে 'খান সাহেব' উপাধিতে ভূষিত করে।

ছাত্র জীবনেই তাঁর মধ্যে সাহিত্য প্রতিভা লক্ষ্য করা গিয়েছিল- যা তাঁর কর্মজীবনেও অব্যাহত ছিল। তিনি এন্ট্রান্স ক্লাশের ছাত্র থাকাকালীণ তাঁর তত্ত্বাবধানে কবি কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা' (১৮৯৪) কাব্য গ্রন্থটি বের হয়।

শৈশব থেকেই তিনি কবিতা রচনায় ভাবালুব্ধ ছিলেন। 'মুছে ফেলো' কবিতাটি কিশোর বয়সের রচনা। মুন্সীগঞ্জ হাই স্কুলে অধ্যয়ন কালেই তাঁর লেখা সনেট 'চাঁদ বিবি' 'সুধাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৯৬ সালে জগন্নাথ কলেজে ছাত্র থাকাকালীন সময়ে তিনি একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। এ কবিতাটি তাঁর কাব্যসৃষ্টির বিপুল সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করেছিল। ছাত্র জীবনে ১৮৯৬ সালে 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় তাঁর 'মুসলমান বাংলা সাহিত্য' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

তাঁর রচনার মধ্যে ইতিহাসধর্মী ধারা লক্ষনীয়। 'সেকেন্দ্রা' (১৯০০) 'হযরত বিবি খাদিজা' (১৯০১) 'আলমগীর আওরঙ্গজেব' (১৯৩৫), 'হযরত ওমরের লোকসেবা' (১৯১৮), 'মোহাম্মদ তোগলক' (১৯৩৬), 'শেরশাহ' (১৯৩৫), 'পরিবিবি' (১৯০৭), 'এরনুক স্মরণে' (১৯৩৬' প্রভৃতি কবিতা এবং 'শিবাজী ও

Dhaka University Institutional Repository

আফজল খা' (১৯২৯), 'পাঠান বীর ওসমান খা' (১৯৪০), 'আমীর খসরু' (১৯৪১), 'পূর্ববঙ্গের বার ভূঁইয়াদের সর্বশেষ স্বাধীনতার যুদ্ধ' (১৯৪০), 'বিশ্ব সভ্যতায় ইসলামের দান' (১৯২৬) প্রভৃতি রচনাসমূহ। তিনি ইতিহাস থেকে উপাদান নিয়েই রচনা করেছেন।

চাকরী জীবনের শুরুর দিকে তিনি 'নবনূর' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পত্রিকাটি ১৯০৩-১৯০৭ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে 'নবনূর' পত্রিকা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। বস্তুতঃ তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় 'নবনূর' পত্রিকাটি ঐ সময় একটি সুরুচি সম্পন্ন প্রথম শ্রেণীর মাসিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকাটি হিন্দু-মুসলমানের মিলনপন্থী ছিল। কর্মজীবনে পুলিশের সি,আই,ডি বিভাগে চাকরী করলেও তিনি রাজনৈতিক প্রতিবেদন তৈরীর সময় বৃটিশ বিরোধী ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিবেদিত কর্মীদের গোপন প্রচারপত্র এবং পুস্তিকাদি দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করেছিলেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার কারণেই।

তিনি পরাধীন জাতির মুক্তির প্রাক্কালে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি দেখতে চেয়েছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি 'নবনূর' সহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। সাহিত্যের মত রাজনীতির ক্ষেত্রে ও তিনি হিন্দু-মুসলমান সহ অবস্থানকে প্রাধান্য দেন।[২৩]

ইসমাইল হোসেন শিরাজী (১৮৭৯-১৯৩১) ১৮৭৯ সালে সিরাজগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল করিম খোন্দকার।

১৮৮৫ সালে পাঁচ বৎসর বয়সে বাড়ীর নিকটবর্তী সাহেবউদ্দীন পন্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি হন। এর তিন বছর পর ১৮৮৮ সালে তিনি জ্ঞানদায়িনী মাইনর স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলটি পরে হাই স্কুলে উন্নীত হয়। ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি বি,এল, হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেনীতে ভর্তি হন। তবে প্রবেশিকা পর্যন্ত পৌঁছাবার আগেই তিনি স্কুল ত্যাগ করেন। এই সময় দারিদ্রতার কারণে তাঁর পক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ আর সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সীমিত হলেও তিনি স্বচেষ্টায় সাহিত্য, সমাজনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে প্রচুর অধ্যয়ন করেছেন। জ্ঞানদায়িনী স্কুলে শিক্ষানবীশ থাকাকালীন সময়েই তাঁর সাহিত্য রচনা ও বাগ্মিতার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এবং তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। আর এরই মধ্যদিয়ে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন।

ইসমাইল হোসেন শিরাজীর কর্মজীবনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়ঃ ১) প্রচার জীবন, ২) রাজনৈতিক জীবন, ৩) সাহিত্য-জীবন।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর প্রচার জীবনে বাগ্মিতাই ছিল মূখ্য বিষয়। এক্ষেত্রে শিরাজী সাহেবের দীক্ষাগুরু ছিলেন মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ। তিনি দেশের বিভিন্নস্থানে বক্তৃতা দেন এবং বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিলঃ ইসলাম ধর্মের নীতি, ছাত্র জীবনের কর্তব্য, পাশ্চাত্য শিক্ষা, জাতীয় উন্নতি, হযরত মোহাম্মদের জীবনী ও শিক্ষা, ইসলামের শিক্ষা ও সভ্যতা, ইসলামই একমাত্র ধর্ম, মুসলমানদের কর্তব্য, সমাজের উন্নতির উপায়, অতীত গৌরব, মুসলমান সমাজের অধোগতির কারণ, শিক্ষা বিস্তার ও দেশের উন্নতি, আদর্শ শিক্ষা, সমাজের কর্তব্য, জাতীয় উন্নতি, হিন্দু-মুসলমানের একতা, ইসলামের সভ্যতা, আমাদের কর্তব্য, মুসলমান ছাত্রদিগের কর্তব্য ও জীবনের লক্ষ্য, জাতীয় উন্নতি, পাশ্চাত্য শিক্ষা, জাতীয় অধঃপতনের কারণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রচারের ধারা এবং বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তিনি মুন্সী মেহেরুল্লাহকে অতিক্রম করে যান। সে সময় মাইকের প্রচলন না থাকলেও শুধুমাত্র কণ্ঠস্বরের ঐশ্বর্য দ্বারা তিনি জনগণের কাছে পৌঁছে যান এবং তাদের মুগ্ধ করেন।

তাঁর প্রচার জীবনে তিনি মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মোহাম্মদ আকরম খাঁ সহ বহু হিন্দু-মুসলমান নেতা, কর্মী ও সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে আসেন।

পাট চাষ, প্রজা আন্দোলন, রায়ত সম্মেলন, শুদ্ধি আন্দোলন, তাঞ্জিম আন্দোলন, আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, আঞ্জুমানে খাদেমুল ইসলাম বা ইসলাম সেবক সমিতি, আঞ্জুমানে ওলামা ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি সুনির্দিষ্ট কিছু বক্তব্যও প্রকাশ করেন।

তাঁর প্রচার জীবনের সঙ্গে রাজনীতিও যুক্ত হয়। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরুর দিকে আপত্তিকর রচনা প্রকাশ ও ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক রচনা প্রকাশের অভিযোগে তাঁকে দুই বছরের কারাদন্ড প্রদান করা হয়। কারামুক্তির পর তিনি বলকান যুদ্ধে তুরস্কের সাহায্যে ভারতবর্ষ থেকে যে মেডিকেল মিশন প্রেরিত হয় তাতে যোগ দেন এবং তুরস্ক যান। তিনি তুরস্ক সুলতান কর্তৃক 'গাজী' উপাধি লাভ করেন।

সাময়িকপত্র সম্পাদনা কাজেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। ১৯২০ সালে তিনি 'নূর' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটি স্বল্পায়ু হলেও সমকালে যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সঙ্গে যুগ্মভাবে 'ছোলতান' পত্রিকা পরিচালনা করেন। তাছাড়া 'ইসলাম-প্রচারক', 'প্রচারক', 'আরতী', 'কোহিনুর', 'নব্যভারত', 'আল-এসলাম', 'নবনূর', 'ছোলতান' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর লিখিত প্রবন্ধে স্বচিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটান।

Dhaka University Institutional Repository

ইসমাইল হোসেন শিরাজী আজীবন কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও মুসলিম লীগের সঙ্গে তাঁকে কখনও বিতর্কে লিপ্ত হতে দেখা যায়নি। কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসের মধ্যে তিনি বিলীন হয়ে যাননি। তিনি একই সঙ্গে মুসলিম জাগরণমুলক প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদি রচনার দ্বারা মুসলিম জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি তাঁর জীবনকালে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং অভিন্ন জাতীয় ভাবধারা দুটিকেই রাজনৈতিক জীবনে ধারণ ও লালন করেছিলেন।[২৪]

মাওলানা আব্দুর রহমান সিংকাপনী (১৮৭৮-১৯৬১) সিলেটের মৌলবী বাজার জেলার সদর থানার অন্তর্গত ইটা পরগনার সিংকাপন গ্রামে ১৮৭৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উনিশ শতকের শেষ দিকে কলিকাতা মাদ্রাসা হতে ফাইনাল মাদ্রাসা পাশ করেন। পরে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষাও পাশ করেন। শিক্ষা শেষে তিনি বিশ্বনাথ থানার দৌলতপুর মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৯০৪ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকার নওয়াব বাড়ীর মসজিদে ইমামতি করেন। এই সময় ঢাকার নবাববাড়ী আহসান মনযিল পুর্ব বাঙলার রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল। ফলে এখানে বাংলাসহ সমগ্র ভারতের বহু মুসলিম মনীষীর আগমন ঘটে। তিনি ঐ সমস্ত মনীষীদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁদের চিন্তাধারায় প্রভাবিতও হন।

উল্লেখ্য, ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে অসহযোগের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। একই সময় নাগপুরে খিলাফত কমিটির কনফারেন্স চলছিল। সিলেট খিলাফত কমিটির প্রতিনিধি রুপে ঐ অধিবেশনে তিনি যোগদান করেন এবং খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে কারাবরণ করেন।

প্রথম দিকে মওলানা সিংকাপনী কংগ্রেস ও জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দ এর সমর্থক ও কর্মী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন।

পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও তাঁর ভুমিকা লক্ষণীয়। তিনি সিরাজগঞ্জের সুজাআত আলীর সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় ১৯২৪ সালে সুনামগঞ্জ থেকে আসামের মুসলমান -সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আল্-জ্বালাল' প্রকাশ করেন। ১৯২৭ সালে 'আল-বালাগ' প্রকাশিত করেন। এরপর সিলেটের আব্দুল মতিন চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত 'যুগভেরী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং দীর্ঘ সময় এ কাজে যুক্ত থাকেন।[২৫]

মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন (১৮৮২-১৯৪৫) চব্বিশ পরগণার বসিরহাটের নারায়ণপুর গ্রামে ১৮৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুনশী গাযী দবীরুদ্দীন। স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাথমিক বাঙলা, আরবী ও ফার্সী শিক্ষা লাভ করার পর ১৪/১৫ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯০৫ সালে 'জামাআত-এ-উলা'(বর্তমানে ফাযিল) প্রথম স্থান অধিকারসহ পাশ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর ইংরেজি শিখার জন্য ঐ মাদ্রাসায় অ্যাংলোপার্সিয়ান বিভাগে প্রবেশ করেন কিন্তু পারিবারিক অসুবিধার জন্য এক বছর পড়ার পর তাঁকে পড়াশুনা ত্যাগ করতে হয়।

তিনি ইলমে তাসাওউফের জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে প্রথমে মওলানা গোলাম সালমানীর এবং পরে মওলানা আবুবকর সিদ্দিকীর মুরীদ হন। মওলানা আবুবকর সিদ্দীকীর নির্দেশে তিনি ওয়ায-নসীহত, সাংবাদিকতা ও ইসলামী সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

মওলানা আবুবকর সিদ্দীকীর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তাঁর পরিচালনা ও সম্পাদনায় ১৯২৬ সালে কলকাতা থেকে 'হানাফী' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকটি হানাফী মতের প্রচারক ছিল। এটি আট বছর চালু ছিল। ১৯৩৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় মাসিক 'ছুন্নত অল্-জামায়াত' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এটি 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-বাঙলা ও আসাম' (১৯৩৬) এর মুখপত্র ছিল। তাঁর সম্পাদনায় ১৯৩৮ সালে 'মোছলেম' নামক আরো একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল সাপ্তাহিক এবং ১৯৪২ সালেও এটি চালু ছিল। পত্রিকা দুটি মুসলিম সমাজে বিশেষ করে উলামা মহলে ব্যাপক সমাদর লাভ করে।

মওলানা রুহুল আমিন স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহক ছিলেন। তিনি মুসলিম লীগের অকুণ্ঠ সমর্থক ছিলেন। মুসলিম লীগকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য তিনি বক্তৃতা, ওয়ায, সাংবাদিকতা ও লেখনী শক্তির দ্বারা প্রচেষ্টা চালান। উল্লেখ্য যে, মওলানা আকরম খাঁ যেমন তাঁর 'মোহাম্মদী' ও 'দৈনিক আজাদ' এর মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগের নীতি ও পাকিস্তান প্রস্তাবের পক্ষে সক্রিয় সমর্থন দিয়েছিলেন, একইভাবে মওলানা রুহুল আমিনও তাঁর 'ছুন্নত অল-জামায়াত' এবং মোছলেম' পত্রিকায় ঐ রাজনৈতিক দলের নীতি ও কার্যাবলীর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। ছুন্নত অল-জামায়াত মূলতঃ ধর্মীয় পত্রিকা হলেও সমকালীন রাজনীতি এবং মুসলিম লীগের সভা-সমিতি ও কার্যাবলীর উপরও এতে আলোকপাত করার ব্রত গ্রহণ করেন তিনি। পত্রিকাটির ১ম বর্ষ/১ম সংখ্যায় এর উদ্দেশ্য তুলে ধরে তিনি বলেনঃ "ইহাতে রাজনীতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মসংক্রান্ত যাবতীয় মছলা-মাছায়েল প্রকাশিত হইবে"। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী 'জমিয়ত-এ-ওলামা-এ-হিন্দ', কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা কর্তৃক মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আরোপ করা হতো, তিনি এই পত্রিকায় সেগুলির অসারতা ও অযৌক্তিকতা প্রমাণের প্রয়াস পান।

তিনি ১৯৩৯ সালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৪৩ সালে দুই দফায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।[২৯]

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯) ১৮৮৫ সাল চব্বিশ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমার অন্তর্গত পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মফিজউদ্দিন আহমদ। তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে পরিবার শিক্ষাদীক্ষা ও ঐতিহ্যের অধিকারী ছিল।

তখনকার রীতি অনুযায়ী পারিবারিক পরিবেশেই তাঁর শিক্ষা গ্রহণ শুরু হয়েছিল। তিনি গুলেস্তা ও বুসতাও গৃহেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

জানা যায়, ভাসলিয়া গ্রামের সওলাতিয়া মক্তবে তাঁর হাতে খড়ি হয় এবং তিনি যখন মক্তবে পড়াশুনা করতে যান তখন শিশু পাঠ্য গ্রন্থ ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ, দ্বিতীয়ভাগ, কথামালা ও বোধোদয়।

তাঁর দশ বৎসর বয়সে পিতার কর্মস্থল হাওড়ায় তাঁর পড়াশুনার ব্যবস্থা হয়। এখানে বেলিলিয়াস মিডল ইংলিশ স্কুল ও পরে হাওড়ার পঞ্চাননতলা এম,ই, স্কুলে পড়াশুনা করেন। ১৯০৪ সালে তিনি হাওড়া জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন। অতঃপর এফ,এ, পড়ার জন্য কলকাতা মাদ্রাসায় ভর্তি হন। যেহেতু কলকাতা মাদ্রাসা তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিল সেই অর্থে তিনি ১৯০৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ,এ পাশ করেন। হুগলি মুহসিন কলেজে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি,এ ক্লাসে ভর্তি হন কিন্তু ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলে পড়াশুনায় ছেদ পড়ে। এই সময় তিনি যশোর জেলা স্কুলে সহকারী শিক্ষক পদে যোগদান করেন। তিনি প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হলে যশোর জেলা স্কুলের চাকরী ত্যাগ করে আবার সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে কলকাতা সিটি কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি,এ পাশ করেন ১৯১০ সালে। ১৯১২ সালে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে এম,এ পাশ করেন। তিনি আইন অধ্যয়ন করেন এবং ১৯১৪ সালে বি,এল পাশ করেন। মওলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীর অনুরোধে তখন তিনি চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডু উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। ১৯১৫ সালে স্কুল শিক্ষকতা ছেড়ে নিজ জেলা বশীরহাট দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন। ১৯১৯ সালে এ পেশা ত্যাগ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎকুমার লাহিড়ী গবেষনা সহায়ক পদে যোগদান করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙলা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯২২ সালে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবেও নিয়োগ পান। ১৯২৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ইউরোপ যান এবং দুই বছর অধ্যয়ন করে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে ১৯২৮ সালে দেশে ফিরেন। ১৯৪০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগ থেকে রীডার ও অধ্যক্ষ হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন একজন প্রজ্ঞাবান মানুষ। তাঁর সাহিত্য জীবন নিবেদিত ছিল গবেষনায়। তিনি বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস নির্মাণের কাজ করেছেন। তিনি ভাষাতাত্ত্বিক হিসাবে পরিচিত।

তাঁর জীবনে তিন জন খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়ঃ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বহুভাষাবিদ পন্ডিত হরিনাথ দে, বাঙলার খ্যাতনামা গবেষক ও সাহিত্যের ইতিহাসকার দীনেশচন্দ্র সেন এর।

শিক্ষায়, গবেষণায় এবং ভাষাচর্চ্চায় তাঁর সমকক্ষ মুসলিম সমাজে তখন আর কেউ ছিল না। জীবিতকালেই তিনি সাতপুরুষের শিক্ষক হিসেবে অনেকের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন।

তাঁর রচনার বিষয় বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। তিনি বেদ-পুরাণ থেকে হাদীস-কোরান, আর্য্য জাতির প্রাচীনতম প্রেস-কাহিনী থেকে ইউসুফ-জোলেখার প্রেমকাহিনী, ভাষার ইতিহাস থেকে সাহিত্যের ইতিহাস, সিংহলী ভাষা থেকে তিব্বতী ভাষা, গীতার পাঠান্তর থেকে চর্যার পাঠান্তর, গোবধের উৎপত্তি থেকে পুথি সাহিত্যের উৎপত্তি, আরবী বর্ণমালা থেকে বাঙলা বর্ণমালা, বাঙলা ভাষায় ফার্সী প্রভাব থেকে উর্দু-হিন্দী প্রভাব, কসীদুতুল্ বুর্দঃ থেকে মুজাদ্দিদ আলফে সানী, কাহ্নপার কালনির্ণয় থেকে চন্ডীদাসের কাল নির্ণয়, ভাষার উৎপত্তি থেকে ভবিষ্যতের মানুষ আরও অজস্র বিষয়ে লিখেছেন। গবেষনামূলক রচনার অতিরিক্ত তাঁর কবিতা, গল্প ও নাটিকাও রয়েছে। এছাড়াও তিনি অজস্র পাঠ্য পুস্তক লিখেছেন। তাঁর ইংরেজি রচনাগুলি মূলতঃ গবেষণাধর্মী।

তিনি ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। আঞ্জুমানে ওলামা-ই-বাঙ্গালার এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির প্রথম সম্পাদকের পদ লাভ করেছেন। তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। তিনি 'আল-এসলাম' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৮ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রকাশিত হলে তিনি এবং মোজাম্মেল হক এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৩২৭ বঙ্গাব্দে সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'আঙ্গুর' তাঁর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১২টি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, আঙুরের পৃষ্ঠার উপরে একটি মুসলমান ও একটি হিন্দু কিশোরের রেখাচিত্র ছিল। বিষয় ও আঙ্গিকে আঙুরই নিঃসন্দেহে একমাত্র বাঙলা শিশুসাহিত্য পত্রিকা যা শুধু মুসলমান পাঠকদের জন্য না বের হয়ে, বের হয়েছিল হিন্দু-মুসলমান উভয়ের জন্য। ১৯২২ এ 'The Peace' নামক একটি ইংরেজি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। মূলতঃ ইসলামের সত্য, সৌন্দর্য্য ও শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি এ পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৩৭ সালে 'বঙ্গভূমি' নামক আরেকটি মাসিক পত্রিকা তাঁর পরিচালনায় প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষ থাকাকালীন সময়ে 'তকবীর' নামক (১৩৫৪-৫৫) তাঁর আরেকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছিলঃ "শহীদুল্লাহ একজন মুসলমান প্রধান-শিক্ষক, তিনি পন্ডিত ও আইন পাশ। তিনি কথায় কথায় সংস্কৃত শ্লোক আওড়ান, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, দাঁড়ি রেখেছেন, টুপি পড়েন, স্বল্পবাক এবং কর্মচঞ্চল। ইসলামি মূল্যবোধে উজ্জীবিত অথচ অসাম্প্রদায়িক। তৎকালীন স্কুল মাদ্রাসার সচরাচর যে ধরণের মুসলমান শিক্ষক দেখা যেত যাঁদের সাধারণতঃ 'হুজুর' বলে চিহ্নিত করা হতো, শহীদুল্লাহ তাঁদের মতো নন। তিনি অনন্যসাধারণ।"[২৭]

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (১৮৮৮-১৯৯৪) কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত পাইকারদী নামক একটি ছোট্ট গ্রামে ১৮৮৮ সালের নভেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুর রহমান এবং মাতার নাম আমেনা বিবি। পাঠশালার শিক্ষা শেষ করে স্থানীয় 'চালিতাতলী এডওয়ার্ড ইন্‌স্টিটিউশন' নামক একটি উচ্চ ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখানে কয়েক ক্লাশ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন।

পিতৃ বিয়োগ এবং দারিদ্র জনিত কারনে হাই স্কুলের পাঠ ত্যাগ করে সংসারের ব্যয় নির্বাহের জন্য স্টিমার কোম্পানীর স্থানীয় নরসিংহপুর ঘাটের ষ্টেশন মাষ্টারের সহকারী পদে চাকরি গ্রহণ করেন। এর পর কিছুকাল স্থানীয় সরকার ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে ওরিয়েন্টাল ইনসিওরেন্স কোম্পানির চাঁদপুর শাখার এজেন্ট নিযুক্ত হন।

মুসলমান সমাজের অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সাময়িকপত্র প্রকাশ এবং তার মাধ্যমে প্রচার কার্য দ্বারা তা দূরীকরণের জন্য ব্রতী হন। ১৯১৮ সালে সচিত্র মাসিক সাহিত্যপত্র 'সওগাত' প্রকাশ ও সম্পাদনা তাঁর জীবনের প্রধান কীর্তি। পত্রিকাটিতে তিনি নবীন-প্রবীণ মুসলমান সাহিত্যিক মন্ডলীর মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাপূর্ণ রচনা প্রকাশের দ্বারা অনগ্রসর মুসলমান সমাজকে অগ্রগতির পথে চালিত করেন। গোঁড়া মুসলমান সমাজের অন্ধ সংস্কার উপেক্ষা করে তিনি সওগাতে কবি-সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও বিদুষী মহিলাদের ছবি এবং সমাজ-মানুষের নানা অসঙ্গতির কার্টুন প্রকাশ করেন। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে কলকাতায় 'সওগাত প্রেস' নামে কালার প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। একই সময়ে তিনি কবি, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি সেবীদের মিলনকেন্দ্র ও আলোচনার কেন্দ্রস্থল হিসেবে 'সওগাত সাহিত্য মজলিশ' গঠন করেন। তিনি কাজী নজরুল ইসলামের অন্যতম সুহৃদ ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নজরুল ছিলেন 'সওগাত সাহিত্য মজলিসের' মধ্যমণি। সচিত্র সাপ্তাহিক মহিলা সাহিত্যপত্র 'বেগম' (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ) প্রতিষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ১৯৫৪ সালে 'সওগাত' এবং 'বেগম' কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন।

পরবর্তীকালে ঢাকার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি বাঙলা একাডেমীর ফেলো, জাতীয় যাদুঘর ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও নজরুল ইনস্টিটিউট ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হন। ১৯৭৫ সালে বাঙলা একাডেমীর সম্মাননা পুরস্কার, ১৯৭৭ সালে একুশের পদক, স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ও ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ১৯৭৬ সালে নিজ নামে 'নাসিরউদ্দীন স্বর্ণ পদক' প্রবর্তন করেন। এই পুরস্কার কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের বিশেষ কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রদান করা হয়। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ হলো—'শিরি ফরহাদ' (উপন্যাস), 'আল্লার নবী মোহাম্মদ(দঃ)', 'বাঙলা সাহিত্যে সওগাত যুগ', 'সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম'।

তিনি ছিলেন বাঙলার মুসলমান সমাজের জাগরণ আনয়নের অন্যতম পথিকৃৎ।[২৮]

শেখ হবিবর রহমান(১৮৯১-১৯৬২) মাগুরা জেলার ঘোষগতি গ্রামে ১৮৯১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯১০ সালে যশোর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯১২ সালে কলকাতা সিটি কলেজ থেকে আই,এ,পাশ করেন। ১৯১৪ সালে বি,এ, পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে অকৃতকার্য হন। পরবর্তীতে ১৯২২ সালে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং স্কুল থেকে এল,টি, পাশ করেন। ১৯১৪ সালে যশোর জেলা স্কুলের সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালে বয়াসত গভর্ণমেন্ট হাই স্কুলে যোগদান করেন এবং ঐ বছরেই মক্তব সাব-ইন্সপেক্টর পদে খুলনায় বদলি হন। অতঃপর ১৯২৭ সালে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ও ১৯৩০ সালে বারাকপুর গভর্ণমেন্ট হাই স্কুলে স্থানান্তরিত হন। ১৯৪৪ সালে সরকারী স্কুলের শিক্ষকতার কর্ম হতে অবসর গ্রহণ করার পর ১৯৫১ সালে খুলনা করোনেশন বালিকা বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে দায়িত্বশীল ছিলেন।

শেখ হবিবর রহমান সাংবাদিকতায়ও অবদান রাখেন। ১৯১৪ সালে তিনি সাপ্তাহিক 'মোহম্মদী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। তাঁর সম্পাদনায় সচিত্র মাসিক সাহিত্যপত্র 'বঙ্গ'নুর ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয়।

তিনি মুক্তবুদ্ধি চিন্তার অধিকারী ছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।[২৯]

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪) খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার বাঁশদহ গ্রামে ১৮৯৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুনশী মোহাম্মদ ইব্রাহিম। তিনি বাবুলিয়া হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে (বর্তমানে মওলানা আজাদ কলেজ) এফ,এ, ক্লাশে

Dhaka University Institutional Repository

ভর্তি হন। কিন্তু পরীক্ষা তিনি দেননি। এই সময়ই তিনি সাংবাদিক সাহিত্যিক কর্মকান্ডে নিমগ্ন হয়ে ওঠেন। মোটামুটি ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তিনি সাংবাদিকতার কাজে যুক্ত ছিলেন কখনো দৈনিক, কখনো সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকায়।

'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী', 'দৈনিক মোহাম্মদী', 'নবযুগ', 'দৈনিক সেবক', বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'খাদেম', 'The Mussalman', সাপ্তাহিক 'সওগাত', মাসিক 'সওগাত' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি কাজ করেছেন। তিনি ১৯২৩ সালে 'সাম্যবাদী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পত্রিকাটি তিনি নিজে দুই বছর সম্পাদনা করেছেন।

মূলতঃ কুড়ি শতকের সূচনালগ্ন হতে বিশের দশক পর্যন্ত সাময়িকপত্রের যে তুঙ্গ বিকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল তার প্রধান কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন এই সময়কার প্রধান একজন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক।

তিনি স্বসমাজের শিক্ষা, সাহিত্য,ধর্ম এবং ভাষা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির নাম ঃ 'মহামানুষ মুহসীন' (১৯৪০), 'মরুভাস্কর' (১৯৪১), 'সৈয়দ আহমদ', 'স্মার্ণা-নন্দিনী', হযরত মোহাম্মদ' (১৯৪৮), 'কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ', 'সিন্দবাদ-হিন্দবাদ', 'মোহাম্মদ আলী', 'নবাব আবদুল লতিফ', 'ছোটদের শাহনামা', ছোটদের হাতেম তাই', 'পাকিস্তানের ইতিহাস', 'মণি চয়ণিকা' প্রভৃতি।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী একজন আদর্শবাদী স্পষ্টবাক, তেজস্বী ও ত্যাগব্রতী মানুষ ছিলেন। তিনি সামাজিক সাম্যে বিশ্বাসী ছিলেন। কংগ্রেস, লীগ, খিলাফত, মুসলমান সাহিত্য সমিতি প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংশ্রব থাকলেও এর কোনটির সঙ্গেই তিনি একাত্ম হয়ে যান নাই। প্রয়োজনে তিনি নিজ মতানুসারে তাদের কঠোর সমালোচনা করতেও দিধা করেননি। তাঁর চিন্তার মূলই ছিল বাঙালি মুসলমানের সার্বিক উন্নয়ন সাধন।[৩০]

আবুল হুসেন (১৮৯৭-১৯৩৮) যশোর জেলার পানিসারা গ্রামে মাতুলালয়ে ১৮৯৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস যশোর সদর জেলাধীন ঝিকরগাছা উপজেলার কাঁউরিয়া গ্রামে। পিতার নাম হাজী মুহম্মদ মুসা।

আবুল হুসেনের শিক্ষা জীবন শুরু হয় পানিসারা গ্রামের পাঠশালায়। বাড়ীতে পিতার কাছে আরবী, ফার্সী ও উর্দু কিছুদিন শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি অত্যন্ত মেধাবী এবং অধ্যবসায়ী ছিলের। ১৯১৪ সালে যশোর জিলা স্কুল হতে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯১৬ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই,এ, এবং ১৯১৮ সালে বি,এ,পাশ করেন। প্রতিটি পরীক্ষাতেই তিনি বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেনীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম,এ, পাশ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ে অধ্যাপনাকালে ১৯২২ সালে বি,এল,ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে ১৯৩১ সালে মাষ্টার অব 'ল' ডিগ্রী লাভ করেন। তিনিই ছিলেন প্রথম বাঙালি মুসলমান যিনি এম,এল,ডিগ্রী লাভের গৌরব অর্জনই শুধু নয়, বিশেষ দুইটি বিষয়ে আশাতীত কৃতিত্ব অর্জন করায় দুইটি স্বর্ণ পদক লাভ করে কৃতিত্বের জ্বলন্ত স্বাক্ষর স্থাপন করেছিলেন।

১৯২০ সালে এম,এ,পাশ করার পর পরই তিনি কলকাতা হেয়ার স্কুলে সহকারী শিক্ষকের পদে যোগদান করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করলে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের সহকারী লেকচারার হিসাবে নিয়োগ লাভ করে কলকাতা ছেড়ে স্বপরিবারে ঢাকায় আসেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর তিনি হাউস টিউটর হিসেবে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সঙ্গে সংযুক্ত হন। সেই সময় এই হলটিই ছিল মুসলমান ছাত্রদের একমাত্র হল এবং শিক্ষা সংস্কৃতির চর্চা কেন্দ্র। এই মুসলিম হলের মিলনায়তনে মূলতঃ আবুল হুসেনেরই উদ্যোগে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমাজের প্রাণস্বরূপ ছিলেন আবুল হুসেন, ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ এবং ঐ কলেজের ছাত্র আবদুল কাদির। তিনি ছিলেন সাহিত্য সমাজের কর্মী সংসদ এর প্রথম সম্পাদক এবং পর পর তিন বছর এই দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সমাজের মুখপত্র ছিল বার্ষিক 'শিখা'।

'শিখা' পত্রিকার মর্মকথা 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব' তাঁরই সৃষ্টি। তাঁর ভাষায় সাহিত্য সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য- 'চিন্তা-চর্চা' অন্য কথায় অন্ন চিন্তার উপর 'অন্য চিন্তা'কে তুলে ধরা। বস্তুতঃ চিন্তা-চর্চা এবং জ্ঞানের জন্য আকাঙ্খা ও রুচি সৃষ্টি করা এবং সে কারণে জাতিধর্ম নির্বিশেষে নবীন পুরাতন সকল প্রকার চিন্তা ও জ্ঞানের সমন্বয় ও সংযোগ সাধনই ছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য। সব রকমের সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা এবং বিশেষ গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সাহিত্য সৃষ্টির দ্বারা বাঙালী মুসলমানদের সমাজ জীবন গঠন এবং তাদের সামনে নবজাগরণের আদর্শ তুলে ধরাই ছিল বুদ্ধির মুক্তিবাদীদের অন্যতম আদর্শ ও কর্মসূচী।

১৯২৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার চাকরী ত্যাগ করে তিনি ঢাকা জজ কোর্টে আইন পেশা শুরু করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই এই পেশায় তিনি সুনাম অর্জন করেন। একই সময় টেক্সট বুক

Dhaka University Institutional Repository

বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়ে স্কুল শিক্ষার নতুন সিলেবাস অনুযায়ী স্কুল পাঠ্যপুস্তক লিখতে শুরু করেন। এক্ষেত্রে বোর্ডের পুরাতন সিলেবাস পরিবর্তন, আধুনিকায়ন ও পরিবর্ধনে তিনি গঠনমূলক ভূমিকা রাখেন। তাঁর রচিত প্রথম পাঠ্যপুস্তক 'মুসলিম সাহিত্য শিক্ষা ১ম-৪র্থ ভাগ'। এই পুস্তকটি ৭ম শ্রেনী থেকে ১০ম শ্রেনীর জন্য বোর্ড কর্তৃক অবিভক্ত বাঙলার সকল স্কুলের পাঠ্য হিসেবে অনুমোদিত হয়েছিল। তাঁর রচিত অন্যান্য পাঠ্যপুস্তক হলোঃ 'সুকোমল পাঠ' (১ম-৪র্থ ভাগ), 'নব সাহিত্য শিক্ষা' (১ম-৪র্থ), 'বাঙলা রচনা ও অনুবাদ শিক্ষা', 'সরল নিম্ন গণিত' (১ম-২য়), 'Translation', 'সরল স্বাস্থ্য শিক্ষা', 'ভৌগোলিক পাঠ' ইত্যাদি। এ সময় তিনি নিজের এবং অন্যদের পুস্তক প্রকাশের জন্য 'মডার্ন লাইব্রেরী' নামক একটি লাইব্রেরীও ঢাকায় স্থাপন করেছিলেন।

পরবর্তীতে এম,এল, ডিগ্রী লাভ করার পর তিনি ১৯৩১ সালে কলকাতা হাইকোর্ট বারে যোগ দেন।

'শিখা' পত্রিকাটি সম্পাদনার আরও আগে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন 'যশোহর-খুলনা সিদ্দিকিয়া সাহিত্য সমিতি'র কলকাতা শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং এ সময় তিনি সমিতির কলকাতা শাখার হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা 'মলয়া' সম্পাদনা করতেন। এরই মাধ্যমে সাময়িকপত্র সম্পাদনায় তাঁর হাতেখড়ি হয়। ১৯২৫ সালের ৯ই জুন আবুল হুসেন এর সহায়তায় 'তরুণপত্র' প্রকাশিত হয়। মূলতঃ 'আধুনিক বাংলার নানাবিধ চিন্তাধারাকে সামনে রেখে' এবং 'মধযুগের আল মামুন, ইব্নে রুশ্দ, ইবনে খলদুন প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য মনীষীদের বুদ্ধি-চর্চা ও সমাজ-চিন্তার ধারা লক্ষ্য করে' এই পত্রিকাটির প্রকাশ ঘটে। পত্রিকাটির পরিচালন, প্রকাশের সকল ব্যয় বহন এবং নামে ও বেনামে বেশীরভাগ লেখাও তিনিই লিখতেন। এর সম্পাদক হিসেবে অন্যদের নাম ব্যবহৃত হত। এছাড়া মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র বার্ষিক 'শিখা'র প্রথম সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন তিনি। মাসিক 'জাগরণ' পত্রিকাটির সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথেও তিনি যুক্ত ছিলেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন।

আবুল হুসেনকে বাঙলা ভাষায় অর্থনীতি চর্চার পথিকৃৎ বলা যায়। মাতৃভাষায় অর্থবিজ্ঞান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সূত্রপাতের দ্বারা তিনি দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে জনমনকে শিক্ষিত ও সজাগ করতে প্রয়াস পান। ১৯৩২ সালে ওয়াক্ফ বোর্ড সৃষ্টির পিছনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

কলকাতা হাইকোর্টে বারে যোগ দেবার পর তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। এসময় 'জয়তী', 'দি মুসলমান' ও 'মুসলিম ষ্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় 'ইবনে মুসা' ছদ্মনামে রাজনীতি বিষয়ক তাঁর কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ১৯৩২-৩৩ সালে যশোর জেলা বোর্ডের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু নির্বাচন যুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর বিরুদ্ধ প্রতিপক্ষ প্রধান অস্ত্র হিসেবে 'মোহাম্মদী', 'হোলতান' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সম্পর্কিত বিরূপ উদ্ধৃতিসমূহকে ব্যবহার করেন। ফলে, তিনি ধর্মভীরু ভোটদাতাদের সমর্থন লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে জয় লাভে ব্যর্থ হন।

তবে রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাঁর প্রাগ্রসরমান চিন্তাধারার পরিচয় সুস্পষ্ট ছিল।

রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে তৎকালীন একটি বিশেষ প্রবণতার মূলে তিনি আঘাত করেছিলেন। সে প্রবণতা হিন্দু-মুসলিম বিরোধ। তিনি মনে করেন যে, মুসলমানগণ চিন্তাক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন দ্বারা নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম না হলে কেবল উপরি পাওনা নিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হবে না। এ জন্য তিনি পৃথক নির্বাচনেরও বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে "স্বাতন্ত্র-নীতি দুর্বলের নীতি, সে নীতির হুঁস হচ্ছে চির-দাসত্ব। এতে মুসলমানের মনে ভয় কখনো দূর হবে না।" আর স্বাতন্ত্র-নীতির কুফল তিনি তাঁর 'শতকরা পঁয়তাল্লিশ' (১৯২৬) প্রবন্ধে পরিস্কারভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর এই প্রবন্ধ সেই সময় মুসলিম সমাজে প্রবল প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল। প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনেকে তাঁর চাকরী প্রাপ্তিকেও এই নীতির কারণ বলে উল্লেখ করলে তিনি তাও সমর্থন করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরী ছেড়ে আইন ব্যবসায় গ্রহণ করেন।

তাঁর রাজনীতি চেতনার মূলকথা হিন্দু-মুসলমানের চিন্তার সমন্বয় হলেও তিনি সন্ত্রাসবাদী ও স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে গুপ্তঘাতক দেশপ্রেমিক নয়, দেশদ্রোহী-খোদাদ্রোহী-মানবদ্রোহী। তিনি আরও মনে করতেন 'হিন্দু সম্প্রদায়ের তরফ হতে ত্রিবিধ মনোভাব বাঙলার ভাবী রাষ্ট্রনায়কগণের চেষ্টা ব্যর্থ করবে- যথা, ১) মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ ও অশ্রদ্ধা ২) গুপ্তঘাতকের দেশদ্রোহিতা ও ৩) আইন অমান্যকারীদের উচ্ছৃঙ্খলতা। এই তিনটি অন্তরায় দূরীভূত না হলে কোন শুভ চেষ্টাই ফলবতী হবে না।" তাঁর এ উপলব্ধি যুক্তিবাদিতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, অকারণ আবেগের উপর ভিত্তি করে নয়।

চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে মুক্তবুদ্ধির অধিকারী আবুল হুসেন সমকালের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং সে যুগের তুলনায় অগ্রবর্তী ছিলেন।[৩১]

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ১৮৯৯ সালে বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব-পুরুষগণ পাটনা জেলার হাজীপুর হতে চুরুলিয়ায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম হাজী ফকির আহমদ।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সাহিত্য সেবার পাশাপাশি সাংবাদিকতার কর্মেও আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২০ সালের মে মাসে প্রকাশিত সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। ১৯২১ সালে মওলানা আকরম খাঁ 'সেবক' নামে একখানি দৈনিক পত্রিকা বের করেন। নজরুল ইসলাম ১৯২২ সালে এই পত্রিকার কাজে যোগদান করেন এবং মাত্র কয়েক সপ্তাহ কাজ করে মত বিরোধের কারণে 'সেবক' এর কাজে ইস্তফা দেন। অতঃপর ১৯২২ সালে তাঁর সম্পাদনায় অর্ধ সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ যে সময়ে ভারতীয় নেতাগণ স্বরাজ বা স্বায়ত্ব শাসনের দাবীতে আন্দোলন করছিলেন, সে সময়েই তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। 'ধূমকেতু'র আদর্শ সম্বন্ধে তিনি বলেন ঃ

"ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়"।

"স্বরাজ-টরাজ বুঝি না। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসন-ভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এ দেশকে শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করেছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুটলি বেঁধে সাগরপারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। আমাদের প্রার্থনা করার, ভিক্ষা চাওয়ার কুবুদ্ধিটাকে দূর করতে হবে।"

এই পত্রিকায় তিনি বহু অগ্নিবর্ষী সম্পাদকীয়, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯২২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যা 'ধূমকেতু'তে তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশিত হলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। বিচারে রাজদ্রোহের অভিযোগ এনে তাঁকে ১৯২৩ সালের ৮ই জানুয়ারী সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

১৯২৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। ১৯২৪ সালে বিবাহের পর তিনি হুগলীতে বসবাস শুরু করেন। হুগলীতে থাকাকালে তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতিতে যোগদান করতেন। তিনি প্রজাপার্টির হেমন্ত কুমার সরকার ও কম্যুনিষ্ট পার্টির কুতুব উদ্দীন আহমদ প্রভৃতির পরিচালনাধীন শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ পার্টির অনুগত হয়ে পড়েন। এ পার্টি থেকে 'লাঙ্গল' (১৯২৫) নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়, যার প্রধান পরিচালক ছিলেন তিনি।

১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে ফরিদপুর থেকে বঙ্গীয় বিধান সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রতিপক্ষ তমিজুদ্দীন খানের কাছে পরাজিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর কলকাতার অ্যালবার্ট হলে তাঁকে জাতীয় সংবর্ধনা প্রদানের সভায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর সভাপতির ভাষণে নজরুলকে 'প্রতিভাবান বাঙালি কবি' বলে আখ্যায়িত করেন। একই সভায় সুভাষচন্দ্র বসু কবিকে সম্ভাষণ করে বলেন, 'আমরা যখন যুদ্ধে যাব-তখন সেখানে নজরুলের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব'।

'প্রলয় শিখা' কাব্যগ্রন্থে রাজদ্রোহমূলক কবিতা থাকার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ মামলা এনে আদালত কর্তৃক ছয় মাসের কারাদন্ড দেওয়া হয় তাঁকে। ১৯৩১ এর ৪ঠা মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে জেল খাটার দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। ১৯৪০-এর অক্টোবরে নবপর্যায়ে 'দৈনিক নবযুগ' প্রকাশিত হলে তিনি এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৪২ এর অক্টোবরে তিনি মস্তিষ্কের ব্যধিতে আক্রান্ত হন। কিছুকাল পর চৈতন্য ও বাকশক্তি লোপ পাওয়ায় তাঁর সাহিত্য সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থায় অতিবাহিত করেন।

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার বহু উর্ধে। তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাঁর অনলবর্ষী কবিতা ও গানের মাধ্যমে। তিনি বিদ্রোহ করেছেন পরাধীনতার বিরুদ্ধে, দাসত্বের বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়াশীল জীর্ণ সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।[৩২]

মওলানা আবদুল্লাহ হেল কাফী (১৯০০-১৯৬০) ১৯০০ সালে দিনাজপুরের নূরুল হুদা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। মাত্র ছয় বছর বয়সে পিতৃহারা হওয়ায় বড় ভাই মওলানা বাকীর নিকট আরবী সাহিত্য ও আরবী ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। ৯ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি পিতৃ প্রতিষ্ঠিত নূরুল হুদা মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং এখানেই তাঁর আরবী সাহিত্য ও ধর্মীয় শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়।

তিনি রংপুরের কৈলাশ রঞ্জন হাই স্কুলে কিছুদিন পড়াশুনার পর হুগলী জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত সেখানে পড়াশুনা করেন। এরপর কলকাতা মাদ্রাসার এ্যাংলো-পার্সিয়ান সেকশনে প্রবেশ করেন এবং সেখান থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স মিশনারী কলেজ থেকে আই.এ. ও আই-এস.সি সংযুক্ত কোর্সে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশ করেন। ঐ কলেজে বি.এ.পড়ার সময় খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে উদ্দীপ্ত হয়ে কলেজ ত্যাগ করে বৃটিশ বিরোধী কার্যকলাপে যোগ দেন।

খিলাফত আন্দোলনকালীন সময়ে তিনি 'বঙ্গীয় ও কলিকাতা খিলাফত কমিটি'র সভাপতি মওলানা আজাদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর ইসলামী চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হন। মওলানা আজাদের নির্দেশে ১৯১৯-২০ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির পক্ষ হতে খিলাফত কর্মীদের প্রশিক্ষণদানের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকায় আসেন। তিনি ঢাকা, কুমিল্লা, গাইবান্ধা এবং অন্যান্য অঞ্চলে খিলাফত কমিটি ও কংগ্রেসের বিভিন্ন সভা-সম্মিলনে যোগদান করেন এবং জনসাধারণকে খিলাফত আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

তিনি সাংবাদিকতায়ও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রাখেন। মওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত উর্দু পত্রিকা'দৈনিক যামানা'র প্রথম সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে মওলানা আকরম খাঁ ও পত্রিকাটির অন্যতম সম্পাদক শায়েক আহমদ উসমানী খিলাফত আন্দোলনের দায়ে গ্রেফতার হলে মওলানা কাফী একাই 'দৈনিক যামানা'র সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৪ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলে তিনি 'সত্যাগ্রহী' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উক্ত সালের ২৯শে নভেম্বর পত্রিকাটি পৌনে তিন বছর চলার পর ১৯২৭ সালে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৯সালে তিনি পাবনা থেকে 'তরজুমানুল-হাদিস ' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। আমৃত্যু ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এটি ১৯৭০ সালে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৭ সালের ৭ই অক্টোবর তাঁর সম্পাদনায় 'সাপ্তাহিক আরাফাত' আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকাটি এখনো চালু রয়েছে। তাঁর সম্পাদনায় এই পত্রিকা দুইটি উঁচু শ্রেনীর ধর্মীয় পত্রিকায় পরিণত হয়।

উল্লেখ্য যে, ১৯২২-২৪ সালে তিনি দিল্লী গমন করে মুহাদ্দিস আবদুল ওয়াহ্হাব 'নাবীনা' ও বেনারসের মুহাদ্দিস আবুল কাসেমের নিকট হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

তিনি অখন্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষপাতী এবং কংগ্রেস ও 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দ' পন্থী ছিলেন। ১৯২২ সালে তিনি জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দ'- এর বাঙলা শাখার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতি তাঁর দৃঢ় সমর্থন ছিল। সত্যাগ্রহী পত্রিকায় তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটে।

১৯২৭ সালে 'সত্যাগ্রহী' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি উত্তর বঙ্গে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

সংগ্রেস-পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনে (১৯৩০-৩৩) যোগ দিয়ে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেন এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে দুইবার কারাবরণ করেন।

১৯৪২ সালে হজ্জ করার পর দেশে ফিরে তিনি সক্রিয় রাজনীতি ত্যাগ করে একনিষ্ঠভাবে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি আহলে হাদীস জামাআতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হন এবং প্রাদেশিক ও উপমহাদেশীয় বিভিন্ন আহলে হাদীস কনফারেন্সে যোগদান করেন। ১৯৪৬ সালের শেষে 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমিয়তে আহলে হাদীস' গঠিত হলে তিনি এর সভাপতি নির্বাচিত হন। আর জমিয়তে আহলে হাদীসের মাসিক মুখপত্র ছিল 'তরজুমানুল হাদিস' ও সাপ্তাহিক 'আরাফাত'।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং "বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে যে সব মুসলিম মনীষী বাংলার মুসলমানদেরকে ধর্মীয় প্রেরণা, জাতীয় চেতনা ও স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন,তন্মধ্যে মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী, কর্মাণুরাগী ও সাংগঠনিক শক্তির অধিকারী"।[৩৩]

আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪) কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার আড়াইসিদ্ধা গ্রামে ১৯০৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী আফছার উদ্দিন।

তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় গ্রামের মুনশী বা মাষ্টার সাহেবের কাছে আরবী কায়দা, আমপারা বা কোরআন শরীফ এবং বাংলা পড়ার মধ্য দিয়ে। কিছুদিন পাঠশালায় পড়ার পর সেটি বন্ধ হয়ে গেলে গ্রামের হিন্দু পাড়ার পন্ডিত মহাশয়ের উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র হন। অতঃপর তিনি ভর্ত্তি হন পার্শ্ববর্তী চারতলা বাজারে সদ্য প্রতিষ্ঠিত মধ্য ইংরেজি বা মাইনর স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে। এই স্কুলে পরীক্ষার ফলাফল সাফল্যজনক হওয়ায় তাঁকে ব্রাহ্মনবাড়ীয়া অন্নদা ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্লাশ সেভেন-এ ভর্ত্তি করে দেন তাঁর চাচা। তিনি এই স্কুল থেকে ১৯২৩ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে মহসিন বৃত্তি লাভ করেন। এরপর তিনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে আই,এসসি, ক্লাশে ভর্ত্তি হন এবং ১৯২৫ সালে এখান থেকে আই,এসসি, পাশ করেন। ১৯২৭-১৯২৯ সময়কালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি,এ, পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন।

১৯২৬ সালে কলকাতার 'সওগাত' পত্রিকায় সম্পাদনা বিভাগে চাকরী গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, কলেজ জীবনেই তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করেন এবং বিভিন্ন পত্রিকায় তা মুদ্রিত হয়। তাঁর ঢাকায় ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে কাজী নজরুল ইসলাম ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে 'লাঙ্গল' পত্রিকা বের করেন। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর লাঙ্গল পত্রিকার মাধ্যমে মানুষের যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির বাণী প্রচার করেন তা আবদুল কাদিরকে প্রভাবিত করে। এরই ফলে ১৯২৬ সালের ১৯শে জানুয়ারী 'ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ', যে সমাজের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলন গড়ে তোলা। আর এ সমাজ গঠনে অগ্রণী ছিলেন আবদুল কাদির এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সতীর্থ আনোয়ার হোসেন এবং আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন। এ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন ঃ

> "১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী প্রথমতঃ আমারই উদ্যোগে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের ভিত্তি-পত্তন হয়েছিল। 'বুদ্ধির মুক্তি', Emancipation of intellect ছিল সেই সমাজের মূলমন্ত্র। শাস্ত্র নিরপেক্ষ যুক্তিবাদ ছিল আমাদের আদর্শ। অন্ধানুবর্তিতার পথ পরিহার করে সমাজ জীবনের সর্বতোমুখী বিকাশ সাধনই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

লোকশ্রেয়ঃ বিচার বুদ্ধির আলোকে দেশের ও জাতির সর্ববিধ সমস্যার সমাধানই ছিল আমাদের কাম্য।"...

এই সাহিত্য সমাজের মুখপত্র বার্ষিক 'শিখা' (১৯২৭) পত্রিকার তিনি প্রকাশক ও লেখক ছিলেন। ১৯৩০ সালে তিনি কলকাতা করর্পোরেশনের একটি প্রাথমিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তবে, এ সঙ্গে তাঁর সাহিত্য ও সাংবাদিকতার চর্চা চলতে থাকে অব্যাহতভাবে।

সাময়িকপত্র সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত। তিনি ১৯৩০ সালে 'জয়তী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। একই বছর তিনি 'নবশক্তি' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি 'যুগান্তর' পত্রিকায় যোগদান করেন। ১৯৪১ সালে কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি কর্পোরেশন স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে বাঙলা সরকারের ফিল্ড পাবলিসিটি বিভাগের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'বাংলার কথা' এর উপসম্পাদক পদে যোগ দেন। এর পর ১৯৪৬ সালে সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। আর দেশ বিভাগের পর কলকাতার সাপ্তাহিক 'পয়গম' পত্রিকা সম্পাদনা করেন।[৩৪]

মুহম্মদ নূরুল হক দশঘরী (১৯০৭-১৯৮৭) সিলেট জেলার বিশ্বনাথ থানার দশঘর গ্রামে ১৯০৭ সালের ১৯শে মার্চ এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আলহাজ্ব ক্বারী মোহাম্মদ আয়াজ ছিলেন সেই অঞ্চলের একজন বিখ্যাত আলেম।

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ শুরু হয় দশঘর গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ১৯২১ সালে তাঁকে স্থানীয় রায়কেলী এম,ই, স্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়। এখানে চার বছর অধ্যয়ন করে ১৯২৪ সালে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এম,ই,স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি ইংরেজি পড়ার জন্য হাই স্কুলে ভর্ত্তির ইচ্ছা প্রকাশ করলেও পিতার ইচ্ছায় ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হবার জন্য মাদ্রাসায় পড়তে বাধ্য হন। ১৯২৫ সালে তিনি গোলাপগঞ্জ থানার অন্তর্গত ফুলবাড়ি আজিজিয়া মাদ্রাসায় ভর্ত্তি হন। মাদ্রাসাটি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত। পরে ফুলবাড়ি জাতীয় মাদ্রাসায় ভর্ত্তি হন। এখানে তিনি আড়াই বছর অধ্যয়ন করেন। এর পর তিনি ঢাকার বেলাব অঞ্চলের (বর্তমান নরসিংদী জেলায়) আমলাব সিনিয়র মাদ্রাসায় ভর্ত্তি হন। ১৯২৮ সালে শেষ পরীক্ষা দেন এবং ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্ত্তি হন। এখানে দুই বছর অধ্যয়ন করে ১৯৩৬ সালে শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন। অতঃপর তিনি কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, এম.ই. স্কুলের ছাত্র থাকাকালেই তিনি নিজ গ্রামে একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে তিনি ক্লাশে পেছনের বেঞ্চে বসে বাঙলা বই বা সাময়িকপত্র পড়তেন। সহপাঠীদেরও বাঙলা ভাষা অধ্যয়নে অনুপ্রাণিত ও সাহায্য করতেন।

সিলেটের কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৯৩৬)। মুসলিম সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন-

> "তৎকালীন মুসলমানদের চরম চরম অবনতিটাই সে সময় আমাকে বিশেষভাবে পীড়া দিচ্ছিলো। আর এই অনাকাঙ্খিত অবনতির হাত থেকে মুসলমানদেরকে বাঁচানোর লক্ষ্যে মুসলিম সাহিত্য সংসদের প্রতিষ্ঠা। বলা যায়, 'সংসদ' প্রতিষ্ঠার পেছনে যে চিন্তাটা আমার মনে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছিল, তা হলো মুসলমানদেরকে স্বীয় আদর্শ ঐতিহ্য ও সাহিত্য সংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট হওয়ার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করা।"

কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ মুসলমানদের সাহিত্য চর্চায় নিবেদিত হলেও তার চরিত্র উদার ও অসাম্প্রদায়িক। সংসদ প্রতিষ্ঠার পর তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগার সংসদের সঙ্গে একীভূত হয়।

তিনি কৈশর থেকেই চিন্তাশীল ছিলেন। সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে জাতীয় উন্নতির কথা তিনি চিন্তা করতেন। ফুলবাড়ি মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে সিলেট থেকে প্রকাশিত সেই সময়ের একমাত্র মুসলমান পরিচালিত ও সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'যুগবাণী' পত্রিকায় তিনি সমাজ কল্যাণমূলক লেখা আরম্ভ করেন।

সংসদের পাঠাগারটিকে দুস্প্রাপ্য গ্রন্থরাজি, পত্র-পত্রিকা ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের দ্বারা সমৃদ্ধ করে সংস্কৃতি চর্চায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি।

সাময়িকপত্র সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্রাসার সিনিয়র দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেনীর ছাত্র থাকাকালে হাতে লেখা ত্রৈমাসিক 'অভিযান' নামক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন তিনি। পরে এটি নাম পরিবর্তন করে 'আল ইসলাহ' হয় (তিনি ছিলেন এর সম্পাদক)। তাঁর জীবনের অসামান্য কীর্তি ১৯৩৯ সালে 'আল ইসলাহ' পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশ করা। পত্রিকাটি সাহিত্য সংসদের মাসিক মুখপত্র ছিল। তিনি আল্ ইসলাহ্ পাবলিশিং হাউস প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রকাশনী সংস্থা থেকে মাঝে মধ্যে বই বের করতেন। মূলতঃ আল্ ইসলাহ্ প্রকাশনীর মাধ্যমে জাতীয় সাহিত্যের প্রচার, লেখক ও পাঠক সৃষ্টি এবং ঐতিহ্য ভিত্তিক মনোভাব গঠন করাই ছিল তাঁর একমাত্র ব্রত ও সাধনা।

তিনি মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। সিলেটের গণভোট অনুষ্ঠানের সময় মুসলিম লীগের কর্মী হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন স্থানে ব্যপকভাবে সফর করে স্বাধীন পাকিস্তান হাসিল এবং সিলেটকে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা বাঙলা হওয়ার পক্ষে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন এবং এর স্বপক্ষে 'আল ইসলাহ' পত্রিকায় সম্পাদকীয় রচনা করেন।

সাহিত্য ও সমাজ সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯৬৩ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান সরকার কর্তৃক 'তমঘা-ই-খিদমত' উপাধি লাভ করেন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে উক্ত উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন।

তিনি পত্র-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখেছেন এবং একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হলো— 'বিশ্বনেতা' (১৩৬০), 'ফারুক(রাঃ) চরিত্রের বৈশিষ্ট্য' (১৩৬০), 'সংবাদপত্র সেবায় সিলেটের মুসলমান' (১৯৬৯), 'শেষ নবীর বাণী' (১৯৭০), 'আলোক স্তম্ভ (১৯৮০), 'বিগত যুগের আদর্শ' (১৯৮১) এবং 'হযরত শায়খ জালাল মুজর্রদ(র)-র শিষ্যগণ' (১৯৮২)।[৩৫]

আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪) ১৯০৫ সালের ২৭শে জানুয়ারী বর্ধমান জেলার কাশিয়াড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলবী আবুল কাসেম।

সাত বৎসর বয়সে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল উচ্চ ইংরেজি স্কুলে ভর্ত্তি হন। ১৯২৩ সালে এই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। কিন্তু কলকাতার ছাত্রাবাস মনঃপুত না হওয়ায় আই,এ, দ্বিতীয় বর্ষ পড়ার সময় তিনি কলকাতা ছেড়ে বর্ধমান রাজ কলেজে ভর্ত্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯২৫ সালে আই,এ পাশ করেন। পুনরায় তাঁকে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি করানো হলে তিনি এবারও সেখান থেকে চলে আসেন এবং বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে ১৯২৮ সালে ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অতঃপর তিনি বর্ধমান থেকে আলীগড় যান এবং আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে এম,এ, ও আইন ক্লাশে ভর্ত্তি হন। কিন্তু সেখানকার পরিবেশ তাঁর অনুকুল মনে না হওয়ায় আলীগড় ত্যাগ করে বর্ধমান চলে আসেন এবং পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৯৩১ সালে তিনি এখান থেকে বি,এল ডিগ্রী লাভ করে বর্ধমান আদালতে আইন ব্যবসায় যোগদান করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আইন ব্যবসায় সুনাম অর্জন করেন।

১৯৩৬ সালের শেষ পর্বে তিনি রাজনীতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে বর্ধমান থেকে তিনি নির্বাচিত হয়ে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য হন। ১৯৩৭ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি বর্ধমান জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪২ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালের ৭ই নভেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ সালে তিনি পুনরায় এই পদে নির্বাচিত হন।

তিনি মুসলিম লীগকে একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও জনকল্যাণমুখী রাজনৈতিক দল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন এবং দলের সাংগঠনিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য সমগ্র বাঙলা পরিভ্রমন করেন।

মুসলিম লীগের পত্রিকা সাপ্তাহিক 'মিল্লাত'(১৯৪৫) তিনি কিছুদিন সম্পাদনা করেন। পত্রিকাটি অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা এবং আসামে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

মূলতঃ তাঁর কর্মকুশলতা এবং সাংগঠনিক দক্ষতার ফলে বাঙলার মুসলমান সমাজ ব্যাপকভাবে লীগের পতাকাতলে সমবেত হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৪৬ সালের বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনে মুসলিম লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে।

আবুল হাশিম প্রগতিশীল ধ্যানধারণার অধিকারী এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে বাঙলার মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে একটি শক্তিশালী বামপন্থী দলের সৃষ্টি হয়।

তিনি ইসলামিক তত্ত্বের লেখক হিসেবে খ্যাত। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হলো—`The Creed of Islam' (1950), `As I see It' (1965), `Integration of Pakistan' (1967), `Arabic Made Eassy' (1969), 'রব্বানী দৃষ্টিতে (১৯৭০), `In Retrospection' (1974) ইত্যাদি।[৩৬]

তাঁদের প্রকাশিত পত্র পত্রিকাগুলিকে প্রধানতঃ তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

১। এই সকল পত্রিকা সমূহের মধ্যে কতকগুলি পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল মূলতঃ ইসলাম ধর্ম বিষয়ে আলোচনা এবং ধর্মপ্রচার করা। এক্ষেত্রে তাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল মৌলবাদী, রক্ষণশীল এবং পশ্চাদমুখী। যেমন- 'ইসলাম দর্শন', 'শরিয়ত', 'মোসলেম দর্পণ', 'সত্যাগ্রহী', 'তরুনের ভান্ডা ও এছলামের ঝান্ডা' প্রভৃতি।

২। সে সব পত্র-পত্রিকা যার প্রধান লক্ষ্য ছিল ধর্মপ্রচারের চাইতে জাগতিক উন্নতি সাধন করা। রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল উদারনৈতিক এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাজ সংস্কারের আহ্বান রেখেছিল। এই সমস্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— 'সুধাকর', 'কোহিনূর', 'নবনূর',

Dhaka University Institutional Repository

'বাসনা', 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা', 'বঙ্গনূর', 'সাধনা', 'বুলবুল', 'সওগাত', 'শিখা, 'সাম্যবাদী', 'হোলতান', 'নওরোজ', 'জয়তী' প্রভৃতি।

৩। কতকগুলি পত্রিকা ছিল মধ্যপন্থী। মধ্যপন্থী পত্র-পত্রিকার মধ্যে ছিল— 'মাসিক মোহাম্মদী', 'আজাদ', 'মিল্লাত' প্রভৃতি। রাজনৈতিক দিক থেকে এ সকল পত্রিকাগুলি বিচ্ছিন্নতাবাদী বা স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারক ও মুখপত্র হলেও এগুলি ধর্মীয় পত্রিকা ছিল না, এই অর্থে যে ধর্মপ্রচার এদের উদ্দেশ্য ছিল না।

মুন্সি মেহেরুল্লাহ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ-বঙ্গ-আসামের গ্রামগুলিতে ওয়াজ করতেন এবং পত্র পত্রিকাগুলির প্রচার করতেন।[৩৭]

উল্লেখ্য, নবাব আব্দুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং সৈয়দ আমীর আলী মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন সত্য, কিন্তু এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের কর্মকান্ড উচ্চ পর্যায়ের মুসলমান সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল অর্থাৎ নগর কেন্দ্রিক ছিল। কিন্তু গ্রামের সাধারণ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এই সমস্ত মনীষীগণের যোগাযোগ সামান্যই থাকার কারণে অধিকাংশ গ্রাম্য সাধারণ মুসলমানের উপর তাঁদের প্রভাব তেমন পড়েনি। মওলানা আকরম খানের ভাষায় মোসলেম বঙ্গের দিকে দিকে যখন 'অসাধ্য অবসাদ', গোরস্থানের নীরব নিস্তব্ধ ও নির্ব্বাক বিভীষিকা, নিরাশার সূচীভেদ্য ভয়াবহ অন্ধকার' দেখা দিয়েছিল এবং 'শিক্ষাহীন', 'সম্পদহীন', সম্মানহীন অনুন্নত জাতি'[৩৮] হিসেবে পরিগণিত ও চিহ্নিত হয়েছিল তখন সাংবাদিকতার মাধ্যমে স্বসমাজের উন্নয়নের লক্ষে যে সকল মুসলমান আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন প্রধানতঃ মৌলভী-মওলানা মুন্সী শ্রেণীর ব্যক্তি- যাঁদের শিক্ষা লাভ ঘটেছিল মকতব-মাদ্রাসায় আরবী-ফার্সী-উর্দ্দুর পরিমন্ডলে। তাঁদের সঙ্গে গ্রামের বাঙলা ভাষী সাধারণ মানুষের যোগাযোগ ছিল। বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন এই সকল ব্যক্তিগণ যদিও উর্দু, আরবী ও ফার্সী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন তা সত্বেও তাঁরা বাঙলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের দ্বারা সমাজকে উন্নতির পথে চালিত করার প্রয়াস চালান।[৩৯]

এই সকল সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিগণের ভূমিকা তুলে ধরে *আল-ইসলাহ* পত্রিকা মন্তব্য করেছিলঃ "বর্ত্তমান মুছলিম ভারতের অধিকাংশ সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও সম্পাদক আলেম।

তাঁহারা গাঁয়ে গাঁয়ে হাঁটিয়া ওয়াজ নছিহত দান করিয়া এখনও মুর্দ্দা, মুছলীম সমাজকে সঞ্জীবনী ধারা পান করাইয়া জিন্দাহ রাখিয়াছেন। তাঁহাদের যশোগাঁথা কাগজে লিখিত হয় না, তাঁহাদের গুণগরিমা সুধী সমাজে পরিকীর্ত্তিত হয় না"।[৪০]

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের শেষের দুই দশকে বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ এবং এ ব্যাপারে পত্র-পত্রিকাগুলিতেও তেমন কোন আলোচনার উল্লেখ লক্ষ করা যায় না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের পৃথক সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান 'মুসলিম লীগ' এর জন্ম বাঙালি মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এরই ফলে তাদের রাজনৈতিক আশা-আকাংখা ও চিন্তা জগতে এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়।

পরবর্তীতে বঙ্গভঙ্গ রদের দাবিতে প্রধানতঃ হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন মুসলিম চেতনায় সন্দেহের বীজ রোপণ করে, কংগ্রেসের 'ভারতীয় জাতীয়তা'র দাবির আড়ালে 'হিন্দু জাতীয়তা' অর্থাৎ 'হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ' এর আকংখা এবং তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা নিহিত রয়েছে— এই ধারণা তাদের মধ্যে জন্মায়।[৪১]

এরফলে নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের অধিকাংশই যাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে পূর্বে যুক্ত ছিলেন তাঁরা কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হন এবং স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তার প্রবক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, বঙ্গভঙ্গ রদের দাবীতে পরিচালিত আন্দোলনের সময় থেকে অসহযোগ আন্দোলনের আরম্ভকাল পর্যন্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পর্কে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান সংশয় তাদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি জাগ্রত করে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবাদের পথ রচনা করেছিল।

এই পটভূমিকায় স্বতন্ত্র আবাসভূমি 'পাকিস্তান' দাবীকে বাস্তবায়নের লক্ষে বাঙলার মুসলমানগণ সচেতন হয়ে ওঠে এবং অল্প সময়ের মধ্যে দেশব্যাপী এর স্বপক্ষে আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে— যা সমকালীন মুসলিম সাংবাদিকতায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

এই সময়ে (১৯০৬-৪৭) মুসলমান সম্পাদিত প্রায় সকল পত্রিকাতেই 'পাকিস্তান' দাবীকে জোরালো ভাবে রূপ দেওয়া হয়েছিল যেমন— 'মোয়াজ্জিন', 'ইসলাম-দর্শন', 'মাসিক মোহাম্মদী', 'আল্-এসলাম', 'হানাফী', 'হেদায়াত', 'বঙ্গনূর', 'আল্-ইস্‌লাহ্', 'আল-আমান', 'আজাদ', 'গুলিস্তাঁ', 'প্রভাতী', 'আল-জ্বালাল', 'জাগরণ', যুগভেরী', সবুজের সুর', মিল্লাত' প্রভৃতি। এ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন (১৮৮৮-১৯৯৪) জানান ঃ

> "সেই সময় (১৯০৬-১৯৪৭) আমরা সকলেই 'পাকিস্তান' বলে একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র কামনা করেছিলাম। আর সেই সময়ের মুসলমান সম্পাদিত সব পত্র-পত্রিকাই এই ব্যাপারে একই ভূমিকা পালন করেছিল। পাকিস্তান সম্পর্কিত লেখা পত্রিকায় প্রকাশ করতো।

Dhaka University Institutional Repository

বড় বড় হিন্দু রাজনীতিবিদদের বা হিন্দু রাজনৈতিক নেতাদের রাজনীতির মূল বিষয় বা লক্ষ্য ছিল নিজেদের স্বার্থ নিয়ে কাজ করা। মূলতঃ হিন্দু এবং ইংরেজদের অত্যাচারের কবল থেকে মুসলমানরা নিজেদের রক্ষা করার জন্য 'পাকিস্তান' নামক পৃথক আবসভূমির প্রতিষ্ঠা চেয়েছিল এবং এ ব্যাপারে আন্দোলন করেছিল। হিন্দুদের অনুদার এবং শত্রুতামূলক আচরনের কারণেই 'মুসলিম লীগ' এর জন্ম হয়েছিল।

মুসলমান সম্পাদিত প্রায় প্রতিটি সংবাদ পত্রে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' এই কথাটি লেখা হতো। প্রতিটি জনগণ মনে প্রাণে পাকিস্তান চেয়েছিল। আর জিন্নাহ সাহেব না জন্মালে পাকিস্তান জন্মলাভ করতো না। মুসলমান অধ্যুষিত প্রদেশগুলিতে 'কোন হিন্দু নয়, সেখানে মূখ্যমন্ত্রী হবেন মুসলমান'— এটা মুসলমানরা চেয়েছিল। পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ হতো না। সেই সময় মুসলমানদের তেমন কোন পত্রিকা ছিল না। যার জন্য মুসলমান লেখকদের লেখা ছাপাতে খুব অসুবিধা হতো। প্রকৃতপক্ষে, প্রগতিশীল বলতে যা বোঝায় সে অর্থে সেই রকম কোন পত্রিকা মুসলমানদের সেই সময় ছিল না। মুসলমান পত্র-পত্রিকাগুলির অধিকাংশেরই নামকরণ করা হয়েছিল ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে।"[৪২]

পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি যাঁরা 'সাহিত্যিক ও কবি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ মুন্সী মেহেরুল্লাহ, পন্ডিত রিয়াজউদ্দীন মাশহাদী, শেখ আবদুর রহিম, মুন্সী রিয়াজ উদ্দীন। এ ছাড়াও মওলানা মোহাম্মন আকরম খাঁ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, এয়াকুব আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, রওশন আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, বেনজীর আহমদ, ফজলুল হক সেলবর্ষী, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, কাজী নজরুল ইসলাম, মুজফ্ফর আহমদ, আয়নুল হক খাঁ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন, খালেকদাদ চৌধুরী, মওলানা মুন্তাকিজুর রহমান, কবি ফররুখ আহমদ, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রভৃতি।[৪৩]

তৎকালীন সংবাদপত্র প্রকাশকগণ সংবাদপত্রকে মনে করতেন 'সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার'। অধিকাংশ পত্রিকার সম্পাদকগণ এই সময় সাংবাদিকতাকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেননি—গ্রহণ করেছিলেন আদর্শরূপে। তাই স্বসমাজের উন্নয়নের খেদমতে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে *আহমদী* পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছিল ঃ "ধন, মান, বিদ্যা বা বুদ্ধির গরিমা আমাদের নাই। তদ্রূপ কোন উপহার আমাদের ক্ষমতার বহির্ভূত। তবে আল্লাতালার অপার কৃপায় এক বিষয়ে আমরা অতিশয় ভাগ্যবান।"[৪৪]

কুড়ি শতকের একজন সংবাদ সেবক মোহাম্মদ মোদাব্বের এ ব্যাপারে তাই বলেছিলেনঃ "১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত 'দি মুসলমান' ও 'খাদেম' পত্রিকায় সাংবাদিকতা করতে গিয়ে পয়সা পাইনি, পেয়েছি আনন্দ ও সম্মান।[৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

নবযুগ পত্রিকার সাংবাদিক মুজফ্ফর আহমদ এর কথায়ঃ "কারণ আমাদের ভিতরে চাকরী করার মতো ভাব একেবারেই ছিল না। আমরা কাজ করে যাচ্ছিলেম নিজেদের রাজনীতিক কর্তব্য হিসাবে। কার কাগজ, কে মালিক এসব কথা আমাদের মনেই উঠত না। এমন কি বেতনের জন্যেও আমাদের দিক হতে তেমন পীড়াপীড়ি ছিল না।"[৪৬]

আবু জাফর শামসুদ্দীন *হোলতান* পত্রিকায় কর্মরত থাকাকালীন এ পেশায় তাঁদের মনোভাব কি ছিল সে কথা উল্লেখ করে বলেছেনঃ "হোলতানের অর্থের টানাটানি লেগেই ছিল। মাসকাবারে পুরো এক মাসের বেতন এক সংগে কেউ কোনদিন পাইনি। আমরা ভিক্ষুকের মতো লুঙ্গি মার্চেন্টদের দোকানে উপস্থিত হতাম। সম্পাদক আশরাফ আলী খানও কখনও কখনও এক সংগে দশ টাকার বেশি পাননি। আমাদের ভাগ্যে দু'টাকা এক টাকা জুটতো-আট আনা পেয়েছি বলেও মনে পড়ে। কিন্তু আমরা পেশাটাকে চাকুরি মনে করিনিঃ মনে করতাম দেশ ও সমাজের সেবা।"[৪৭]

পত্রিকাগুলি থেকে বঙ্গীয় মুসলিম সাংবাদিকতার উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি পরিস্কার চিত্র পাওয়া যায়। দেখা যায়, মুসলমান সম্পাদিত প্রায় সকল পত্রিকাই 'নিবেদন' শিরোনামে তাদের আত্মপ্রকাশের কারণ সমাজের নিকট তুলে ধরেছিল।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকা এর উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে লিখেছিলঃ "আমাদের উদ্দেশ্য কি?

প্রথমতঃ আমরা চাই আমাদের অতীতের গুপ্ত অথচ গৌরবময় সুদৃঢ় ভিত্তি পুনরায় লোক চক্ষুর সম্মুখে আনিয়া তাহার উপর বর্ত্তমানের বিরাট বিশাল, উদার, উন্নত ও মহামহিম সৌধ রচনা করিতে। আমরা চাই— আমাদের সেই বিস্মৃত অতীতের আদর্শে মহান, সুষমার অপরূপ, গৌরবে অমর কীর্ত্তিগাথা বাঙলাবীণার সুরে গাহিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে উন্নতির আকাঙ্খা, ভাবের উদ্দীপনা, কর্ম্মের প্রেরণা আনিতে।"[৪৮]

তবলীগ পত্রিকা তার প্রকাশকালে বলেছিল ঃ "তবলীগ" সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে— মোসলমানের জন্য জীবনের বাণী। বাঙলার আপনভোলা মোসলমানকে জীবনের সত্যিকারের সন্ধান বলিয়া দিয়া, তাহাকে মানুষের মত-জীবন্ত মানুষের মত— দুনিয়ার পিঠে বাঁচিয়া থাকার অধিকারে গৌরবান্বিত করাই— 'তবলীগের'— সাধনা।"[৪৯]

মোস্‌লেম-সুহৃদ লিখেছিল ঃ "দেশের এই সঙ্কট সময়ে, বঙ্গীয় মুসলমানগণের এই ঘোর দুর্দ্দিনে এদেশে কাগজ চালাইয়া লাভবান হইবার সময় আর নাই। স্বপ্নেও আমরা সেরূপ কল্পনা অন্তরে স্থান দেই নাই। আমাদের আশা সমাজ সেবা— আমাদের লক্ষ্য সমাজের অভাব-অভিযোগ—জাতীয় ভাইগণের দুঃখ

Dhaka University Institutional Repository

দুর্দ্দশা রাজ দ্বারে জ্ঞাপন করা। আমরা এই মহৎ উদ্দেশ্য হৃদয়ে বাঁধিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি, ...জানিনা আমাদের আবেদন নিবেদন করুণ ক্রন্দন অরণ্যে রোদন হইবে কি না ?"[৫০]

'আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য' শিরোনামে *হেদায়াত* পত্রিকাতে লেখা হয়েছিলঃ "আজ সারা বাংলার দেহে নব জাগরণের স্পন্দন বহিয়া যাইতেছে—দিকে দিকে আজি নবীন উষার নবীন ঝলকে দশ দিক মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। দিকে দিকে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এ সময় আমাদের ঘুমাইয়া কাল কাটাইলে চলিবে না। তাই আমরা 'হেদায়াত' হস্তে সমাজের খেদমতে সমুপস্থিত"।[৫১]

কোহিনূর পত্রিকাটি লিখেছিলঃ ...."কোহিনূর" সমাজের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে! পূর্ব্বপুরুষের মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ও প্রতিভা, দান ও পূণ্য, কাব্য ও শিল্পের বিস্ময়াবহ কীর্ত্তিকলাপ শুনাইয়া হৃদয়ে হৃদয়ে আশার কণক প্রদীপ জ্বালিবার জন্য, প্রাণে প্রাণে আনন্দের নির্ঝর ছুটাইবার সাধে, বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমানের গৌরব রেখা অঙ্কিত করিবার বাসনায়, "কোহিনূরে'র আবির্ভাব।"[৫২]

সহচর পত্রিকা এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'সহচর এর নিবেদন' শিরোনামে বলেছিলঃ "সমাজের বর্ত্তমান সাহিত্যিক-সাধনার একমাত্র অবলম্বন— 'সহচর'। সহচরের ভিতর দিয়া আমরা জাতির আত্মাকে নানা ভাবে জীবনের সুমহান পথে আহবান করিতে চেষ্টা করিব"। [৫৩]

শুরুতে 'আমাদের কথা' শিরোনামে *মোসলেম ভারত* পত্রিকা লিখেছিল ঃ ....'আমাদের এই উত্থানপ্রয়াসী পতিত সমাজের কর্ণে এই সময়ে মোস্‌লেমের গৌরব-কাহিনী, মোস্‌লেমের প্রজ্ঞা, প্রভাব, পূণ্যকথা প্রভৃতির সুর লহরী ঢালিয়া দিতে পারিলে, এক কথায় মুসলমানের অতীতের সম্বল, বর্ত্তমানের সঙ্কট এবং ভবিষ্যতের আশা-আকঙ্খার সমুজ্জ্বল ছবি তাহাদের নয়ন-সমক্ষে ধরিতে পারিলে, অথবা দুটা উৎসাহের কথা বলিলেও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে। সেই আশায় আশ্বস্ত হইয়াই— সেই শুভ উদ্দেশ্যের কামনা করিয়াই আজ আমরা আমাদের বড় সাধের 'মোসলেম ভারত'কে আমাদের সাহিত্যিক সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি।"[৫৪]

শিখা পত্রিকা 'প্রকাশকের নিবেদন' এ বলেছিল ঃ "'শিখার' প্রধান উদ্দেশ্য বর্ত্তমান মুসলমান সমাজের জীবন ও চিন্তাধারার গতির পরিবর্ত্তন সাধন"।[৫৫]

কোন কোন পত্রিকা আবার সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে লক্ষ করে প্রকাশ করা হয়েছিল। যেমন ঃ সাম্যবাদী।

Dhaka University Institutional Repository

"সাম্যবাদী" কি চায় ? —- এর উত্তরে পত্রিকাটি মুসলিম সমাজের উদ্দেশ্যে লিখেছিল ঃ "আমাদের উদ্দেশ্য— দুনিয়ায়, অন্ততঃ মুসলমান সমাজে, ইসলামের প্রচারিত ভ্রাতৃত্বের পুনঃ সংস্থাপন। আমাদের লক্ষ্য— সকল প্রকার সামাজিক ভেদের বিলোপ সাধন এবং পূর্ণ সাম্যের প্রতিষ্ঠা "। [৫৬]

জাগরণ এর মুখবন্ধে লেখা হয়েছিল ঃ "আমরা আজ শিক্ষা, জ্ঞান ও জগতের বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্রে একেবারে সবার নীচে পড়ে আছি।

আমাদের রোগের কারণ নির্ণয় করে প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করা আবশ্যক হয়েছে। আর বিলম্ব করার সময় নাই। এখন চতুর্দ্দিক হতে আমাদের সমাজ মস্তিষ্ক পরিচালিত করে বিভিন্ন মতের ভিতর দিয়ে প্রকৃত সত্য উদ্ধার করতে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক হয়েছে। "জাগরণ" সেই সত্য নির্ণয়ের জন্য যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করতে পারে কিনা তার জন্য চেষ্টা করতে চায়।" [৫৭]

একই ভাবে *নওরোজ* পত্রিকা কামনা করেছিলঃ "বিদ্রোহীর কঠোর আঘাতে নির্জ্জীব প্রাণীও সজীব হইয়া উঠে— নূতন জীবনের স্বাদ পাইয়া তখন তাহারা প্রাণের অন্ধ আবেগে কল্যাণের সন্ধানে সত্যের সন্ধানে দিকে দিকে জয়োল্লাসে ছুটিয়া যায়।

তাই আমাদেরও আজ নওরোজের এই নূতন অভিযান। আমাদের কামনা আমাদের সাধ— নওরোজ এই নব জ্ঞানের সাধনা ও মনুষ্যত্বের বেদনার বাহন হউক"।[৫৮]

কোন কোন পত্রিকা সমাজে ধর্মীয় শিক্ষা প্রচলনের উদ্দেশ্যেও লেখনী ধারণ করেছিল। *ইসলাম প্রচার* এ বিষয়ে মুসলিম সমাজের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিলঃ "ধর্ম্মপ্রাণ মোছলমান ভ্রাতাগণের জনাবে আমাদের নিবেদন, এই পত্রিকাখানি কোনরূপ লাভ কি ব্যবসা হিসাবে আমরা বাহির করি নাই। আমাদের উদ্দেশ্য কেবল মোছলমান সমাজে ইছলামি শিক্ষার বিস্তার।"[৫৯]

সমাজে কোরাণ হাদীসের শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে *শরিয়তে-এস্‌লাম* পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটির মতেঃ 'কোরাণ হাদীসের শিক্ষা যাহাতে সমাজের প্রতি স্তরে প্রচারিত হইয়া সকলকে অবনতির পথ হইতে ফিরাইয়া উন্নতি-পথের পথিক করিতে পারে, আল্লাহ ও রসুলের আদিষ্ট অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সমাজ যাহাতে সৎ জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়, তাহারই জন্য 'শরিয়তে-এস্‌লাম" সমাজের দ্বারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে"।[৬০]

রওশন হেদায়েত পত্রিকা 'সম্পাদকের নিবেদন' এ সমাজে সংবাদপত্রের আবশ্যকতা কতখানি সে বিষয়ে উল্লেখ করে তার প্রকাশের কারণ সম্পর্কে লিখেছিলঃ "যে কোন দোকান যে কোন জাতির দিকে দৃকপাত করুন দেখিতে পাইবেন, তাহারা কেবলমাত্র সংবাদপত্র দ্বারাই রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্ম্মনীতির

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তার লাভ করিয়াছে। কোরআন হাদিছের আদেশ নিষেধ ও আমাদের প্রাণের কথা, মনের ব্যথা জমিদার ও মহাজনগণের অমানুষিক অত্যাচার, অমোছলমানদের ধোকা, প্রবঞ্চনা ও ষড়যন্ত্রাদি সমাজে ও গবর্ণমেন্টকে জানাইবার জন্য একমাত্র সংবাদপত্রের বিশেষ আবশ্যক, তাই অতি উচ্চ আশা হৃদয়ে লইয়া কোরআন শরিফ ও হাদিছ শরিফ অনুযায়ী অত্র "রওশন হেদায়েৎ" দ্বারা আল্লাহর ওয়াস্তে সমাজের খেদমত করিব মানসে গত দুই বর্ষ সমাজের দ্বারে হাজের হইয়াছি।"[৬১]

মুসলিম সমাজের উদ্দেশ্যে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে *সওগাত* পত্রিকায় তাই বলা হয়েছিলঃ "আমরা চিন্তার পক্ষপাতী। মুসলমান সমাজ আজ কার্য্যে পঙ্গু ও অচল, কারণ সে চিন্তায় বৃদ্ধ ও স্থবির। আমরা মুসলিম সমাজকে স্বাধীন চিন্তার সম্মুখীন করিতে চাই।"[৬২]

মাসিক মোহাম্মদী মুসলিম সমাজের কাছে 'আত্ম-নিবেদন' করে উল্লেখ করেছিলঃ "বিভিন্ন ভাবধারার সমবায়ে এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে, মোছলেম বঙ্গের স্তরে স্তরে আজ এক অভিনব জীবন সাধনা জাগিয়া উঠিয়াছে।

সেই দীর্ঘকালের সুখ স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত দেখার উদ্দেশ্যে, জীবন-সায়াহ্নে মাসিক মোহাম্মদীর এই নূতন সাধনা। সকলে আশীর্ব্বাদ করুন— এ সাধনা সিদ্ধিলাভ করুক! এ স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হউক !" [৬৩]

আজাদ পত্রিকা 'আত্ম-নিবেদন' এ তার আদর্শ উদ্দেশ্য এবং লক্ষ তুলে ধরে বলেছিলঃ "বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, মোছলেম বঙ্গের জাতীয় জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইতেছে ক'একখানা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। এই শোচনীয় দৈন্যের অনুভূতি মোছলেম বঙ্গের জাতীয় অন্তরকে যাতনা দিয়া আসিতেছে বহুদিন হইতে। .... তিন কোটি মুসলমানের সত্যকার সেবক ও নিরপেক্ষ প্রতিনিধিরূপে দৈনিক আজাদ হাতে করিয়া সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইতে পারিলাম। তাই মোছলেম বঙ্গের জাতীয় জীবনের এই শুভ প্রভাতে সর্বপ্রথমে আল্লার হুজুরে অবনত মস্তকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। .... "দৈনিক আজাদ ' সত্যকার আজাদীর নির্বিঘ্ন ও নির্ভীক অগ্রদূত হিসাবে, বাঙ্গালী মুসলমানের ভিতর বাহিরের সব অশুভ বন্ধন পাশকে ছিন্ন করিয়া তাহাকে মুক্তির মঙ্গলকার্যে পরিচালিত করিতে সমর্থ হউক। .... আমাদের একমাত্র আদর্শ ইসলাম এবং একমাত্র নীতি কোরআনের শাশ্বত ও স্বর্গীয় বিধান। এই নীতি ও এই আদর্শের অনুসরণ করাই হইবে আজাদের সমস্ত জীবনের সর্ব প্রধান সাধনা। এই আদর্শেরই অণুপ্রেরণায় আমরা স্বদেশের মুক্তিকামী, তাহার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের একান্ত অভিলাষী। .... এখন চাই শুধু সমাজ অন্তরের অকৃত্রিম আশীর্ব্বাদ,— মোছলেম- বঙ্গের কর্ম্মশক্তির সত্যকার সহযোগ"।[৬৪]

Dhaka University Institutional Repository

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শুরুর দিকে বাঙলার মুসলমান সমাজে উৎসাহী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ লক্ষ করা গেলেও তাঁদের পরিচালিত পত্রিকাগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দীর্ঘ জীবন লাভ করতে পারেনি। কারণ পত্রিকা টিকে থাকবার জন্য প্রয়োজন প্রকাশকের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং পাঠকের ক্রয় ক্ষমতা বা ইচ্ছা। বেশীর ভাগ পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে এ-দুটি প্রয়োজনের অভাব মুসলমান সমাজে দেখা দিয়েছিল। আর এ অভাব পরবর্তী কুড়ি শতকের প্রথম দিকেও পরিলক্ষিত হয়।

এ প্রসঙ্গে *কোহিনূর* পত্রিকা লিখেছিলঃ "সমাজে কতবার কত মাসিক পত্রের আবির্ভাব হইল, কিন্তু কোন খানিই টিকিয়া থাকিল না,----- বুদ্বুদের ন্যায় তাহারা উঠিল, সহানুভূতি ও পোষণের অভাবে বুদ্বুদের ন্যায়ই মিলাইয়া গেল"।[৬৫]

বুলবুল পত্রিকার মন্তব্য করে যথার্থই বলা হয়েছিল ঃ "বাঙলা দেশে সাপ্তাহিক মাসিক সব রকম পত্রেরই পরমায়ু বৃক্ষপত্রেরই মত খুব জোর এক বৎসর। এদেশে সাহিত্য পত্রিকার মৃত্যুর হার বাঙ্গালী শিশুর চেয়েও অধিক।"[৬৬]

সমাজে দিন দিন সংবাপত্রের যে অবলুপ্তি ঘটছিল তার কারণ হিসাবে *হোলতান* উল্লেখ করেছিল ঃ "আমাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে গ্রাহকগণের উদাসীনতা ও সংবাদপত্রের প্রতি জনসাধরণের অনুরাগের অভাবহেতু বঙ্গীয় মোছলেম সমাজে সংবাদপত্রের উন্নতি ও প্রসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইতেছে না।"[৬৭]

গ্রাহক সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় পত্রিকা প্রকাশ করা কিরূপ কষ্টসাধ্য সে কথা বলে *শরিয়তে-এস্‌লাম* লিখেছিলঃ "বৎসরে মাত্র একটি টাকার পরিবর্তে "শরিয়তে-এস্‌লামের" ন্যায় পত্রিকা পরিচালন করা যে কত কষ্টসাধ্য তাহা ভুক্তভোগী ও জ্ঞানী মাত্রেরই অবিদিত নহে। "শরিয়তে-এস্‌লাম" পরিচালিত হইবার পর হইতে প্রতি বৎসর কিছু না কিছু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে; ইহার একমাত্র কারণ— গ্রাহক সংখ্যা যথেষ্ট বর্দ্ধিত না হওয়া।"[৬৮]

সংবাদপত্র পাঠে শিক্ষিত যুব সমাজের অনীহা লক্ষ করে *মোয়াজ্জিন* পত্রিকায় দুঃখ করে বলা হয়েছিলঃ "আমাদের জাতীয় সংবাদপত্রগুলি বেশীদিন না চলার একমাত্র কারণ, আমাদের শিক্ষিত যুবক সমাজ সংবাদপত্র পড়ার দিকে নেক নজর দেন না। সংবাদপত্রই যে জাতীয় জীবন ও চরিত্র গঠনের প্রকৃষ্ট উপাদান এই ধ্রুব সত্যটুকু বোধ হয় আজও আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। যখন মাত্র খান কয়েক বাঙলা মাসিক পত্রিকা বাঁচিয়ে রাখতে সমগ্র বাঙলার শিক্ষিত মুসলমান সমাজ অক্ষম, তখন এই সম্বন্ধে অন্য টিকা টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।"[৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

সাম্যবাদী'র ভাষায়ঃ "লাভের আশায় আমরা "সাম্যবাদী" প্রচারে ব্রতী হই নাই। যাঁহারা কোন সাময়িকপত্রের সংশ্রবে আছেন কিংবা একখানা কাগজ বাহির করিতে গেলে কত ব্যয় পড়ে তাহা অবগত আছেন তাঁহারা জানেন যে, "সাম্যবাদী"র প্রচার করিয়া লাভের আশা করা কতকটা বাতুলতা মাত্র। খোদা আমাদিগকে যতটুকু শক্তি দিয়াছেন, তাহার দ্বারা সমাজের হিত সাধন করিবার মানসেই আমাদের এই চেষ্টা।

সত্য সত্যই যে উদ্দেশ্য লইয়া আমরা কার্য্যে অবতীর্ণ হইতেছি, তাহা সকলের নিকট নিবেদন করিয়া রাখিতেছি। দয়া করিয়া কেহ আমাদিগকে ভুল বুঝিবেন না। আমরা দীনাতিদীন খাদেম— সমাজের তুচ্ছ সেবক মাত্র।"[৭০]

এ আর্থিক সংকটের মুখে পত্রিকা টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁদের প্রাণান্ত চেষ্টার কথা *সাম্যবাদী* থেকে জানা যায়। *সাম্যবাদী* উল্লেখ করেছিল ঃ "বাঙ্গালী মোসলমান সমাজে এ যাবত যে কয়খানা সাময়িক পত্রিকা বাহির হইয়াছিল, গ্রাহক অভাবের জন্য, অর্থানটনের জন্য, তাহা একে একে সকলই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে .... সাম্যবাদীকে আমরা বুকের এক এক ফোঁটা রক্ত খরচ করিয়াও বাঁচাইয়া রাখিয়াছি।" [৭১]

এই আর্থিক দুর্গতি নিরসনে এগিয়ে আসার জন্য সমাজের সমর্থ ব্যক্তিবর্গের কাছে *সাম্যবাদী* আবেদন জানিয়ে লিখেছিল ঃ "কিন্তু সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি আশানুরূপ পরিমানে না পাইলে, আমাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবে না। এই জন্য আমরা প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তিকে আমাদের "সাম্যবাদী"র গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশাকরি, যাঁহারা গ্রামের সরদার, মন্ডল বা প্রধান ব্যক্তিরূপে সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়া আছেন তাঁহারা সকলেই ইসলামের নামে, মনুষ্যত্বের নামে "সাম্যবাদী"র বহুল প্রচারে যত্নবান হইবেন। আমরা দীনদরিদ্র; অর্থ সম্বল আমাদের নাই। সকলের সমবেত চেষ্টা আমাদের পশ্চাতে না থাকিলে আমরা দাঁড়াইতে পারিব না।

আমাদের নিজেদের শ্রেণীগত হীনতা দেখিয়াই তাহা দূরীকরণে আমরা বদ্ধপরিকর হইয়াছি। আশাকরি, দয়া করিয়া সকলেই আমাদের সাহয্যার্থ দন্ডায়মান হইবেন।"[৭২]

পত্রিকার পরিচালকগণ আর্থিকসহ বিভিন্ন অসুবিধা ও বাধার সম্মুখীন হওয়া সত্বেও আপ্রাণ চেষ্টা বজায় রেখেছিলেন যাতে পত্রিকা পরিচালনার কার্য্য বন্ধ হয়ে না যায়। এ সম্পর্কে *মোসলেম ভারত* লিখেছিলঃ "এই পত্রিকা পরিচালন ব্যাপারে অনুষ্ঠানিক ব্যয়, কাগজের দুর্ম্মূল্যতা, মুদ্রণাদির ব্যয়বৃদ্ধি, দৈব-দুর্ব্বিপাক, রাজ-নিগ্রহ প্রভৃতি নানা কারণে আমরা বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ি এবং তাহাতে আমাদের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিলেও আমরা আমাদের কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচলিত হই নাই।"[৭৩]

Dhaka University Institutional Repository

সত্যাগ্রহী এর ভাষায় ঃ "যাহারা খবরের কাগজ বাহির করিয়া ব্যবসায় বা অর্থোপার্জ্জন করিতে ইচ্ছুক নহেন বা কোনরূপ সম্মানের প্রত্যাশী নহেন তাঁহারা নিজ শরীরের শেষ শোণিত বিন্দু দিয়াও নিজ প্রাণের কথাগুলি সমাজের ঘরে ঘরে স্থায়ীভাবে প্রচার করিতে ইচ্ছুক তাই তাঁহারা লাভ লোকছানের দিকে না দেখিয়া বহুব্যয় সাপেক্ষ মাসিক আকারে সাপ্তাহিক প্রকাশের চেষ্টা করিয়া থাকেন, সত্যাগ্রহীর সেই দশা।"[৭৪]

তাঁদের পত্র-পত্রিকাগুলিতে সংবাদপত্র পাঠ করে বাঙলার মুসলমানদের যাবতীয় ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হয়ে তা দূরীকরণের জন্য আহবান জানানো হয়েছিল।

সংবাদপত্রের আবশ্যকতা সম্পর্কে *সুধাকর* পত্রিকা লিখেছিলঃ

১। সংবাদপত্র— প্রকৃত গুনসম্পন্ন লোকদিগের গুণানুবাদ ও প্রশংসা করে।

২। যে সকল অনিষ্টকারক লোকদিগের অনিষ্টকারিতা সংক্রামক, সেই সকল ব্যক্তিকে তাহা হইতে নিরস্ত রাখিবার জন্য সংবাদপত্র জন-সাধারণের নিকট তাহাদের সেই অনিষ্টকারিতা প্রকাশ করিয়া দেয়।

৩। সংবাদপত্র- মানবগণের উপকারের জন্য সুনীতিকে উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারায় প্রকাশ করে;

৪। সংবাদপত্র— বিদ্যা শিক্ষার উপকারিতা সাধারণের নিকট এরূপভাবে বর্ণনা করে যে, তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, প্রত্যেক জাতির উন্নতি প্রকৃত বিদ্যা দ্বারায় সংসাধিত হয়;

৫। সংবাদপত্র— সভ্য জগতে শিল্পের আবশ্যকতার বিষয় বর্ণনা করে- এবং শিল্পের উন্নতি ব্যতীত সৌভাগ্য ও উন্নতি হইতে পারে না, ইহারও প্রমাণ প্রদর্শন করে ;

৬। যে সকল বিদ্যা শিক্ষা করিলে মনুষ্য 'মনুষ্য' নামে অভিহিত হইতে পারে, যথাঃ— ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, শিক্ষা-প্রণালী ইত্যাদি। সংবাদপত্র এই সকল বিষয়ের আলোচনা বিশেষ রূপে করিয়া থাকে।

৭। সংবাদপত্র— "মনুষ্য" এই শব্দটীর প্রকৃত অর্থ ও মনুষ্যতার গুণ বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া বড় বড় লোকদিগকে মনুষ্যতার কার্য্য সম্পাদন করিতে আহবান করে অর্থাৎ তাহাদিগকে সাধারণ বিদ্যালয়, শিল্পবিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, প্রভৃতি দেশ হিতকর কার্য্য করিতে অনুরোধ করে।

৮। সংবাদপত্র— উৎসাহ শূণ্য লোকদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণের গুণ কীর্ত্তনে তাহাদের উৎসাহাদি পুনঃজাগরিত করিতে চেষ্টা করে।

৯। সংবাদপত্র পাঠে কতকগুলি উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথাঃ— রাজনীতিজ্ঞেরা উহাতে বিশেষরূপ উন্নতি লাভ করে। ব্যবসায়ী লোকেরা ব্যবসার উন্নতি বিষয়ক অনেক উপায় প্রাপ্ত হয়। বিদ্বান ব্যক্তিরা বিদ্যার উপকারিতা লাভ করিতে পারে।

১০। যে জাতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িতেছে, সংবাদপত্র সেই জাতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি মিলিত করিয়া তাহাতে এক নূতন জীবন দান করে।

Dhaka University Institutional Repository

১১। সংবাদপত্র পাঠে পাঠকগণ গৃহে বসিয়া সমুদয় পৃথিবী ভ্রমণের ফল প্রাপ্ত হন।

১২। সংবাদপত্র রোগীদিগকে চিকিৎসকের দিকে, অজ্ঞকে বিজ্ঞের দিকে, এবং দরিদ্রকে ঐশ্বর্য্যের দিকে পথ প্রদর্শন করে।

১৩। সংবাদপত্র শত্রু-মিত্র প্রভেদ করিয়া দেয়।"[৭৫]

এ সম্পর্কে *মোয়াজ্জিন* জানিয়েছিলঃ "পত্রিকা পাঠ করিলে ক্রমশঃ সমাজ হইতে অন্যায়, অসত্য ও কুসংস্কারের প্রভাব দূর হইয়া সত্যভ্রষ্ট জন-সাধারণ সত্যপ্রিয় ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া উঠিবে। ইহাই পুস্তক ও পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা। যে সমাজে যত অধিক পত্রিকা ও খবরের কাগজ আছে সেই সমাজই এই জন্য তত অধিক উন্নত।"[৭৬]

কিন্তু "…. আমাদের দেশে যাঁরা লেখাপড়া শিখিয়াছেন, এমন কি উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছেন, তাঁরাও সংবাদপত্র বা সাহিত্য পত্রিকা পড়েন না। যাঁরা অনুগ্রহ করিয়া পড়েন, তাঁরা কিনিয়া পড়েন না- এর ওর নিকট হইতে ধার করিয়াই কাজ চালাইয়া নেন"----- বলে *বুলবুল* পত্রিকা দুঃখ প্রকাশ করেছিল। [৭৭]

লাভ-ক্ষতির হিসাব না করে সামান্য অর্থের বিনিময়ে সংবাদপত্র ক্রয় করলে তা কিরূপ উপকার সাধন করবে সে কথা উল্লেখ করে *শরিয়তে-এস্‌লাম* লিখেছিলঃ "বৎসরে মাত্র একটি টাকার পরিবর্ত্তে "শরিয়তে-এস্‌লাম" আপনাকে যে অতুল সম্পদ আনিয়া দিবে, তাহা মোসলমানের পক্ষে বাস্তবিকই অভাবনীয় এবং একান্ত কাম্য।"[৭৮]

সুতরাং "যাহারা উন্নতি ও সৌভাগ্যের আশা করে, তাহাদের ইহা জানা আবশ্যক যে, সংবাদপত্র ব্যতীত কখনই তাহারা তাহাদের অভিলষিত ক্ষেত্রে উপনীত হইতে পারিবে না"----- বলে *সুধাকর* পত্রিকা মন্তব্য করেছিল"।[৭৯]

কোন অনুন্নত জাতি যদি উন্নতি করতে চায় তাহলে রাজনৈতিক বিষয়ে তার জ্ঞান থাকা অতীব প্রয়োজন। আর রাজনৈতিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের অন্যতম উপায় সংবাদপত্র পাঠকরণ।

এ সম্পর্কে *ছোলতান* জোরালো ভাষায় তাই বলেছিলঃ "কোন অনুন্নত, অবজ্ঞাত ও অবহেলিত জাতি যদি উন্নতি ও শক্তিশালী হইয়া দুনিয়ার উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ও শ্রদ্ধাভাজন হইতে ইচ্ছা করে, তবে সে জাতির, "আওরত-মরদ" অভেদে রাজনীতিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা লাভ ব্যতীত, উন্নতি, মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। রাজনীতিতে পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে সংবাদপত্রকে আশ্রয় ও হৃদয়ের জিনিষ করিয়া লইতে হইবে। তাই আমরা জাতীয় সংবাদপত্র পাঠের একান্ত পক্ষপাতি।"[৮০]

Dhaka University Institutional Repository

'সাংবাদিক আবু জাফর শামসুদ্দীন তাঁর আত্ম-স্মৃতিতে বলেছিলেনঃ "পত্রিকা চালাতে অর্থ অবশ্যই আবশ্যক। কিন্তু সেকালে একটি দৈনিক পত্রিকা চালাবার জন্যে আরো দু'টি বস্তু আবশ্যক ছিল। সে দু'টি বস্তুর নাম দেশপ্রেম এবং সমাজপ্রেম"।[৮১]

এই দুই গুনেই পত্র-পত্রিকার প্রকাশকগণ সমৃদ্ধ ছিলেন। তাই সমাজ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এই সমস্ত ব্যক্তিগণ সংবাদপত্রের মাধ্যমে স্বসমাজের যাবতীয় ত্রুটিসমূহ দূরীকরণে লেখনী ধারণ করেছিলেন। আর, সম্মোহিত, পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের জাগরণ আনয়নই ছিল পত্র-পত্রিকাগুলির সম্পাদকীয় লক্ষ"।[৮২]

আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে শুরু করে উনিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত কতিপয় ইংরেজ ও খ্রিষ্টান মিশনারী এবং পরবর্তীকালে বাঙালি হিন্দুদের দ্বারা প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহের মধ্যদিয়ে এদেশে জনমত প্রকাশ করার যে সুযোগের সূচনা হয়েছিল, তার সূত্র ধরেই উনিশ শতকের শেষদিকে কিছু সংখ্যক সমাজ সচেতন মুসলমান সংবাদপত্র প্রকাশের মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের জনমত প্রকাশ ও গঠনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

প্রথমদিকে এই সকল পত্র-পত্রিকায় ধর্ম বিষয়ক, হেকিমী-চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা বিজ্ঞাপন, গল্প মূলতঃ প্রকাশ করলেও, সংবাদপত্র পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও লেখকদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছিল। সংবাদপত্রকে সাংবাদিক ও লেখকগণ সমাজসেবার মাধ্যম হিসেবে মনে করতেন। তাঁদের প্রথম প্রয়াস ছিল কিছুটা বিক্ষিপ্ত; যা পরবর্তীকালে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় রূপলাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. Smarajit Chakraborti, *The Bengali Press*, (Calcutta : 1976), P.vii

২. A.F. Salahuddin Ahmed, *Social Ideas and Social Change in Bengal, 1818-1835*, (Leiden : 1965), P.52

৩. Bengal Gazette, May 20, 1780, and the subsequent issues, quoted by-Mrinal Kanti Chanda *History of the English Press in Bengal, 1780-1857*, (Calcutta : K.P. Bagchi and Company, 1987), P.1.

৪. বিস্তারিত জানার জন্য শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িকপত্র ১৮১৮-১৮৬৮*, (কলিকাতা ঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, (নূতন সংস্করণ), ১৩৫৪।

৫. শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক সাহিত্য ১৮১৮-১৮৬৭*, (কলিকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫১), পৃঃ ১৮,৩৬।

৬. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, 'সাময়িকপত্র সাধনার প্রথম পর্ব ঃ সমাচার সভারাজেন্দ্র', *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, (ঢাকা ঃ রাজশাহী ঃ যশোহর ঃ রংপুর ঃ পাকিস্তান বুক করপোরেশন্, ১৯৬৮), পৃঃ ৬-৯।

৭. *ঐ*, 'জগদুদ্দীপক' ভাস্কর', *ঐ*, পৃঃ ১৪-১৮।

৮. *আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, ১৮৩১-১৯৩০ (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯), পৃ. ৪।

৯. ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, *মনীষা-মঞ্জুষা (প্রবন্ধ-সংকলন) ১ম খন্ড*, (ঢাকা ঃ স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৫), পৃঃ ২১৭।

১০. বিস্তারিত জানার জন্য আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র ১৮৩১-১৯৩০*, (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯), পৃঃ ৪-৬২।

১১. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১, আরও দ্রষ্টব্য, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ, *মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন*, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃঃ ৬-৭।

১২. 'সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পরিচয়', বার্ষিক সওগাত, অগ্রহায়ণ/১৩৩৩/পৃঃ ১৬৫। এবং মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, *মুসলিম বাংলার মনীষা*, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, (তৃতীয় সংস্করণ), ১৯৮৭, পৃঃ ৬৬-৭৪। *এবং বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, 'মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ'- মোহাম্মদ ইদরিস আলী। ১ম বর্ষ/৩য় সংখ্যা/পৌষ-চৈত্র/১৩৬৪/পৃঃ ৮১-১১২।

১৩. *বার্ষিক সওগাত, ঐ*, পৃঃ ১৬৫-১৬৬। এবং সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম সম্পাদিত - *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭)। পৃঃ ৩৭৬।

400579

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

১৪.বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, ঐ। পৃঃ ৪২।

১৫.বিস্তারিত জানার জন্য, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পরিচয়, *বার্ষিক সওগাত*, অগ্রহায়ণ/১৩৩৩/পৃঃ ১৬৭-১৬৮। এবং সৈয়দ ওয়াহিদ কাইসার নাদভী, 'বাংলা সাংবাদিকতার জনক', আবু জাফর(সম্পাদিত) *মওলানা আকরম খাঁ*, (ঢাকা, ১৯৮৬), পৃঃ ২২২। উদ্ধৃতঃ এ,টি,এম, আতিকুর রহমান, *বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ১৯০৫-১৯৪৭*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫)। আরও ঃ মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, *স্মরণীয় সাংবাদিক*, (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৫), পৃঃ ১০। ও আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান), ১৯৭৫, পৃঃ ৬৩।

১৬.বিস্তারিত জানার জন্য ঃ ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা ১৯০৫-১৯৪৭*, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ১৯৯৫।) এবং *বার্ষিক সওগাত* প্রাগুক্ত। পৃঃ ১৬৯-১৭০।

১৭. *বার্ষিক সওগাত* প্রাগুক্ত। পৃঃ ১৭০।

১৮.'যোগ্য পিতা ও দুই পুত্র-রত্ন' *সাপ্তাহিক আরাফাত*, ৯ম বর্ষ/৩৮শ সংখ্যা/জ্যৈষ্ঠ/১৩৭৩/পৃঃ ২-৩।

১৯.বিস্তারিত জানার জন্য, ফজলুল হক, *মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী ১৮৫৮-১৯২০* (জীবনী গ্রন্থমালা), (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯)।

২০.বিস্তারিত জানার জন্য, আজহার ইসলাম, *মোজাম্মেল হক (শান্তিপুর) ১৮৬০-১৯৩৩*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)।

২১. *বার্ষিক সওগাত*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৪। এবং *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০-৩১।

২২.বিস্তারিত জানার জন্য, ওয়াকিল আহমদ, *মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী ১৮৭৪-১৯৩৩*, (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯)।

২৩.বিস্তারিত জানার জন্য, দেলওয়ার হাসান, *সৈয়দ এমদাদ আলী ১৮৭৬-১৯৫৬*, (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭)।

২৪.বিস্তারিত জানার জন্য, বদিউজ্জামান, *ইসমাইল হোসেন শিরাজী ১৮৭৯-১৯৩১*, (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)।

২৫.ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৮-৩৫৯।

২৬.ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৪-৩০৯।

২৭.বিস্তারিত, মনসুর মুসা, *মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৮৮৫-১৯৬৯*, (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)।

Dhaka University Institutional Repository

২৮.মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, (ঢাকাঃ সওগাত প্রেস, ১৯৮৫।) এবং সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২১-৩২২।

২৯.বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮২।

৩০.বিস্তারিত জানার জন্য, আবদুল মান্নান সৈয়দ; *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ১৮৯৬-১৯৫৪*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪)।

৩১.বিস্তারিত জানার জন্য, মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, *আবুল হুসেন ১৮৯৭-১৯৩৮*, জীবনী গ্রন্থমালা-১৩ (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮) এবং রশীদ আল ফারুকী, *ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃঃ ১-৯।

৩২.বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *সওগাত-যুগে নজরুল ইসলাম*, (ঢাকাঃ নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৮৮)। আরওঃ *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান* প্রাগুক্ত। পৃঃ ১১৩-১১৫।

৩৩.বিস্তারিত, ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০২-২০৭। এবং *বার্ষিক সওগাত* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৮।

৩৪.বিস্তারিত জানার জন্যঃ রফিকুল ইসলাম, *আবদুল কাদির ১৯০৬-১৯৮৪*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭) এবং *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২।

৩৫.বিস্তারিত জানার জন্য, নন্দলাল শর্মা, *মুহম্মদ নূরুল হক ১৯০৭-১৯৮৭*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)।

৩৬.বিস্তারিত জানার জন্য, আবুল হাশিম, *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, অনুবাদঃ শাহাবুদ্দীন মহম্মদ আলী, (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৭) (প্রথম প্রকাশ)। এবং বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬০।

৩৭.মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*,পৃঃ১। আরও দ্রষ্টব্য ঃ মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ, *মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন*, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃঃ ৬-৭। এবং মুস্তফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত ১৯০১-১৯৩০*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃঃ ১৩।

৩৮.মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'সাংবাদিকতায় বাঙ্গালী মুছলমান', *ঈদ-সংখ্যা মোহাম্মদী*, পৌষ/১৩৪২/পৃঃ ৬।

৩৯.মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, *প্রাগুক্ত* পৃঃ ১১-১২।

৪০.সম্পাদকের খাছ মহল ঃ 'আলেম সমাজ ও তিব্বিয়া শিক্ষা', *আল্-ইসলাহ্*, ১ম বর্ষ/ ৫ম সংখ্যা/ চৈত্র/ ১৩৩৯/ পৃঃ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪১.মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৮।

৪২.১৯৯২ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী সওগাত প্রেসঃ ঢাকায় আমি তাঁর উল্লিখিত সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছিলাম।

৪৩.মোহাম্মদ মোদাব্বের, *সাংবাদিকের রোজনামচা*, (ঢাকাঃ বর্ণমিছিল, ১৯৭৭), পৃঃ ২৯২-২৯৩।

৪৪.A.H.K. 'নববর্ষে প্রেমাঞ্জলী', *আহমদী*, ২য় বর্ষ/ ১ম সংখ্যা/ বৈশাখ /১৩৩৩/ পৃঃ ১।

৪৫.*প্রাগুক্ত*, পৃ ঃ ১৫।

৪৬.মুজাফ্‌ফর আহমদ, *কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা*, (ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৭৩), পৃঃ ৭৯।

৪৭.আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি (১ম খন্ড)*, (ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৯), পৃঃ ১২৭।

৪৮.নিবেদন; *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকা*, ১ম বর্ষ/ ১ম সংখ্যা/বৈশাখ/১৩২৫/ পৃঃ ১।

৪৯. *তবলীগ*, ১ম বর্ষ/ ১ম সংখ্যা/জ্যৈষ্ঠ/১৩৩৪/ পৃঃ ২।

৫০.*মোসলেম-সুহৃদ*, ৩য় বর্ষ/ ৫ম সংখ্যা/৯ই শ্রাবণ/১৩১৫/ পৃঃ উল্লেখ নাই।

৫১. 'আমাদের কথা', *হেদায়াত*, ১ম বর্ষ/১ম সংখ্যা/মাঘ/১৩৪২/ পৃঃ ১৮।

৫২.'জাতীয় আহবান' *কোহিনূর*, ১ম বর্ষ/ ৫ম সংখ্যা/আশ্বিন/১৩১৮/ পৃঃ ১৮৫।

৫৩.'সহচর' এর নিবেদন, *সহচর*, ১ম বর্ষ/ ৬ষ্ঠ সংখ্যা/আষাঢ়/১৩২৯/ পৃঃ ৪৯২।

৫৪.'আমাদের কথা' *মোসলেম ভারত*, ১ম বর্ষ/ ১ম খন্ড/প্রথম সংখ্যা/বৈশাখ/১৩২৭/ পৃঃ ৩।

৫৫.প্রকাশকের নিবেদন, *শিখা*, প্রথম বর্ষ/ প্রথম সংস্করণ/চৈত্র/১৩৩৩/পৃঃ উল্লেখ নাই।

৫৬."সাম্যবাদী" কি চায়?, *সাম্যবাদী*, ১ম বর্ষ/ ১ম সংখ্যা/মাঘ/১৩২৯/ পৃঃ ২-৩।

৫৭.'মুখবন্ধ', *জাগরণ*, ১ম বর্ষ/ ১ম সংখ্যা/বৈশাখ/১৩৩৫/ পৃঃ ২।

৫৮.'আমাদের কথা' *নওরোজ*, ১ম বর্ষ/ ১ম সংখ্যা/দ্বিতীয় সংস্করণ/আষাঢ়/১৩৩৪/ পৃঃ ২।

৫৯.নিবেদন, *ইসলাম প্রচার*, ১ম বর্ষ/ ৮ম সংখ্যা/মাঘ/১৩৪১/ পৃঃ উল্লেখ নাই।

৬০.আত্ম-নিবেদন, *শরিয়তে-এসলাম*, ৩য় বর্ষ/ ৯ম সংখ্যা/আশ্বিন/১৩৩৫/ পৃঃ ২১৫

৬১.খাদেমল এছলাম- মোহাম্মদ এব্রাহিম, 'সম্পাদকের নিবেদন', *রওশন হেদায়েৎ* ২য় বর্ষ/ ১২শ সংখ্যা/ আশ্বিন/১৩৩৩/ পৃঃ ২৩৯-২৪০।

৬২.সম্পাদকের দফ্‌তর, *সওগাত*, ৬ষ্ঠ বর্ষ/ ১২শ সংখ্যা/আষাঢ়/১৩৩৬/ পৃঃ ৮৮৮।

৬৩.আত্ম-নিবেদনঃ *মাসিক মোহাম্মদী*, ১ম বর্ষ/ ১ম সংখ্যা/কার্ত্তিক/১৩৩৪/ পৃঃ ২-৩।

৬৪.আজাদের আত্ম-নিবেদন; *আজাদ*, ১ম বর্ষ/ ১ম সংখ্যা/৩১শে অক্টোবর/১৯৩৬/ পৃঃ ৬।

৬৫.'জাতীয় আহবান', *কোহিনূর*, ১ম বর্ষ/ ৬ষ্ঠ সংখ্যা/আশ্বিন/১৩১৮/ পৃঃ ১৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

৬৬.নজরুল ইসলাম, "বর্ষারম্ভে", *বুলবুল*, ৪র্থ বর্ষ/ ১ম সংখ্যা/বৈশাখ/১৩৪৪/ পৃঃ ১।

৬৭.আলোচনা ঃ 'জাতীয় সংবাদপত্র', *হোলতান*, ৮ম বর্ষ/৪৭শ সংখ্যা/চৈত্র/১৩৩০/পৃঃ৬।

৬৮.'আত্ম-নিবেদন', *শরিয়তে এসলাম*, ৩য় বর্ষ/ ৯ম সংখ্যা/আশ্বিন/১৩৩৫/ পৃঃ ২১৫।

৬৯.চিঠিপত্র ঃ The Mosque, Woking, Surrey, England, আশরাফ উদ্দীন আহমদ বি,এ, *মোয়াজ্জিন*, ৪র্থ বর্ষ/ ১ম সংখ্যা/অগ্রহায়ণ/১৩৩৯/ পৃঃ ৪৭।

৭০.'পরিচালকগণের নিবেদন', *সাম্যবাদী*, ১ম বর্ষ/ ১ম সংখ্যা/মাঘ/১৩২৯/ পৃঃ ৫।

৭১.বিবিধ প্রসঙ্গ ঃ 'মাসিক সাম্যবাদী, *ঐ*, ৩য় বর্ষ/ ৪র্থ সংখ্যা/আষাঢ়/১৩৩২/ পৃঃ ১২১।

৭২.পরিচালকগণের নিবেদন; *সাম্যবাদী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪।

৭৩.*মোসলেম ভারত*, ২য় বর্ষ/২য় খন্ড/ ১ম সংখ্যা/ভাদ্র/১৩২৮/ পৃঃ ৭২।

৭৪.*সত্যাগ্রহী*, ২য় বর্ষ/ ১ম সংখ্যা/১৩৪৪ হিজরী/ পৃঃ ১২।

৭৫.'সুধাকর, সংবাদপত্রের আবশ্যকতা', *সুধাকর* ১ম বর্ষ/ ১ম সংখ্যা/কার্ত্তিক/১২৯৬/ পৃঃ ৪-৫।

৭৬.মৌলানা শাহ্সুফী হাজী মোঃ আবুবকর্ সিদ্দিকী, "শুভাশীষ", *মোয়াজ্জিন*, ১ম বর্ষ/ ৪র্থ সংখ্যা/ মাঘ/১৩৩৫/ পৃঃ ১৬০।

৭৭.কলম্রোতা ঃ 'সংবাদ পত্রের প্রচার', *বুলবুল*, ৩য় বর্ষ/ ১০ম সংখ্যা/মাঘ/১৩৪৩/ পৃঃ ৭৯৬।

৭৮.'আত্ম-নিবেদন', *শরিয়তে-এসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৬।

৭৯.'সুধাকরঃ সংবাদপত্রের আবশ্যকতা', *সুধাকর*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।

৮০.দশের কথাঃ 'সংবাদপত্র ও জাতীয় উন্নতি', *হোলতান*, ৮ম বর্ষ/৩৯শ সংখ্যা/৩রা ফাল্গুন/১৩৩০/ পৃঃ ১১।

৮১.আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি* (১ম খন্ড), প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৬।

৮২.মুস্তাফা নূরউল ইসলাম; *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলমান সাংবাদিকদের সমাজ ও রাষ্ট্র চিন্তা

মুসলমান সাংবাদিক এবং লেখকগণ স্বসমাজের শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি, ধর্ম এবং রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের অধঃপতনের কারণ নির্ণয় করে তা থেকে উদ্ধারের উপায় সম্পর্কে পথ নির্দেশ করে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। নিম্নে তাঁদের সমাজ এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে সাময়িকপত্রগুলিতে যে সকল অভিমত প্রকাশিত হয়েছিল তা উল্লেখ করা হলো।

নির্লিপ্ত ও উদাসীন মুসলিম সমাজকে উদ্দেশ্য করে *মোয়াজ্জিন* পত্রিকাটির এক সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিলঃ "এ সমাজের (মুসলমান) জীবন প্রবাহে কোন প্রশ্ন নাই, জিজ্ঞাসা নাই। এদেশে যদি মস্তিষ্কহীন (Brainless) বলিয়া কোন জাতি থাকিয়া থাকে তবে সে জাতি এই মুসলমান।" [১] মুসলমানদের পদদলিত হবার কারণ উল্লেখ করে পত্রিকাটির আরেক সম্পাদকীয়তে আরও বলা হয়েছিলঃ "আজ জগতের এই মহা জাগরণের দিনে সকল জাতিরই পশ্চাদে পড়িয়া রহিয়াছে বাঙ্গালী মুসলমান। এই আড়ষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন সম্মোহিত জাতির প্রাণে প্রেরণা নাই, আত্মায় অনুভূতি নাই, হৃদয়ে ক্ষুধা নাই, মস্তিষ্কে চিন্তা নাই, জীবন প্রবাহে প্রশ্ন নাই, জিজ্ঞাসা নাই। নূতন সৃষ্টি, নবীন আশা, উদার চিন্তা, উন্নত রুচি, মুক্ত বুদ্ধি ও জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ আজ মুসলমানের জন্য যেন হারাম হইয়া গিয়াছে। দেশ প্রেম ও মানব প্রেমত ইহারা স্বপ্নেও দেখে না! দেশের সেবা-ক্ষেত্রে ইহাদের স্থান নাই, দেশের সেবার ইতিহাসে ইহাদের নাম গন্ধও নাই। কোন জ্ঞানালোচনায়, কোন নূতন সৃষ্টির গবেষণায় বা কোন সারবান রহস্যোদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হইতে এ জাতিকে দেখা যাইতেছে না। আজ সমগ্র জাতিটি যেন কান্ডজ্ঞানহীন ঘৃণিত কাটমোল্লার জাতিতে পরিণত হইয়াছে। তাই সর্ব্বত্রই ইহারা ঘৃণ্য ও পদদলিত হইতেছে।"[২]

শিখা গোষ্ঠীর কোন কোন সদস্য পশ্চাৎপদ এবং রাজনৈতিক দিক থেকে উদাসীন মুসলমান সম্প্রদায়কে 'সম্মোহিত মুসলমান' বলে উল্লেখ করতেন। *শিখা*য় লেখা হয়েছিলঃ "আজ আমাদের বুদ্ধি নিঃসাড় হয়ে পড়েছে— আমরা স্থূল বিশ্বাসে জড়িয়ে গিয়ে বুদ্ধির ঘরে তালা দিয়ে রেখেছি, কয়েকটি ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা দুনিয়ার এত ভাঙ্গাগড়া, পরিবর্ত্তন, আবর্ত্তন কিছুতেই সাড়া দিতে চাই না।"[৩]

Dhaka University Institutional Repository

নির্লিপ্ত মুসলমান সমাজের উদ্দেশ্যে কটাক্ষপাত করে *আহলে হাদিস* পত্রিকাটিতে বলা হয়েছিলঃ "এ ঘোর প্রতিযোগিতার দিনে ভারতের সুষুপ্ত মুছলেম গা ঢালিয়া ঘুমাচ্ছে। তাহাদের ধমনীতে রুধির স্রোত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের শিরায় শিরায় অসৃকধারা প্রবল বেগে বহিয়া তাহাদিগকে আর জাগরণের সাড়া দিচ্ছে না। বীর মুছলমান তাহাদের হৃদয়ে যে প্রেরণা দিয়েদিল তাহা আর এখন নাই। হাঁ তাদের আছে শুধু স্মৃতি, তাদের আছে কেবল মুখের বড়াই। — মুছলেম! একবার ভেবে দেখ না ভাই বর্ত্তমান জগতে তোমাদের স্থান কোথায় ?"।[৪]

হিন্দু সমাজ মুসলমান সমাজের তুলনায় শিক্ষা-দীক্ষা এবং সর্ব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে নিজেদের অবস্থার কতদূর অগ্রগতি সাধন করেছিল সে বিষয়ে পশ্চাদপদ মুসলমানদের সচকিত করে *শিখা* পত্রিকায় লেখা হয়েছিলঃ "হিন্দু আজ শিক্ষা-দীক্ষা সর্ব্ব বিষয়ে মুসলমান হতে প্রায় পঞ্চাশ বছর এগিয়ে গেছে। তারা বিশ্ব সভ্যতায় ইতিমধ্যেই অনেক কিছু দান করেছে। জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী আজ তাই জগদ্বিখ্যাত। .... তুলনামুলক সমালোচনা করলে তাই দেখা যায় হিন্দু আজ জমিদার, মুসলমান তার প্রজা, হিন্দু আজ চিকিৎসক, মুসলমান চিকিৎসিত রোগী, হিন্দু প্রফেসর, মুসলমান ছাত্র, হিন্দু উকিল, মুসলমান মক্কেল, হিন্দু সওদাগর, মুসলমান তার খরিদদার, হিন্দু উত্তমর্ণ বা মহাজন, মুসলমান অধমর্ণ বা দায়িক— এক কথায় জাতীয় জীবনে সমস্ত দিকে হিন্দুর প্রভাব অনুভূত হয়। মুক্তি কিসে হিন্দু সে কথা বুঝতে পেরেছে। মুসলমান এখনও যেন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। হিন্দুর কর্ম্মধারা আজ সহস্রমুখে উৎসারিত হচ্ছে— আর মুসলমান এখনও যেন নেশাখোরের মত ঝিমোচ্ছে।"[৫]

মুসলমানদের সতর্ক করে দিয়ে *আহলে হাদিস* পত্রিকাটিতে বলা হয়েছিলঃ "বর্ত্তমান জগতে আর নাকে তেল দিয়ে ঘুমালে চলবে না। এ কাজের সময় এ প্রতিযোগিতার কাল। এখনো ভাবিবার সময় আছে জাগিবার কাল ধীরে ধীরে চলে যায় প্রায়।"[৬] সুতরাং, 'আলস্য, জড়তা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর' হওয়ার জন্য আহবান জানিয়ে পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছিলঃ "এখন আর অনুতাপ হা হুতোস্মি করিয়া সময় ক্ষেপ করিলে চলিবে না, জগতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে।"[৭]

হেদায়াত পত্রিকায় লেখা হয়েছিলঃ "বর্ত্তমান জীবনের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া ধ্বংস ও মরণের কোল হইতে এই অবসাদ ও তন্দ্রাচ্ছন্ন মুসলিম জাতিকে জাগ্রত করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে আমাদের আর রক্ষার উপায় নাই! .... বিংশ শতাব্দীর উন্নত সভ্য যুগের আলোক স্পর্শে জগতের সমগ্র জাতিই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কেবল মুছলমানই ঘুমাইয়া রহিয়াছে। ইহাদিগকে জাগ্রত জীবনের আলোকে আনিতে হইবে।"[৮]

Dhaka University Institutional Repository

বাঙলার মুসলমান সমাজ, সাহিত্য চর্চ্চা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চা, স্ত্রীজাতির শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন প্রভৃতি বিষয়ে উদাসীন থাকায় পত্র-পত্রিকাগুলিতে আক্ষেপ প্রকাশ করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে *হেদায়াত* পত্রিকায় দুঃখ প্রকাশ করে বলা হয়েছিলঃ "আমরা মোছলমানদের সাহিত্য চর্চ্চা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চা, স্ত্রীজাতির শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে উৎসাহ-হীনতা প্রত্যক্ষ করিয়া যারপর নাই মর্ম্মাহত হইয়া পড়িতেছি।"[৯]

মুসলমান সমাজের সার্বিক অবনতির জন্য নিজেদের দায়ী করে *আল্-এসলাম* পত্রিকায় বলা হয়েছিলঃ "ফলতঃ আমাদের অবনতির জন্য আমরাই দায়ী, কারণ আমাদের শৈথিল্য, আমাদের ত্রুটী ও অবহেলাতেই আমরা অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইয়াছি।[১০]

ইসলাম প্রচার এ বলা হয়েছিলঃ "যে যুগে সার্ব্ব জাতিক জাগরণ শুরু হইয়াছে, সেই যুগে বাঙ্গালী মুসলিম আমরা একেবারে ঘুমন্ত।[১১]

মুসলিম সমাজের দুরবস্থা লক্ষ করে *শরিয়ত* পত্রিকায় 'কর উন্মোচন তব নিদ্রিত আঁখি নিদ্রা যে নহে ইহা শুধু 'খাবে গাফ্লত'- শিরোনামে লেখা হয়েছিলঃ "... যারা জ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম্ম, সমাজ এমন কি যাবতীয় শিক্ষোন্নতীর সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিল, সেই মোসলেম জাতী আজ বাঙ্গালায় কেমনভাবে কালাতিপাত করিতেছে, আজ বাঙ্গালী মোসলেমের অবস্থার কেমন পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।"[১২]

এ প্রসঙ্গে পত্রিকাটিতে আরও বলা হয়েছিলঃ "তাই বলিতেছি মোসলেম জাগো, নিজের পরিবর্ত্তণতার দিক লক্ষ্য করিয়া, নিজের অবনতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একবার ভাবিয়া দেখ তোমার এখন কি করা দরকার, তোমার জীবন তরী কোনভাবে পরিচালিত করা দরকার, তুমি জাতীয় হিসাবে, তুমি অর্থনীতি হিসাবে, ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিক্ষার হিসাবে কত নীচ ও কেমন অধঃপতিত।"[১৩]

পত্রিকাটিতে তাই আহবান জানিয়ে বলা হয়েছিলঃ "অতএব উঠ— দেশ, ধর্ম্ম, ও আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হও। কেননা তুমি মোসলেম তোমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করে যদি নিদ্রা ও সুখলাভ করিতে পার তাহাই তোমার প্রকৃত ভোগ্য ও যোগ্য।"[১৪]

সমাজের উন্নতির স্বার্থে কোন কাজ না করে "... আমরা শুধু আমাদের পূর্ব্বপুরুষের গৌরব কাহিনী কীর্ত্তন করেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছি।

ফল এই হয়েছে যে, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে হাসি ও আনন্দ নষ্ট হয়ে গিয়েছে" — বলে *জয়তী* পত্রিকায় মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছিল।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

স্বসমাজের যে অধঃপতন তার কারণ উল্লেখ করে মুসলমানদের অতীত হতে দীক্ষা গ্রহনের আহবান জানিয়ে *শরিয়ত* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল ঃ "তোমার অতীতের যাহা কিছু ছিল, সবই তুমি ভুলিতে বসিয়াছ, তোমার যশঃগৌরব বিস্মৃতির অতল জলে ডুবাইয়াছ, তাই তোমার এ অধঃপতন। যদি প্রকৃত মোসলেম হইতে চাও, যদি দীন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতি মোসলমান নামের স্বার্থকতা বজায় রাখিতে চাও, তবে অতীতের মধ্যে ফিরিয়া যাও, হারান মানিক খুজিয়া বাহির কর...." ।[১৬]

জয়তী তাই লিখেছিল ঃ "সমাজের চিন্তা করবার শক্তি যে পর্য্যন্ত না আসে, বা বৃহৎ কল্পনা বা 'আইডিয়া' তাকে অনুপ্রাণিত না করে, সে পর্য্যন্ত এর উন্নতির কোনই আশা নেই। সামাজিক বা জাতীয় জীবনে আর্থিক অভাব তত গুরুতর নয়, যত গুরুতর এই চিন্তা বা ভাবের দৈন্য .... ।"[১৭]

শরিয়ত এ যুব সমাজের উদ্দেশ্যে আবেদন রেখে বলা হয়েছিল ঃ "সমাজের যুবকবৃন্দ একবার ইহার প্রতিকারে আজ মন ঢালিয়া দাও, সমাজকে বুঝাতে চেষ্টা কর" ।[১৮]

জার্মাণ জাতির উদাহরণ দিয়ে এক্ষেত্রে *জয়তী*তে উল্লেখ করা হয়েছিল ঃ "বাস্তবিকই যে জাতি যে দিন থেকে চিন্তা করতে শিখেছে সেই দিন হ'তে তার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দেখা দিয়েছে। জার্ম্মাণ জাতির ইতিহাস এ বিষয়ে খুব উপদেশপূর্ণ" ।[১৯]

অলস ও নির্লিপ্ত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে *তবলীগ* পত্রিকাতে তাই বলা হয়েছিলঃ "আলস্য ও ঔদাস্য আমাদের ছাড়িতে হইবে। অল্প খেয়াল-বিলাস, কূটতর্ক এবং ভাব-প্রবণতা হইতে দূরে থাকিতে হইবে" ।[২০]

মুসলমান সমাজের অতীত গৌরব স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের সম্মুখপানে এগিয়ে যাওয়ার আহবান জানিয়ে মৌঃ গোলাম মোস্তফা বি-এ,বি-টি. 'অতীতের স্মৃতি' শিরোনামে *তবলীগ* পত্রিকায় লিখেছিলেন ঃ

ওরে মুস্‌লিম্! ভীরু! কাপুরুষ! ভয়-কেন আজি করিস মনে?
কিসের শঙ্কা? ছুটে চল্ আজি মুক্তি আহবে জীবন-রণে।
আঘাত দেখিয়া ভয় কেন তোর? কম্পিত কেন হৃদয় খানি?
ভুলে গেলি কিরে অতীতের সেই মরণ-হরণ জীবন-বাণী?
. ...
দৃপ্ত গর্ব্বে জেগে ওঠ্ তবে বাধা-বন্ধন দু'পায়ে দলি,
আঘাত সহিয়া, বাধন কাটিয়া চলারেই মোরা জীবন বলি।
ন'স্ ন'স্- তুই ছোট ন'স্- তুই হীন ন'স্- তোর বিরাট খ্যাতি,
মুস্‌লিম্ তুই- বিশ্বাস কর্- জগতের মাঝে শ্রেষ্ঠ জাতি![২১]

এর যথার্থতা সম্পর্কে *নূর* পত্রিকায় বলা হয়েছিল ঃ "এই যে আহবান, ইহাত অমৃতের আহবান, জীবনের নিমন্ত্রণ, প্রাণের ডাক। এ ডাকে কেহ সাড়া দিবার আছে কি?"[২২]

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকাটিতে তাই যথার্থই মন্তব্য করা হয়েছিল ঃ "কিন্তু এই ডাক যথার্থ ডাক, এই আহবান সত্যকার আহবান হওয়া চাই। মিথ্যা চিৎকারে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না, রূপার কাঠিতে ঘুমন্ত রাজপুত্র জাগে না। তাহাকে জাগাইতে হইলে সোনার কাঠি চাই, জীবন সাধনার মন্ত্র চাই, — অর্থহীন বাক্য উচ্চারণে তাহা হইবার নহে।"[২৩]

মুসলমান সমাজকে নিজ অবস্থার উন্নয়নের জন্য সাধনার আহবান জানিয়ে *সহচর* পত্রিকায় বলা হয়েছিল ঃ "ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে উদাসীন-জাতির বিরাট পেট কি করে ভরবে, এ সম্বন্ধে যারা মোটে চিন্তা করে না, তাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। যারা অভাগা মূর্খ, তারা এ সমস্ত কথার কিছুই বোঝে না। তাই তারা হাসি-উল্লাসে জীবন কাটিয়ে দেয়। নিজেদের উদ্যম-সাধনা ব্যতীত খোদা কখনও মানুষকে বড় করেন না। মানুষের অভাব-বেদনা মানুষকেই মীমাংসা করতে হবে।"[২৪] এ প্রসঙ্গে পত্রিকাটিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছিল ঃ "জগতের শ্রেষ্ঠ ও সভ্য জাতি গুলি মস্তিষ্কের সদব্যবহার করেই বড় হয়েছে। সভ্য জাতির সামনে টিকে থাকতে হলে, নিজেদের সম্মান ও জীবনের জন্যে বেশী করে মাথার সদ্ব্যবহার করতে হবে। চারিদিকে যে এত বেদনা, এত দুঃখ দেখিতে পাচ্ছ এর একমাত্র কারণ জাতির বুদ্ধির দৈন্য"।[২৫] কারণ "নিজকে এবং জাতিকে বড় করতে হলে, তোমার সমস্ত শক্তির পূর্ণ ব্যবহার চাই। তোমার নিজের বড় হবার উপরেই, জাতির বড় হওয়া নির্ভর করে। তুমি ছাড়া জাতি স্বতন্ত্র নয়। সকলে নিজকে টেনে তোল, জাতিও বড় হবে। জাতির জাগরণের অর্থ তোমাদের সকলের জাগরণ"— বলে পত্রিকাটিতে আবেদন জানানো হয়েছিল।[২৬]

বাঙলার মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে *সুনীতি* পত্রিকায় বলা হয়েছিলঃ "মোসলেম জগতে মহাজাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও মুসলমানগণ নব উৎসাহে ও নব উদ্যমে ধর্ম্ম প্রচারে, সমাজ সংস্কারে ও শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কেবল বাঙলার ৩ কোটি মুসলমানই কি চির আলস্য জড়তায় আড়ষ্ট হইয়া থাকিবে? বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নতির যুগে প্রবল প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে যে জাতি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে, কালের নিষ্পেষণে তাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। অতএব মুসলমান ভ্রাতৃগণ! উঠ, জাগ্রত হও, কর্ত্তব্য পালনে সাড়া দাও, জাতীয় উন্নতি ও অভ্যুত্থানের পথে ধাবিত হও, ...।"[২৭]

মোসলেম দর্পণ পত্রিকায় মুসলমানদের কাছে আবেদন জানিয়ে বলা হয়েছিল ঃ "তাই বলিতেছি, মুসলমানগণ! আর মোহ নিদ্রায় অভিভূত থাকিও না। একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত কর; অন্যান্য জাতির প্রতি লক্ষ্য কর; তাহারা তাহাদের জাতীয়তা রক্ষার জন্য কতদূর চেষ্টিত।"[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলমান সমাজের সার্বিক উন্নতি ও অগ্রগতির লক্ষে বিশেষ করে তাদের (ক) শিক্ষা, (খ) সমাজ ও সংস্কৃতি, (গ) সাহিত্য, (ঘ) ধর্ম, (ঙ) অর্থনীতি, (চ) নারীমুক্তি, (ছ) রাজনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত বাঙলা পত্র-পত্রিকাগুলিতে যে সব মতামত প্রকাশিত হয়েছিল সংক্ষেপে তা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ-

ক. শিক্ষা

শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসর বাঙলার মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ে সচেতন করে তোলার জন্য মুসলমান চিন্তাবিদগণ শিক্ষা বিষয়ে পত্র-পত্রিকাগুলিতে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। এক্ষেত্রে 'উপযুক্ত শিক্ষার অভাব'কে তাদের দুর্দশার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে *সাপ্তাহিক আহলে হাদিস* পত্রিকাটিতে জোর দিয়ে বলা হয়েছিলঃ "ভাই বঙ্গীয় মোসলেম সমাজ! কি কারণে মোসলমানের এত দুর্দ্দশা তাহা বুঝিয়া দেখিলে অধিক মাথা ঘামাইতে হয় না। সামান্য একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই অনুমিত হয় আমরা উপযুক্ত শিক্ষাভাবে দিন দিন অন্ধত্ব,দাসত্ব, লাঞ্ছিত, পতিত, দলিত, মথিত, ঘৃণিত হইয়া অন্ধকারের নিম্নতম গহবরে ডুবিতে বসিয়াছি।"[২৯]

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের অনগ্রসরতা লক্ষ করে *সাম্যবাদী* পত্রিকায় লেখা হয়েছিলঃ "বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ মুসলমান শিক্ষায় অনুন্নত। জাতি সমাজ প্রভৃতি শব্দ আজ আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অর্থহীন"।[৩০]

"শিক্ষা না হইলে সংস্কার হয় না। তাই শিক্ষা আগে চাই"— সে কথা উল্লেখ করে পত্রিকাটিতে জোরালো আবেদন জানিয়ে বলা হয়েছিলঃ "এ জগতে জ্ঞান ও চরিত্রশক্তি ছাড়া কোন জাতি, কোন সমাজ, কোন মানুষের সম্মান, মুক্তি ও কল্যাণ হয় না। জ্ঞান সাধনার ভিতর দিয়া তোমার রাজাসন তোমাকে রচনা করিতে হইবে"।[৩১]

বাঙলার মুসলিম সমাজকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনুপ্রাণিত করে তোলার জন্য অতীতে মুসলমানগণের এক্ষেত্রে কিরূপ স্থান ছিল, সে বিষয় তুলে ধরে *ইসলাম প্রচার* এ লেখা হয়েছিলঃ "আব্বাসীয় যুগে যে সমস্ত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকেরা পুস্তক রচনা করিতেন, তাঁহারা সর্ব্ব প্রকারের পুস্তক লিখিতেন। তাঁহারা ব্যাকরণ, ভাষা বিজ্ঞান, ভূগোল, হাদীছ, মহাপুরুষের জীবনী, ইতিহাস ও সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহারা নানা প্রকার বিজ্ঞানের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। দর্শন সম্বন্ধেও তাঁহারা বিভিন্ন ধারার পুস্তক প্রনয়ণ করিয়াছিলেন।"[৩২]

এছাড়া, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অনুশীলনের জন্য আব্বাসীয় যুগের লোকেরা বৈজ্ঞানিক পুস্তকাবলী গ্রীক, ল্যাটিন ও অন্যান্য ভাষা থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করে যেমন বিভিন্ন পাঠাগারে রক্ষা করেছিলেন,

Dhaka University Institutional Repository

বাঙলার মুসলমানদেরও বৈজ্ঞানিক চিন্তাশক্তি বৃদ্ধির জন্য তদ্রুপ করবার সুপরামর্শ দেওয়া হয়েছিল পত্রিকাটিতে।[৩৩]

এক্ষেত্রে লেখক সমাজের কর্ত্তব্য ব্যাখ্যা করে *মোসলেম ভারত* পত্রিকাটিতে বলা হয়েছিলঃ "আমাদের বর্ত্তমান সমাজে যাঁহারা লেখনী ধারণ করিয়াছেন বা করিতে সমর্থ আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের জ্ঞানের আলোচনা করা তাঁহাদের পক্ষে অতি বড় কর্ত্তব্য।"[৩৪] এ প্রসঙ্গে *শরিয়তে এস্‌লাম* এ আহবান জানিয়ে লেখা হয়েছিলঃ "শিক্ষা দীক্ষাকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করে নাও, তোমার চির আদৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল শিল্প-কৌশলের পুনরুদ্ধার কর।"[৩৫]

শারীরিক এবং মানসিক উন্নতি বিধানের সঙ্গে সঙ্গে যাতে প্রত্যেকে স্বাবলম্বী হতে পারে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব রেখে *মোস্‌লেম ভারত* পত্রিকায় লেখা হয়েছিলঃ "আমরা যেরূপ শিক্ষার প্রস্তাব ক'রছি তার লক্ষ্য হ'চ্ছে, প্রথম শারীরিক উন্নতি বিধান, দ্বিতীয় মানসিক উন্নতি বিধান এবং তৃতীয় এমন শিক্ষা দেওয়া যাতে মধ্য শিক্ষা শেষ ক'রেই যেন প্রত্যেকে নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াতে পারে"।[৩৬]

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে *বুলবুল* পত্রিকায় তাই বলা হয়েছিলঃ "শিক্ষার উদ্দেশ্য আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি—সমাজের গলদ এবং দোষ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করা"।[৩৭]

এ প্রসঙ্গে *রওশন হেদায়েৎ* এ যথার্থই বলা হয়েছিলঃ "শিক্ষার মহান ভাব ও উচ্ছ্বাস জাতির মর্ম্মে মর্ম্মে বিচ্ছুরিত করিয়া দিতে না পারিলে, সে জাতি কখনও কর্ত্তব্যবোধে উদ্বেলিত এবং স্বাধীনতার ভাবে মাতোয়ারা ও উদ্দীপিত হইতে পারিবে না।"[৩৮]

শিক্ষাকে যাবতীয় উন্নতির চাবিকাঠি বলে *শরিয়তে এস্‌লাম* এ লেখা হয়েছিলঃ "এই পার্থিব জগতে শিক্ষা বলেই মানব অত্যাশ্চর্য্য উন্নতি সাধন করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে। শিক্ষার বলেই মানব প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শিক্ষার দ্বারা অর্ণব সঞ্চারী বাষ্পীয় পোত, ভূমন্ডল ব্যাপী তাড়িত বার্ত্তাবহ, অদ্ভুত বাষ্পীয় রথ ইত্যাদি অশেষবিধ আশ্চর্য্যজনক দ্রব্যের উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অতএব শিক্ষাই যে সর্ব্ব প্রকার উন্নতির মূল তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।"[৩৯]

Dhaka University Institutional Repository

জাগরণ এ জ্ঞানের অধিকারী হবার আহবান রেখে বলা হয়েছিলঃ "আজ আমাদের আধুনিক জগতের জ্ঞানগুনের অধিকারী হতে হবে। আমরা আজ বড় ডাক্তার চাই আমাদের জীবন বাঁচাবার জন্য, আমরা চাই বড় ইঞ্জিনিয়ার আমাদের শ্রীসম্পদের ভান্ডার বড় করবার জন্য, আমরা চাই বড় উকিল আমাদের ফাঁসিকাষ্ঠ হতে খসিয়ে আনবার জন্য, আমরা চাই বড় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আমাদের জীবন সৌষ্ঠবশালী করে তুলবার জন্য।"[৪০]

সমাজে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তিদের কর্ত্তব্য নির্দেশ করে *সাম্যবাদী* পত্রিকায় তাই বলা হয়েছিলঃ "অতএব আমাদের মধ্যে যাঁহারা অল্প বিস্তর জাগিয়াছেন, তাঁহাদিগের সর্ব্ব প্রধান এবং সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য হইল, সমাজে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করা। যিনি যত রকমে পারেন, তাঁহাকে তত দিক দিয়া এ বিষয়ে খাটিতে হইবে এবং অপরকে খাটিতে উৎসাহিত করিতে হইবে।"[৪১]

'শিক্ষা ছাড়া উন্নতি লাভ কখনই সম্ভব নয়' সে কথা উল্লেখ করে পত্রিকাটিতে আরও বলা হয়েছিলঃ "সুতরাং, সমাজের উন্নতি যাঁহারা চাহেন, তাহাদিগের কাজ হইতেছে, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক শ্রেণী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে শিক্ষিত করিয়া তোলা। ইহা ভিন্ন সত্যকার উন্নতি কখনই হইবে না, হইতে পারে না।"[৪২]

শিক্ষার অন্তর্নিহিত ভাব সম্পর্কে আলোচনা করে *শরিয়তে এস্‌লাম* এ সমাজের উদ্দেশ্যে যথার্থই বলা হয়েছিলঃ "শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু আত্ম উদ্বোধন নয়, সমাজ ও জাতির প্রাণ সংস্কার! শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু আত্মশক্তির উন্মেষণা নয়, নিখিল জাতীয়তার ভস্মাচ্ছাদিত রত্ন-মুকুরের আবিষ্করণ। শিক্ষার উদ্দেশ্য যে শুধু নিজে মুক্ত হওয়া, আজাদ ও স্বাধীন হওয়া তাহা নহে— নিখিল মানবমন্ডলীকে, নিজের দেশ ও জাতিকে মুক্ত, আজাদ ও স্বাধীন করা"।[৪৩]

মুসলমান সমাজের বৃহদংশ গ্রাম্য নিরক্ষর জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলবার জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হয়েছিল *মোয়াজ্জিন* পত্রিকায়। লেখকের মতে ঃ "নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপনও আমাদের শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম উদ্দেশ্য দেখতে পাচ্ছি। ..... গ্রাম্য নিরক্ষর জনসাধারণকে ভাষা দিতে হ'লে একমাত্র নৈশ বিদ্যালয়ই তাহা ক'রতে সক্ষম হবে। জীবন ব্যাপিয়াই যখন শিক্ষার সময় তখন গ্রামে গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একখানা ক'রে পত্রিকা নিতে হবে .... নৈশ-বিদ্যালয় সমাজের কল্যাণ সাধন করিবে"[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

পারে না, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই।"[৫০] পত্রিকাটি প্রস্তাব রেখেছিল ঃ "বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, দর্শন, ভিন্ন ভিন্ন দেশের বড় বড় পন্ডিতের লেখা বাঙ্গালা ভাষায় নিয়ে আসতে হবে—"।[৫১] *নূর* পত্রিকাটিতে তাই জোর দিয়ে বলা হয়েছিলঃ "মাতৃভাষার বিপুল ও তুমুল চর্চ্চা ব্যতীত কোনও জাতির মুক্তি ও কল্যাণ লাভ কদাপি সম্ভবপর নহে"।[৫২]

বাঙলার মুসলমান সমাজকে জ্ঞান চর্চ্চার জন্য পৃথক লাইব্রেরী স্থাপনের আবশ্যকতা তুলে ধরে *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় বলা হয়েছিলঃ ".... লাইব্রেরীতে আরবী, পারসী, উর্দ্দু ভাষার গ্রন্থরাজী সমাবেশের সহিত বাঙলা ভাষার নানা শ্রেণীর সদ্‌গ্রন্থ এবং মাসিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বিশেষরূপে স্থান দিতে হইবে"।[৫৩]

সওগাত পত্রিকাতে মুসলিম সাহিত্য সমাজের কাছে বিশেষ অনুরোধ করে বলা হয়েছিল যে, আরবী ফারসী গ্রন্থ বাঙলায় অনুবাদ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যেন আধুনিক জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত সকল গ্রন্থ বাঙলায় অনুবাদ করেন।[৫৪] লাইব্রেরীতে এই সকল গ্রন্থ জ্ঞানের অভাব পূরণে অনেকখানি সহায়ক হবে বলে পত্রিকাটিতে প্রস্তাব করা হয়েছিলঃ "অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লাইব্রেরী জনসাধারণের জ্ঞানের পরিধি প্রশস্ত করিবার পক্ষে বিশেষ হিতকর। মুসলিম সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ লাইব্রেরীর বিশেষ প্রয়োজন, কারণ মুস্‌লিম বাঙলায় পুস্তক ক্রয় করিয়া জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার মত ক্ষমতা কয়জনের আছে ? লাইব্রেরী সেই ক্ষমতার অভাব দূরীভূত করে। .... লাইব্রেরী শুধু নাটক উপন্যাস ও হাল্‌কা কবিতার পুস্তক লইয়াই হয় না। সেখানে সর্ব্ব প্রকার চিন্তাশীল লেখকদের পুস্তক থাকা চাই"।[৫৫]

মুসলমান সমাজ জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে যাতে মুক্ত বুদ্ধিরও অধিকারী হতে পারে এমন সব গ্রন্থ পাঠাগারে রাখবার জন্য পরামর্শ দিয়ে *মোয়াজ্জিন* পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছিলঃ "যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করিলে মানুষ তৈয়ার হইয়া উঠে, জীবনের অজ্ঞানতা দূর হয়, যাহাতে মানুষ মুক্তবুদ্ধির সন্ধান পায় এবং জীবনের সৌন্দর্য্য বোধ-জ্ঞান জন্মে সেই শ্রেণীর বিবিধ পুস্তক-পুস্তিকা এবং সাময়িক সাহিত্য পত্রিকা ও সংবাদ পত্রগুলি যথাসম্ভব লাইব্রেরীতে রাখিতে হইবে"।[৫৬]

জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমাজের যে অজ্ঞতা তা দূরীকরণের জন্য পারিবারিক লাইব্রেরী গড়ে তুলবার আহবান জানিয়ে *সওগাত* এ পরিশেষে বলা হয়েছিলঃ "আজ দেশের এই বিরাট অজ্ঞতা দূর করবার জন্য প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীকে তাঁর পরিবারে পারিবারিক লাইব্রেরী গ'ড়ে তোলবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'তে হবে। তাঁদের এই সাধনার উপরেই ভবিষ্যৎ বাঙালী সমাজের সিদ্ধি অনেক পরিমাণে নির্ভর ক'চ্ছে"।[৫৭]

সওগাত পত্রিকায় শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র সরকারী ব্যবস্থার মুখাপেক্ষী না থেকে এক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

সমবেত চেষ্টার দ্বারা শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। পত্রিকাটিতে বলা হয়েছিলঃ "সরকারের মুখপানে দেশের শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাকাইয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের এক মূহুর্ত্ত সময় নষ্ট করিবার অবসর নাই। আমাদের সমবেত চেষ্টায় দেশের শিরায় শিরায় শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে।"[৫৮]

খ. সমাজ ও সংস্কৃতি

সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্য ও রীতিনীতি বিষয়ে সেই সময়ের সাংবাদিকগণ এবং সচেতন ব্যক্তিরা চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন এবং সে সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় লিখেছিলেন। সমাজের উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ সম্পর্কে পত্রিকাগুলিতে ব্যাপক আলোচনা করে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। এই প্রথাকে রোগ হিসাবে চিহ্নিত করে *মোসলেম ভারত* এ লেখা হয়েছিলঃ "ইস্‌লামে 'শরীফ' (কুলীন) বলিয়া কোন শ্রেণী নাই। অথচ সর্ব্বত্র, বিশেষ করিয়া পল্লী সমাজে কুল-গৌরব করা অনেক মানুষের একটা ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"[৫৯] তাই সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে পত্রিকাটিতে এই বলে আহবান জানানো হয়েছিলঃ "নিজদিগকে অমন করিয়া অস্বীকার করিয়া আর আমাদের অকল্যাণ করিও না। ঐ মিথ্যার সেবক, ঐ নীচাশয় শাদা পোষাক পরা শরীফ, ঐ চাক-চিক্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হও।"[৬০]

"জাতিভেদ আবার কি কথা? সবাই আমরা মানুষ। সবাই আমরা ভাই"— বলে *সাম্যবাদী* পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছিল।[৬১]

মুসলমান সমাজকে উন্নত করতে সাম্যের সাধনা প্রয়োজন বলে *আহ্‌মদী* তে লেখা হয়েছিলঃ "তাহাদের প্রধান এবং প্রথম চেষ্টা সমাজ সংস্কারের দিকে ধাবিত করিতে হইবে। ক্ষুদ্র স্বার্থ দ্বেষ এবং দলাদলি ভুলিয়া এছলামের মূলনীতি সাম্যের সাধনা করিতে হইবে।"[৬২]

এ ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করে *জাগরণ* পত্রিকায় বলা হয়েছিলঃ "এই সংহতি রক্ষার জন্য ইসলাম আভিজাত্য ও বর্ণভেদের মূলে কুঠার হানিয়া গিয়াছে। "কাহারও আরবী বলিয়া অনারবীর নিকট এবং অনারবী বলিয়া আরবীর নিকট গর্ব্ব করিবার মত কিছুই নাই, কারণ সকলেই আদমের সন্তান এবং মাটি হইতে প্রস্তুত"। মুসলিম সংহতি রক্ষার জন্য শেষ নবী(দঃ) এই সাম্যবাদের বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন।"[৬৩]

বিভিন্ন উপাধি গ্রহণের দ্বারা মুসলমানগণ সমাজে যে স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রেখেছিলেন সে বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করে *জাগরণ* এ আরও বলা হয়েছিলঃ "কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এই যে, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আজকাল নিজেদের নামের সহিত সৈয়দ, কাজী, মির্জ্জা, শেখ, ফারুকী, সিদ্দিকী প্রভৃতি ছাপ বসাইয়া নিজকে

Dhaka University Institutional Repository

গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকেন এবং অপর মুসলমান হইতে একটু বড়, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এবং আত্ম প্রতিষ্ঠানের মিথ্যা ভ্রুকুটি করিয়া সমাজে স্বাতন্ত্র্য ভাব জাগাইয়া তুলিতেছেন। তাহার ফলে বর্ত্তমান দুর্ব্বল মোসলেম সমাজ দিন দিন দুর্ব্বলতর হইতে চলিয়াছে।"[৬৪]

এ সম্পর্কে *হেদায়াত* পত্রিকায় দুঃখ প্রকাশ করে বলা হয়েছিলঃ "দুঃখের বিষয় মোছলমান সমাজে এমন একদল লোকের আবির্ভাব হইয়াছে যে বস্ত্রবয়ন, মৎসব্যবসা, কৃষিকার্য্য, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, কাংস্যকার, সুত্রধর, বিনামা প্রস্তুত প্রভৃতি ইত্যাকার শ্রেণীর বহুবিধ বৈধ ব্যবসাকে হীন চক্ষে দেখিয়া থাকেন; তাঁহাদের নিকট উপরোক্ত ব্যবসায়িগণ জোলা, নিকারী, চাষা, কামার, কাঁসারী, ছুতোর, মুচি প্রভৃতি ঘৃণাব্যঞ্জক আখ্যায় আখ্যাত। ইহার ফলে মোছলমান সমাজ শনৈঃ শনৈঃ অবনতির অন্ধকূপে নিমজ্জিত ও দরিদ্রতার গহবরে নিপতিত হইতেছে। মোছলমান হইয়া একে অপরে ঘৃণা করিতে শিখিতেছে।"[৬৫]

ইসলাম মানবকে সাম্য ও একতা শিক্ষা দানের জন্য সব রকমের উপায় দেখিয়েছে। *সাধনা* পত্রিকাটিতে উচ্চ নিচ ভেদাভেদ দূর করে মুসলমান সমাজকে ভ্রাতৃ ও সাম্যের ভাবে উদ্দীপিত হবার ডাক দিয়ে তাই বলা হয়েছিলঃ "ইস্‌লামের পরম ও চরম শিক্ষা সাম্য ও একতা। একতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইসলাম যত প্রকার উপায়ের প্রয়োজন, সমস্তই অবলম্বন করিয়াছে। সকলে দলবদ্ধ হইয়া নমাজ পড়ার আদেশের দ্বারা কি প্রতীয়মান হয় ? একমাত্র ইমামের পশ্চাতে বহু লোক দাঁড়াইয়া নমাজ পড়িবার সময় ইস্‌লাম মনে করে, আমাদের ভেদ নাই, আমরা এক, আমাদের খোদা এক, রসুল এক, কোরআন্ এক, আমাদের সমস্তই এক, আমরা সকলেই এক"।[৬৬]

জাতির পরিপুষ্টি ও উন্নতির জন্য সমাজে কৃষক, তাঁতী,কলু, জেলে, সান্দার প্রভৃতি পেশাজীবী লোকদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু এই সকল পেশাজীবিদের ঘৃণা করা পরাধীনতারই নামান্তর সে কথা উল্লেখ করে *সাম্যবাদী* পত্রিকায় লেখা হয়েছিলঃ "জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহা সব দেশে সব যুগেই আছে; নতুবা জাতির পক্ষে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই সকল অতি প্রয়োজনীয় ব্যবসায় এবং জীবন ধারণের প্রধান উপকরণগুলিকেই আমরা ঘৃণা করিতে শিখিয়াছি! সম্ভবতঃ ইহা পরাধীনতারই পরিণাম।"[৬৭]

অতএব সমাজের কাছে প্রশ্ন রেখে পত্রিকাটিতে যথার্থই বলা হয়েছিলঃ "যখন ধর্ম্মশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র কোন শাস্ত্রই কোন মানবকে— তা ব্যবসায়ের জন্য তাহাকে যতই নীচ ও ছোট মনে করা যাউক না কেন— উপেক্ষা ও ঘৃণা করিতে ফতোয়া দেয় না, তখন কোন্ অজুহাতে সমাজে, আশরাফ-আতরাফের বাঁধাবাধি গন্ডি টিকিয়া থাকিবে ?"[৬৮]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী দৃষ্টিতে মুসলমান সমাজে সমাজে কোন ভেদ নাই এবং "ঐক্যই হল মুসলমানের বাণী, ইসলামের সাধনা' সে কথা উল্লেখ করে *আল্-এস্লাম* পত্রিকায় লেখা হয়েছিলঃ "ইস্লামের মূলমন্ত্র ঐক্য, ... আমরা মুসলমান সবাই সমান, আমাদের মধ্যে ভেদনাই, বৈষম্য নাই, বিভিন্নতা নাই; — আমরা লক্ষ্য-মোক্ষ, জীবণ-মরণ, সাধ-সাধনায় সমান;"[৬৯]

সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য কে এগিয়ে আসবে সে প্রশ্ন করে *ইসলাম প্রচার* এ তাই লেখা হয়েছিল ঃ "সমাজ আজ অন্তর্বিপ্লবের কোলাহল গর্জ্জনে বহির্জগতের বিপুল আনন্দ বার্ত্তা শুনিতে পায় না। এই নিত্য কলহ নিরত সমাজের মধ্যে কে আজ সাম্যের ভাব স্থাপন করিবে ?"[৭০]

সমাজের মঙ্গল এবং স্থিতির জন্য নাপিত, ধোপা, কর্ম্মকার, মজুর, মেথর প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর পেশাজীবিগণের প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যকতা রয়েছে। 'সমাজের উন্নতি, মঙ্গল, ও সভ্যতা বিকাশে অনেকখানি সাহায্য করে' এই সকল পেশাজীবীগণ। সুতরাং সমাজ দেহের প্রভূত উপকার সাধনকারী এই সকল পেশাজীবীদের অবজ্ঞা এবং ঘৃণা প্রদর্শন না করার আবেদন জানিয়ে *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকাটিতে বলা হয়েছিলঃ "সমাজকে আত্মনির্ভর ও পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে সব শ্রেণীর লোকই দরকার।"[৭১]

সমাজের আলেমগণ স্বসমাজের উন্নতিতে তেমন অংশ গ্রহণ না করে পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকায় পত্র-পত্রিকাগুলিতে এর সমালোচনা প্রকাশ করা হয়েছিল। জাগরণের যুগে আলেম সমাজের নির্লিপ্ততায় *ইসলাম প্রচার* এ ক্ষোভের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছিলঃ "বাঙ্গালার মুসলিম সম্প্রদায় আজ সুপ্ত। রেষারেষির আগুণে জ্বলিয়া পুড়িয়া তা'রা আজ খাক্ হইয়া যাইতেছে। তথাপি জাগিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে না। বিশেষতঃ সমাজের নায়ক আলেম সমাজ আজ নীরব। সমাজের খুঁটিনাটি কলহ লইয়া তাঁহারা তুমুল দ্বন্দ্ব বাধাইয়া বসিতেছে; অথচ বিশ্বব্যাপী যে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে সে দিকে তাঁহাদের এতটুকুও ভ্রুক্ষেপ নাই"।[৭২] বেশীরভাগ আলেম ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকায় *মোয়াজ্জিন* পত্রিকায় দুঃখ করে বলা হয়েছিলঃ "অজ্ঞ জনসমাজকে খোদার নির্দ্দেশিত পথে চালাইবার ভার আলেমগণের হস্তেই অর্পিত আছে; কিন্তু বড়ই দুঃখ হয় যে, আজ অধিকাংশ আলেমগণ হানাফী, মোহাম্মদী ও লা-মোজাহাবী প্রভৃতির বৃথা তর্ক বিতর্কের জন্য বিরাট মহ্ফেল জমাইয়া স্ব স্ব ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার বেশ ফরছুত পাইতেছেন"।[৭৩]

আলেম সমাজের মধ্যে যে কোন্দল তার ভয়াবহ পরিণামের কথা উল্লেখ করে *ছুন্নত অল জামায়াত* পত্রিকাতে বলা হয়েছিল ঃ "কিন্তু হায়, এই আলেম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদাভেদ এখতেলাফ দলাদলি ও বেহুদা ফতওয়ায় মোছলমানের অধঃপতনের পথ আরো প্রশস্ত হইয়াছে। মোছলেম সমাজ হইতে হিংসা দ্বেষ

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি উপরোক্ত ধ্বংসমূলক কর্ম্মসমূহ দূরিভূত করিয়া, সাম্যমৈত্রী উদারতা একতা ও সদ্ভাব স্থাপন না করিলে, মোছলমান যে অনিবার্য্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে একথা ধ্রুব সত্য"।[৭৪]

আলেম শব্দের ব্যাপকতা তুলে ধরে *মোসলেম দর্পণ* পত্রিকাতে যথার্থই বলা হয়েছিলঃ "আলেম হওয়ার উদ্দেশ্য অতি ব্যাপক। আলেম যোদ্ধা— আলেম ধনী, আলেম ব্যবসায়ী, আলেম কাজী, আলেম রাজ্য শাসক এক কথায়, মানুষ ব্যক্তি হিসাবে, সমাজ হিসাবে জাতি হিসাবে, ধর্ম্ম হিসাবে বাচিতে হইলে যে সব জিনিস বা গুণের প্রয়োজন আলেমের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য হইতে তার একটী বাদ দিলে চলিবে না। এ হেন আলেমের সংখ্যা যতই বাড়িবে সমাজের ততই উন্নতি হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না।"[৭৫]

"অতএব মওলবী-মোল্লা, ধর্ম্ম-প্রচারক ও পীর মোরশেদগণের পক্ষে কেবল হুজরায় বসিয়া মোরাকাবা- মোশাহাদায় সময় কাটাইলে চলিবে না, তাহাতে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন সম্পূর্ণ হইবে না, বরং তাঁহাদিগকে মোছলমান সমাজের রাজনীতিক অধিকারের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কৃষি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শরীর-চর্চ্চা, একতা ও ভ্রাতৃভাব ইত্যাদি নানা বিষয় আদেশ উপদেশ প্রদান করিতে হইবে"— বলে *শরিয়তে এসলাম* এ পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।[৭৬]

একইভাবে *সাধনা* পত্রিকাটিতে আলেম সমাজকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছিলঃ "শিয়া, সুন্নী, রাফেজী, খারেজী প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের বায়াত্তর সম্প্রদায় এছলাম ধর্ম্মের এবং মোছলমান জাতির মধ্যে কম অনর্থ ঘটায় নাই।

.... আমাদের আলেমগণ যতদিন সমাজের দলাদলি এবং সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা উৎপাটনে একতাবদ্ধ হইয়া এই পতিত জাতির উদ্ধারের প্রতি যাবতীয় শক্তি নিয়োগ না করিবেন, ততদিন এই জাতির উন্নতি সুদূর পরাহত"।[৭৭]

ধর্ম প্রচার ছাড়াও সমাজের শিক্ষা, অর্থ প্রভৃতি সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করতে এবং এ সকল বিষয়ে কাজ করতেও আলেমদের প্রতি আবেদন জানানো হয়েছিল। *সওগাত* পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছিলঃ "শুধু ধর্ম্মপ্রচার করিলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল, এরূপ মনে করা ঠিক হইবে না। সমাজের শিক্ষা সমস্যা, অর্থ সমস্যা প্রভৃতির দিকেও তাঁহাদিগকে দৃষ্টিদান করিতে হইবে"।[৭৮]

এ জন্য আলেমকে দর্শন, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, অর্থবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ব্যবসায় বিদ্যা, সমাজনীতি প্রভৃতি শিক্ষায় সুশিক্ষিত করার জন্য মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন সাধনের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

মোয়াজ্জিন পত্রিকাটিতে বলা হয়েছিলঃ "এ ক্ষেত্রে আমাদের কর্ত্তব্য সমাজে উপযুক্ত আলেম সৃষ্টি করা। উপযুক্ত আলেম সৃষ্টি করিতে হইলে মাদ্রাছার শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে।"[৭৯]

আলেম সমাজের কাছে আশাবাদ ব্যক্ত করে *সওগাত* পত্রিকার পরিশেষে বলা হয়েছিলঃ "আমরা আশাকরি আলেম সমাজ আমাদের নিবেদনগুলি সরলভাবে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে যত্নবান হইবেন।"[৮০]

সংগীত বিষয়ে মুসলমান সমাজে যে বিরূপ ধারণা ছিল সে সম্পর্কেও পত্র-পত্রিকাগুলিতে সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করা হয়েছিল। 'ইসলামী দৃষ্টিতে সংগীত চর্চ্চা হারাম' বলে সমাজের আলেম ও ধর্ম প্রবক্তাগণ যে ফতোয়া জারী করেন, সে সম্পর্কে যুক্তি সহকারে তা খন্ডনের চেষ্টা করেছেন এই সমস্ত পত্রিকার মাধ্যমে সমাজ সচেতন ব্যক্তিগণ। হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে *সাধনা* পত্রিকায় বলা হয়েছিলঃ "যে জাতির মধ্যে সঙ্গীতালোচনা নাই, সে জাতি রুচিহীন জাতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কারণ তখনই সে জাতি সভ্যতার উচ্চ শিখরে উঠিয়াছে যখনই সেই জাতিই বিশিষ্টভাবে সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়াছে বলিয়া জানা যায়। মুসলমানদিগের মধ্যেও এইরূপ দেখা যায়। স্বয়ং হযরত মোহাম্মদও(দঃ) গীত বাদ্যের বিরোধী ছিলেন না। 'মিশ্‌কাত-অল্‌-মসাবিহের' 'বাবুল নেকায়' (বিবাহ-প্রকরণে) এইরূপ হাদিস দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে তিনি আপনার সহধর্ম্মিণীকে গান বাজনা করাইবার জন্য আজ্ঞা করিতেছেন।"[৮১]

বোখারী শরীফের হাদিসে বর্ণিত আছে যে, আন্‌সার কুলের একজন পুরুষের নিকটে একটি নারীর 'জফাফ' হয়েছিল তখন প্রেরিত পুরুষ বলেছিলেন, 'তোমার সঙ্গে কি কোন আমোদ নাই ? যেহেতু আন্‌সার কুল আমোদ ভালবাসেন'। এ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, তিনি বিবাহ উপলক্ষে গীতবাদ্য করবার আদেশ করছেন। সুতরাং, পত্রিকাটিতে তাই প্রশ্ন করে লেখা হয়েছিলঃ "তবে কি হেতু আমাদিগের আলেমেরা বিবাহ উপলক্ষে গান বাজনা করিতে নিষেদ করেন এবং ইহা শয়তানী বলিয়া কাণে হাত দেন? তাঁহারা কি কখনও হাদিস শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন? না স্বকপোলকল্পিত মত প্রকাশ করেন?"[৮২]

কোন্ ক্ষেত্রে সঙ্গীতের অবৈধতার প্রশ্ন ইসলামে করা হয়েছে সে বিষয় তুলে ধরে *নূর* পত্রিকাটিতে বলা হয়েছিলঃ "আমাদের বিশ্বাস অভ্যাসগত ভাবে সঙ্গীতের অতিরিক্ত প্রশ্রয়, বৃথা আমোদ ও কামনার সহায়রূপে সঙ্গীতের ব্যবহার, অর্থের দিকে বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া সুর, তাল, লয়, রাগরাগিণীর প্রতি অত্যধিক মনোনিবেশ এসলাম অনুমোদন করে না। এই সমস্ত সঙ্গীত লক্ষ্য করিয়াই সঙ্গীতের অবৈধতার ব্যবস্থা হইয়াছে। এ ব্যবস্থা আমরা ন্যায়সঙ্গত মনে করি।"[৮৩]

Dhaka University Institutional Repository

'কতকগুলি ক্ষেত্রে সঙ্গীতের একান্ত আবশ্যকতা রয়েছে যেমন— দেশবাসীর মনে স্বদেশপ্রেম জাগাবার জন্য স্বদেশী সঙ্গীত, জাতীয় প্রেমের উৎকর্ষের জন্য জাতীয় সঙ্গীত, যুদ্ধোন্মুখ বীরগণের মনে সাহস সঞ্চারের জন্য বীরত্ব সঙ্গীত'— সে কথা উল্লেখ করে *নূর* পত্রিকাটিতে আরও বলা হয়েছিলঃ "প্রকৃত কথা এই যে উদ্দেশ্য লইয়া বিচার করিতে হইবে। যে স্থানে সঙ্গীত অসার আমোদ প্রমোদের অবলম্বন মাত্র, এসলাম সে সঙ্গীতের প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহে। কিন্তু যে স্থানে প্রকৃত কল্যাণ আছে, সেরূপ সঙ্গীত যুক্তিমূলক এসলাম ধর্ম্ম কখনই বর্জ্জন করিতে পরামর্শ দিতে পারে না।"[৮৪]

পরিবারে আনন্দের হাওয়া প্রবাহিত করার জন্য সঙ্গীত চর্চ্চার প্রয়োজন সবচাইতে বেশী বলে *সওগাত* পত্রিকাতে সঙ্গীত সমালোচকদের লক্ষ করে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিলঃ "এ সব ধর্ম্ম -বিগর্হিত এই ব'লে আমরা আমাদের ধর্ম্মগুরুর ও নিজেদের অপমানের বোঝা বাড়িয়ে চলেছি মাত্র"।[৮৫]

একইভাবে, *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকাতে হাদিসের উদ্ধৃতি এবং ইতিহাসের উদাহরণ উল্লেখ করে দেখানো হয়েছিল যে, 'সঙ্গীতে— অন্ততঃ বিশুদ্ধ সঙ্গীতে হযরত মোহাম্মদ(সঃ) এর কোনই আপত্তি ছিল না'। পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছিল ঃ ".... সঙ্গীতকে এক শ্রেণীর মৌলবী সাহেবরা নিষিদ্ধ ব'লে ফতোয়া দিলেও ইস্‌লাম কিন্তু সঙ্গীতের সঙ্গে চির-বিজড়িত। মুসলমানের কোরাণ হাদিস এবং সুদীর্ঘ ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতিহাসই তার প্রমাণ।"[৮৬]

'সঙ্গীত ব'লেই যে সঙ্গীত হারাম, তাও যেমন নয়, আবার সঙ্গীত বলেই যে সঙ্গীত হালাল, তাও তেমনি নয়'- এর ব্যবহারকারীর উপরই তা নির্ভরশীল বলে পত্রিকাটিতে আরও বলা হয়েছিলঃ "সঙ্গীত একটা তলোয়ার বিশেষ। যার হাতে যখন থাকে, তার ইঙ্গিতেই চলে। ভাল লোকের হাতে থাকলে ভাল ফল হয়, মন্দ লোকের হাতে থাকলে মন্দ ফল হয়।"[৮৭] সুতরাং, যে সঙ্গীত মানবাত্মাকে সুন্দর ও উন্নত করতে সক্ষম শুধুমাত্র সেই সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তার কথাই পত্রিকাটিতে বলা হয়েছিল।[৮৮]

গ. সাহিত্য

বাঙলার মুসলমানদের সাহিত্য বিষয়ে উদ্যোগী করার লক্ষে যে মুসলমান সাহিত্য সমাজ গড়ে উঠেছিল সে প্রসঙ্গে আবদুল কাদির বলেনঃ "১৯২৬ সালের ১৯শে জানুয়ারী প্রথমতঃ আমারই উদ্যোগে ঢাকায় মুসলিম-সাহিত্য সমাজের ভিত্তি পত্তন হয়েছিল। 'বুদ্ধির মুক্তি' Emancipation of intellect ছিল সেই সমাজের মূলমন্ত্র। শাস্ত্র নিরপেক্ষ যুক্তিবাদ ছিল আমাদের আদর্শ। অন্ধানুবর্তিতার পথ পরিহার করে সমাজ জীবনের সর্বতোমুখী বিকাশ সাধনই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। লোকশ্রেয় ঃ বিচার বুদ্ধির আলোকে দেশের ও জাতির সর্ববিধ সমস্যার সমাধানই ছিল আমাদের কাম্য। .... এই সমাজের মুখপত্র ছিল *শিখা*,

Dhaka University Institutional Repository

জাগরণ ও *জয়তী*। এই পত্রিকাগুলির লক্ষ্য ছিল স্ব স্ব সমাজের গতানুগতিক চিন্তাধারার প্রতি আঘাত দিয়ে জনগণের মনের জাগরণ ও প্রগতিমুখিতা"।[৮৯]

'সাহিত্য সেবা' বলতে কি বুঝায় সে বিষয় আলোচনা করে *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা* টিতে লেখা হয়েছিলঃ "জ্ঞানের কথা কাগজে ধরে' অসংখ্য নর নারীর দৃষ্টির সম্মুখে ধরার নাম সাহিত্য সেবা।

এই কথার ভিতর দিয়ে জীবনের সন্ধান বলে দেওয়া হয়; শূণ্যের বাণী ও মুক্তির কথা প্রচার করা হয়, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের দুয়ার খু'লে দেওয়া হয়"।[৯০]

আর তাই, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে মৌলভী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন ঃ "আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের ইতিহাস, আমাদের সাহিত্য, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের অতুলনীয় জ্ঞান বিজ্ঞান বঙ্গ সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমাজ দেহে প্রবেশ করাইতে পারিলে তাহাতে নূতন উদ্দীপনা ও উদ্বোধনের সঞ্চার হইবে...."।[৯১]

উন্নত জাতি সমূহের উদাহরণ দিয়ে বাঙলার মুসলমান সমাজকে তাদের নিজস্ব সাহিত্য গড়ে তোলার আহবান জানিয়ে *আল্-এসলাম* পত্রিকায় লেখা হয়েছিলঃ "আমাদিগকে বড় হইতে হইবে। বড় হইতে হইলে আমাদের সাহিত্য চাই। রোমের ইতিহাস পড়, গ্রীসের ইতিহাস পড়, আরবের ইতিহাস পড়, ইংলন্ডের ইতিহাস পড় জর্ম্মণীর ইতিহাস পড়, দেখিবে— জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির সহিত জাতীয় উন্নতি কেমন একতারে বাঁধা"। [৯২]

মুসলমানদের স্বধর্ম ও জাতীয় ইতিহাস বিষয়ে উৎসাহশূণ্য মনোভাব লক্ষ্য করে *শরিয়ত* পত্রিকায় বলা হয়েছিলঃ "বড়ই পরিতাপের বিষয়, যে যুগে বিজাতী যে সাহিত্যসমূহ এসলাম-গৌরব-গাথায় পরিপূর্ণ, সেই যুগে আত্মবিস্মৃত মোসলমান তাহার নিজের ধর্ম্ম ও জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করিতে কোনই প্রচেষ্টা করে না"।[৯৩]

জাতীয় সাহিত্য ও পত্র পত্রিকার আবশ্যকতা সম্পর্কে *ইসলাম-নূর* এ লেখা হয়েছিলঃ "পতিত মোছলমান সমাজে জাতীয় সাহিত্যের খুবই অভাব। এই অভাব দূর করিয়া সমাজকে মুক্তি, কল্যাণ ও উন্নতির পথে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে জাতীয় সাহিত্য ও পত্র পত্রিকার আবশ্যকতা অপরিহার্য্য"।[৯৪]

".... হায় আফসোস ! সারা বাংলা খুজিয়াও একজন জমীদার বা ধনাঢ্য লোকেরও নাম করিতে পারি না যে, তিনি সাহিত্যের উৎসাহ দাতা"! ----- বলে *শরিয়ত* পত্রিকাটিতে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছিল।[৯৫]

জয়তী পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছিলঃ "সাহিত্যের দিক দিয়া আমাদের ভাব ও আমাদের আদর্শ এখনও বাঙলা সাহিত্যে ফুটিয়া উঠে নাই।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা মুসলমানগণ বাঙলা সাহিত্যে নিজ কর্তব্য করি নাই, আমাদের নিজের আদর্শ ও ভাব ফুটাইয়া তুলি নাই"।[৯৬]

পত্রিকাটিতে তরুণ কবি ও লেখকদের উদ্দেশ্যে আশাবাদ ব্যক্ত করে লেখা হয়েছিলঃ "আমার বিশ্বাস, আমাদের তরুণ কবি ও লেখকদের লেখায় আমাদের আদর্শ ও ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে", ...।[৯৭] এ কারণে যুগোপযোগী শিক্ষা বিস্তারের জন্য সাহিত্যিকদের লেখনী চালনার আহবান জানিয়ে *বুলবুল* পত্রিকায় বলা হয়েছিলঃ "আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান যুগোপযোগী শিক্ষার বিস্তার যাতে বেশী হয়, আপনারা তারই চেষ্টা ও সাধনা করুন। আপনারা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে দিন আমাদের যুবকদের মনের প্রসারতা বাড়িয়ে, তাদের কৃষ্টির দিকটাকে সুদূর প্রসারী এবং কল্যাণের অভিসারী করে"।[৯৮]

পতিত মুসলিম সমাজের উত্থানের স্বার্থে কি জাতীয় সাহিত্য রচনা এবং অর্থ ও শ্রম ব্যয় করা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে *ইসলাম-নূর* পত্রিকায় বিশেষভাবে লেখা হয়েছিলঃ "কোন দলিত মথিত পতিত ও অবসাদ গ্রস্তে জাতির প্রাণে মুক্তির রোধন বিষাণ বাজাইয়া জাতিকে উন্নতির উচ্চ শিখরে তুলিতে হইলে সে জাতিকে জাতীয় সাহিত্য পত্রে ধর্ম্মতঃ বাধ্য ও অনুরাগী হইতে হইবে। ----- সাহিত্য, কাব্য ইতিহাস, পুস্তক পুস্তিকা, প্রচার ও প্রকাশের জন্য অজস্রভাবে অর্থ ব্যয় করিতে হইবে ও যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতঃ আপ্রাণ পরিশ্রম করিতে হইবে।

সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমাজকে ধর্ম্মপ্রাণ ও কর্ম্মপরায়ণ উন্নত ও মুক্ত জাতিতে পরিণত করিতে হইবে। অভাব অভিযোগ বিদূরিত হইয়া, সমাজে যাহাতে চরিত্রবান, ধর্ম্মানুরাগী, সচ্চিন্তাশীল হইতে পারে— ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি ও শিল্পানুরাগ যাহাতে সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া জাতি ও সমাজ নব নব কল্যাণ, নব নব চিন্তা নব সাধনা ও নূতন উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বর্ত্তমান সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। জাতীয় ভাব ও ইসলামী শব্দ সম্পদ লইয়া সাহিত্যকে সাজাইতে হইবে"।[৯৯]

আর, "সাহিত্যের ভিতর দিয়াই সমাজের পতন ও ধ্বংসের কথা জ্ঞাপন করিতে হইবে— ইহাও সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমাজকে দেখাইয়া দিতে হইবে— যে, অতীতের কোন্ কোন্ বেইমানী নাফরমানী ও ধৃষ্টতার দরুণ আজ আমরা বিশ্বদ্বারে বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত"--।[১০০]

একই ভাষার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু সমাজের তুলনায় মুসলমান সমাজ সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে কতটা পিছিয়ে ছিল তার উল্লেখ করে *শরিয়ত* পত্রিকায় বলা হয়েছিলঃ "যেহেতু আমরা বাঙ্গালী মোসলমান, আমাদের মাতৃভাষা ও সাহিত্য হইতেছে বাঙলা। বাঙ্গালী হিন্দুরও মাতৃভাষা ও সাহিত্য বাঙলা। কিন্তু দুঃখের

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়, এই উভয় জাতির সাহিত্য আকাশ পাতাল পার্থক্য। তাহাদের সাহিত্যের নিকট আমাদের সাহিত্য নিতান্ত অকিঞ্চিতকর, তুলনা করিলে সমুদ্রের নিকট সরোবর বলিয়াই বোধ হয়।"[১০১]

ছুন্নত অল্-জামায়াত এ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আহবান জানিয়ে তাই লেখা হয়েছিলঃ "সাহিত্য ও ইতিহাসের উন্নতি সাধন করিয়া, নিজেকে শ্রেষ্ঠ জাতি সমূহের অন্যতম বলিয়া পরিচয় দাও"।[১০২] কেননা, "সাহিত্যের কার্য্য সমাজের সমসাময়িক চিত্র সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে এক আদর্শ চিত্রের আভাস প্রদান করা। সাহিত্য একাধারে সমাজের সৃষ্টি এবং স্রষ্টা। সমাজ সাহিত্যের মাল-মসলা যোগায়, আবার সাহিত্য সমাজের গতিপথ নির্দ্দেশ করে"।[১০৩]

এহেন সাহিত্যের প্রতি মুসলমান ছাত্র সমাজের অনীহার কথা তুলে ধরে *বুলবুল* এ লেখা হয়েছিল ঃ "রেল ষ্টীমারে যাতায়াত কালে আপনারা লক্ষ্য ক'রে থাকবেন— ছাত্র যাত্রীদের মধ্যে যারা হিন্দু, তাদের হাতে সাধারণতঃ দেখা যায় একখানি বই বা কাগজ, আর যারা মুসলমান, তাদের হাতে সাধারণতঃ দেখা যায় তাস বা সিগারেট"।[১০৪]

যে সমাজে ধনের অভাব, মানের অভাব, জ্ঞানের অভাবের সীমা পরিসীমা নাই; সেখানে সামান্য চেষ্টা ও যত্নে কখনও পুঞ্জীভূত অভাব দূর হতে পারে না সে কথা উল্লেখ করে *নূর* পত্রিকাটিতে জোর দিয়ে বলা হয়েছিলঃ "হিন্দু যেখানে স্বসমাজের উন্নতি বিধান ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য ৫০ টাকা দান করে, মুসলামানকে সেখানে স্বসমাজের উন্নতি বিধান ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১০০ টাকা দান করা চাইই। হিন্দু যেখানে সমাজ ও জাতির জন্য দৈনিক ২ ঘন্টা চিন্তা করে, মুসলামনকে অন্ততঃ সেখানে ৪ ঘন্টা সমাজের চিন্তায় নিমগ্ন থাকা উচিত।

হিন্দু যেখানে একটী হিন্দু ছাত্রকে সাহায্য করে, মোছলমানকে সেখানে অন্ততঃ ২ জন মোসলেম ছাত্রকে সাহায্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

হিন্দু যদি জ্ঞানচর্চ্চার জন্য বৎসরে ২৫খানি পুস্তক ক্রয় করে মুসলমানকে সেখানে জ্ঞান চর্চ্চার জন্য অন্ততঃ ৫০খানি পুস্তক ক্রয় করা আবশ্যক"।[১০৫]

জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে জাতীয় উন্নতি একসূত্রে বাঁধা সে কথা তুলে ধরে মুসলমানদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির জন্য *আল্-এসলাম* পত্রিকাটিতে আবেদন রাখা হয়েছিলঃ "কতকগুলি সাহিত্য হিন্দু মুসলমানের এক, যেমন গণিত বিজ্ঞান, অভিধান, ব্যাকরণ প্রভৃতি, আর কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলি জাতি গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। সেগুলি যেমন, ধর্ম্ম, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, উপন্যাস, নাটক, উপাখ্যান, কাব্য ও খন্ড কবিতা; এগুলি আমাদের নিজের চাই। অন্যের লিখিত পুস্তক দ্বারা আমাদের এই অভাব

Dhaka University Institutional Repository

কিছুতেই দূর হইতে পারে না।"[১০৬] সুতরাং "আমাদিগকে উপন্যাস ও নাটক দ্বারা দেখাইতে হইবে, মুসলমানের কিরূপ হওয়া উচিত, মুসলমানের পারিবারিক জীবন কিরূপ হওয়া উচিত, মুসলমানের সামাজিক জীবন কিরূপ হওয়া উচিত, মুসলমানের রাষ্ট্রীয় জীবন কিরূপ হওয়া উচিত।

মোটকথা, মুসলমান গ্রন্থকারদিগকে একটি আদর্শ চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া আমাদের সাহিত্যিক অভাব দূর করিতে হইবে"--- বলে পত্রিকাটিতে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছিল।[১০৭] এ প্রসঙ্গে *আল্-ইসলাহ* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল ঃ "সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য সামাজিক উন্নতি সাধন। ইহাতে ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সমস্তই থাকিবে।"[১০৮] এ জন্য "চাই এমন সাহিত্য, যাহা পাঠককে আনন্দের সহিত জ্ঞান দান করিবে, তাহার সুপ্ত চেতনাকে জাগাইয়া তুলিবে এবং তাহাকে চিন্তাশীল করিয়া তুলিবে"। ---- বলে *সাম্যবাদী*তে উল্লেখ করা হয়েছিল।[১০৯]

সাহিত্য একটি জাতির উন্নতি এবং অবনতির মাপকাঠি বলে *সওগাত* এ লেখা হয়েছিলঃ "সাহিত্য জাতির X-Ray এবং Radium স্বরূপ। কোন জাতি বেঁচে আছে কি মরে গেছে, কোন জাতি নূতন জীবনের সাড়া পেয়ে চঞ্চল - চকিত হয়েছে কি না, তার নিদর্শন পাওয়া যায় সে জাতির চল্‌তি সাহিত্য থেকে। মোস্‌লেম-সাহিত্যের আজকাল যে অবস্থা তাতে বেশ বুঝা যায়, জাতি হিসাবে, কওম হিসাবে মুসলমান পড়ে আছেন ধূলা কাদায় পর্ব্বতের পাদদেশে, তাঁরা পাহাড়ে উঠে সেখানকার নির্ম্মল হাওয়া ভোগ করবার সন্ধান পান্‌নি।"[১১০]

একই ভাবে *মোয়াজ্জিন* পত্রিকায় বলা হয়েছিলঃ "জাতি বা সমাজ যখন জাগে, তখন সাহিত্যের ভিতর দিয়াই তাহার জাগরণের প্রথম লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়"।[১১১]

সৎ সাহিত্যের আলোচনা পতিত জাতিকে জাগিয়ে তুলবার প্রকৃষ্ট উপায় বলে *আহলে হাদিস* পত্রিকাতে জোর দিয়ে লেখা হয়েছিলঃ "বাস্তবিক সাহিত্যের অমৃত সঞ্জিবনী ধারা প্রবাহেই মৃতবৎ সমাজদেহে যথার্থ চেতনা, সঞ্চারিত হয়। অধঃপতিত ও নিদ্রিত জাতিকে জাগাইবার প্রকৃষ্ট উপায়ই সৎ সাহিত্যের আলোচনা"।[১১২]

সাহিত্যের মধ্যদিয়ে একটি জাতির সামগ্রিক চিত্র দেখতে পাওয়া যায় বিধায় *নওরোজ* এ লেখা হয়েছিলঃ "সাহিত্য জাতীয় জীবনের দর্পণ। আয়নার সামনে দাঁড়ালে স্বীয় রূপ, শোভা, সৌন্দর্য্য, মলিনতা, আবিলতা, হাসির রেখা, বিষাদের সুর— এক কথায় সমগ্র মানস লোক যেমন করে আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনিভাবে সাহিত্যের ভেতর দিয়ে সমগ্র জাতির অতীতের ইতিহাস, কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি, বর্তমানের সুখ দুঃখ, হাসি-কান্না ও ভবিষ্যতের আশা,-আকাংখা, স্বপনবাণী—তথা

Dhaka University Institutional Repository

জাতির মর্মকথা ধ্বণিত হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ সাহিত্যই জাতির শিক্ষা, সভ্যতা, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলেখ্য"।[১১৩]

রাজনৈতিক চেতনা আনয়নে সাহিত্যের যে বিরাট ভূমিকা রয়েছে, সে সম্পর্কে *আল্-ইসলাহ* পত্রিকায় বলা হয়েছিলঃ "রাজনৈতিক চেতনা আমরা যতটুকু পেয়েছি আন্দোলন ও হুড়ো হুড়ির ভেতর দিয়ে, তার চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছি সাহিত্যের ভেতর দিয়ে। আমাদের সুপ্ত চেতনহারা মনে স্বদেশ প্রেমকে জাগ্রত করে তুলেছে আমাদের সাহিত্য"।[১১৪]

ঘ. ধর্ম

সমাজে ধর্মের প্রয়োজন কেন সে সম্পর্কে *সাধনা* পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছিলঃ "সুবিশাল ও বহুধা বিভক্ত মানব সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিতে এবং আত্মার অনন্ত উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিতে ধর্ম্মের প্রয়োজন"।[১১৫]

মানবজীবনে ধর্ম কি জাতীয় শিক্ষাদান করে থাকে সে বিষয়ে *শরিয়ত* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল "ধর্ম তোমাকে ইহাই শিক্ষা দিয়া থাকে যে, সত্য, লজ্জা, বিশ্বাস ও ন্যায় কার্য্যসমূহ পূণ্যের পথ; আর মিথ্যা, বিশ্বাসঘাতকতা, নীচতা, হীনতা ও অত্যাচার উৎপীড়ন ইত্যাদি ধ্বংস ও পাপের পথ। 'ধর্ম্ম' আত্মমর্য্যাদা, সচ্চরিত্রতা, স্বদেশ প্রেমিকতা ও পিতামাতা প্রভৃতি বয়ঃজ্যেষ্ঠদিগের প্রতি তোমায় সম্মান প্রদর্শন শিক্ষা দিয়া থাকে এবং আত্মহত্যা, মদ্যপান, মিথ্যাসাক্ষ্য, বলপূর্ব্বক, আত্মসাৎ, প্রবঞ্চনা, ঈর্ষা, শত্রুতা ইত্যাদিকে বর্জ্জন করিতে আদেশ করিয়া খোদার ভয়, তাঁহার শাস্তির ভয়, ধর্ম্মই তোমাকে জ্ঞাপন করিয়া থাকে।[১১৬]

কিন্তু ধর্ম পালনে মুসলমান সমাজের ত্রুটি এবং ধর্মীয় পথ হতে তাদের বিচ্যুতিতে আক্ষেপ প্রকাশ করে *ইসলাম-দর্শন* এ লেখা হয়েছিলঃ "ইস্‌লামের সৌন্দর্য্য, ইস্‌লামের শিক্ষা এবং ইস্‌লামের বৈশিষ্ট্য ভুলিয়া মুসলমান জাতি এক কিম্ভূত কিমাকার জীবে পরিণত হইয়াছে; সভ্যতা, সুরুচি ও সদাচারের লেসমাত্রও তাহাদের মধ্যে নাই!"[১১৭] পত্রিকাটির মতে, "সেই জন্যই মুসলমান জাতির এই ঘোর অধঃপতন"।[১১৮]

বাঙলার মুসলমান সমাজের অধঃপতনের কারণ হিসাবে ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতাকে দায়ী করে *শরিয়তে এসলাম* এ বলা হয়েছিলঃ "আধুনিক বঙ্গীয় মোছলেম সমাজের পতনের মূলেও ইছলামে পূর্ণ বিশ্বাস হীনতা দেখিতে পাই। সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই দেখা যাইবে যে, নিতান্ত অল্প সংখ্যক ব্যতীত অন্যান্য সকলেই ইছলাম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ"।[১১৯]

Dhaka University Institutional Repository

এ ব্যাপারে ধর্মপ্রচারকদের কর্ত্তব্য নির্দেশ করে তাঁদেরকে উপদেশ দানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে *সাম্যবাদী* পত্রিকায় তাই বলা হয়েছিলঃ "আমাদের মধ্যে মৌলবী, মৌলানা ও ধর্ম্ম প্রচারকের অভাব নাই। তাঁহাদেরও এ সম্বন্ধে একটা বিশেষ কর্ত্তব্য আছে।

ইহা ভিন্ন তাঁহারা ধর্ম্ম প্রচারকালে যখন যেখানে নিজেদের মধ্যে কোন হীন ও জঘন্য আচার ব্যবহার দেখিবেন তাহা ছাড়িতে বিশেষভাবে সকলকে উপদেশ দিবেন। ইংরেজি শিক্ষিত লোক অপেক্ষা মুসলমান সমাজে দিনী আলেমদের কথাই সকলের নিকট সমধিক গ্রহণীয় হয়। এ জন্য স্ব স্ব সমাজের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আশাকরি, তাঁহারা এটুকু বুঝিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হইবেন"।[১২০]

শের্ক এবং অন্যান্য পাপকার্য্য দূরীকরণে সমাজের সকল স্তরের ব্যক্তিবর্গের এগিয়ে আসা উচিত বলে *মোসলেম দর্পণ* পত্রিকাটিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিলঃ "দেশ হইতে শের্ক বেদাৎ ও অন্যান্য পাপকার্য্য দূরীভূত করা সকলেরই কর্ত্তব্য। প্রাসাদ বাসী সম্রাট হইতে পর্ণকুটীর বাসী ভিক্ষুকের পক্ষেও ইহা কর্তব্য। রাজা বা বাদশাহগণের পক্ষে তাঁহাদের নিজ নিজ রাজ্য হইতে এই সকল দোষ দূরীভূত করিয়া দেওয়া যেরূপ কর্ত্তব্য, সাধারণ ব্যক্তিবর্গের পক্ষে তাহাদের নিজ নিজ গৃহ বা পরিবার মধ্য হইতে তৎসমুদয় দূর করা তদ্রুপ কর্ত্তব্য"।[১২১]

বাঙ্গালী মুসলমানদের ধর্মীয় উদাসিনতার ফলে সমাজে যে সকল কুঅভ্যাস বৃদ্ধি পেয়েছে সে সম্পর্কে *ইসলাম প্রচার* এ উল্লেখ করা হয়েছিলঃ "বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক দেশের মুসলমানেরাই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ে অত্যন্ত মনোযোগী ও উন্নত। কেবল মাত্র বাঙ্গালী মুসলমানেরাই এ বিষয়ে উদাসীন ও সকলের পেছনে। তাই দিন দিন বাঙলা বে-নমাজি, ফাছেক, বদকার, মিথ্যাবাদী, ধোকাবাজ ইত্যাদির সংখ্যা অধিক পরিমাণে বাড়িতে চলিয়াছে"।[১২২] এই জন্য শরিয়তের আদেশ সম্পর্কে অজ্ঞতাকে দায়ী করে পত্রিকাটিতে মন্তব্য করা হয়েছিলঃ "ইহার কারণ কি? কারণ শুধু মূর্খতা ও অজ্ঞতা। যদি আমরা কোর-আন হাদীছ ও শরিয়তের আদেশাবলী জানিতে পারিতাম, তবে বোধ হয় মনে কিছু ভয় থাকিত, এবং এই সকল কুকর্ম্ম হইতে বাঁচিবারও চেষ্টা করিতাম"।[১২৩]

পারস্পরিক আত্মকলহ ভুলে গিয়ে ধর্মীয় পথভ্রষ্ট মুসলমান সমাজকে প্রকৃত ধর্মীয় জ্ঞান দানের জন্য তাঁদেরকে আহবান জানিয়ে *শরিয়তে-এস্‌লাম* এ তাই বলা হয়েছিলঃ "আপনারা পবিত্র কোনআনের আলোক হাতে নিয়ে, আসরে নেমে পড়ুন, নীচ ব্যক্তিগত স্বার্থের মাথায় জলাঞ্জলি দিয়ে, হিংসা-দ্বেষ ও আত্ম-কলহ প্রভৃতি হীনবৃত্তিসমূহ অনুতাপানলে দগ্ধ ক'রে প্রকৃত কর্ম্মী-রূপে কর্ম্মভার গ্রহণ করুন, ইসলামের পবিত্র পতাকা বহন ক'রে বীর বেশে পথভ্রষ্ট মোস্‌লেম সমাজকে প্রকৃত পথ দেখিয়ে অগ্রসর হোন; দেখবেন

Dhaka University Institutional Repository

অচিরেই এই সর্ব্বহারার দল আবার পথে উঠবে— আবার তাদের লুপ্তগৌরব, হারান বৈভব ফিরে পাবে"।[১২৪]

সাধারণের সঙ্গে মিলে-মিশে সংস্কার মূলক কার্য্য পরিচালনার উপযুক্ত স্থান মস্‌জিদ এবং শিক্ষিত সমাজ যাঁরা জগতের উত্থান-পতন ও নবযুগের নবীন-বার্ত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান রাখেন তাঁদেরকে দৈনিক পাঁচবার না হউক, অন্ততঃপক্ষে একবার করে মসজিদে গমনের আবেদন জানানো হয়েছিল *হেদায়াত* পত্রিকায়। পত্রিকাটিতে জোমআর— খোৎবায় আধুনিক জগতের অবশ্য জ্ঞাতব্য সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করার অনুরোধ করে বলা হয়েছিলঃ "নামাজের শেষে শিক্ষিত ব্যক্তি সাধারণকে সংবাদ পত্রের দৈনিক সংবাদাদি পড়িয়া শোনাইবেন এবং বিশ্বের কোথায় কোন্ নির্য্যাতিত অধঃপতিত জাতি নিজেদের উন্নতির জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেছে, তাহা বুঝাইয়া দিবেন"।[১২৫]

মসজিদে প্রতি শুক্রবার জুম্মার নামাজের খোতবারও একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। এতে নামাজীগণকে সাপ্তাহিক উপদেশ প্রদান এবং বিশ্ব স্রষ্টার প্রতি, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি, পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি, এমন কি সমস্ত মানব সমাজের প্রতি তার কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়— সে কথার উল্লেখ করে *নওরোজ* পত্রিকাটিতে বলা হয়েছিল ঃ "খোত্‌বার অধিকাংশই, যে ভাষা বেশিরভাগ নমাজীরা বুঝেন, সেই ভাষাতেই রচনা করিয়া লইতে হইবে এবং খোত্‌বা বিশেষ বিশেষ ঘটনার অবস্থানুযায়ী রচনা করিয়া লওয়া উচিত। খোত্‌বার মধ্য দিয়া দরিদ্র মুসলমান সমাজে আশা জাগাইয়া তুলিতে হইবে, অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য কেমন করিয়া অধ্যবসায় ও সাধুতা বলে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারে, তাহা শিক্ষা দিতে হইবে।"[১২৬] এ প্রসঙ্গে *মোয়াজ্জিন* পত্রিকায় যথার্থই লেখা হয়েছিল ঃ "নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত প্রভৃতি পালন এবং ক্বুর-আন্ ও তছবিহ তেলাওয়াতের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি জগতের যাবতীয় সেবা-কার্য্য করাকেই আল্লার প্রেম ও আল্লার এবাদত বলে"।[১২৭]

কোরআন এবং হাদিস আরবী ভাষায় লিখিত হওয়ায় বাঙলার অধিকাংশ মুসলমান আরবী ভাষা না জানার কারণে সে বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভে অক্ষম ছিল। এক্ষেত্রে মাতৃভাষা বাঙলার মাধ্যমে কোরআন এবং হাদিসের শিক্ষা সমাজ দেহে জীবনের সঞ্চার আনয়নে সক্ষম— সে কথা বলে *মোসলেম দর্পণ* পত্রিকায় বলা হয়েছিলঃ "প্রাদেশিক মাতৃভাষা বাংলার সাহায্যে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের মর্ম্ম বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে প্রচার করাই একমাত্র সদুপায় যাহা দ্বারা এই প্রদেশে ইস্‌লামের মহান্ শিক্ষা, অতুলনীয় মাহাত্ম, অসীম সৌন্দর্য্যের বিষয় বিকাশ পাইতে পারে এবং উহার ফলে সমাজের জীর্ণদেহে নব জীবনের সঞ্চার হইয়া উহাকে পুনরায় সঞ্জীবিত ও সমুন্নত করিতে পারে।"[১২৮]

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে "ধর্ম্ম ও পূণ্যের ভাণে যে সকল শেরেক, বেদাত, পীর-পূজা, গোর-পূজা ও বৃক্ষ-পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে" সেই সকল ধ্বংস্কর দোষ নিবারণের জন্য আলেম সমাজকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রদর্শনের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল *ইসলাম-দর্শন* পত্রিকাটিতে। পত্রিকাটিতে বলা হয়েছিলঃ "সমাজের অবস্থানুযায়ী এক্ষণে আলেমগণের পক্ষে পুরাতন সুর পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন ধরণের ওয়াজ নছিহত করার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কারণ এটা বৈজ্ঞানিক যুগ; যুক্তিতর্ক ব্যতীত কেবল শুধু কোরআন হাদিছের দোহাই দিয়া কোন বিষয়ে লোকদিগকে বাধ্য করিতে চাহিলে তদ্দ্বারা সকলের পক্ষে প্রকৃত বিশ্বাস বা ইমান লাভ হইতে পারে না;

ধর্ম্মের মূল সূত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দার্শনিক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করাই সময়োপযোগী হেদায়েত।"[১২৯] সুতরাং, পত্রিকাটিতে সমাজের ধনী জমিদার, আলেম ও ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিগণের কাছে আবেদন রাখা হয়েছিল যাতে করে তাঁরা "মোসলমান বহুল বাঙ্গালা দেশে" বিশুদ্ধ সরল বাংলা ভাষায় কোরআন মজিদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তথ্য সমণ্বিত বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন এবং এই কার্য্যটি সম্পন্ন করে মুসলমান সমাজের কলঙ্ক ভঞ্জন করেন"।[১৩০]

মাতৃভাষায় মছলা লেখা এবং চর্চার বিষয়টি আলোচনা করে *ইসলাম প্রচার* পত্রিকায় লেখা হয়েছিলঃ "আপনাদিগকে কে বলিয়াছে বাংলা ভাষায় লিখিত মছলা-মছায়েল গ্রহণযোগ্য নহে। যাহা শরীয়তের কথা, তাহা যে কোন ভাষায় হউক না কেন গ্রহণযোগ্য। কিন্তু মাতৃভাষায় হইলে উহাকে সাদরে আলিঙ্গণ করা উচিত"।[১৩১] এর সমর্থনে *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য়* উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছিলঃ "মাতৃভাষার সাহায্যে জ্ঞানের অনুশীলন যে কিরূপ সফল এবং কিরূপ ব্যাপক হইয়া দাঁড়ায়, জাপান তাহার উজ্জ্বল আদর্শ(মাতৃভাষায় তারা জ্ঞান আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে)।

আরবও ঠিক এমনই করিয়া বিশ্বের সকল ভাষা ও সকল জ্ঞানের রস, আপনাদের মাতৃভাষার মধ্য দিয়া পান করিয়াছিল। আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে।[১৩২]

বুলবুল পত্রিকায় মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী তাই মন্তব্য করেছিলেনঃ "আরবী কোর্‌আনের দুই-এক পাতা কোন রকমে রিডিং পড়তে শেখার নাম ধর্ম্ম শিক্ষা নয়; কেন না বস্তুতঃ তাতে ধর্ম্মশাস্ত্র কিছুই শেখা হ'লো না, বৈদেশিক ভাষায় কয়েকটী মন্ত্র কণ্ঠস্থ করা হ'লো মাত্র। একে যাঁরা ধর্ম্ম শিক্ষা মনে কচ্ছেন তাঁদের ধর্ম্মার্ত্ততা সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ আশঙ্কার কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।"[১৩৩] এজন্য সাধারণ শিক্ষা থেকে ধর্ম শিক্ষাকে পৃথক করার পরামর্শ দিয়ে পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছিলঃ "কিন্তু এই অন্ধতা আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

যোচাতে হ'বে; সাধারণ শিক্ষা থেকে ধর্ম্মশিক্ষাকে আলাদা ক'রে ফেলতে হবে। ধর্ম্ম শিক্ষার অর্থ ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন, কতকগুলি অতি সাধারণ ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান-অর্জ্জন নয়।"[১৩৪]

অধঃপতিত সমাজকে পুনরায় উন্নত করতে, ধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার আবেদন জানিয়ে *মোস্‌লেম দর্পণ* এ বলা হয়েছিলঃ "ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সমগ্র সমাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে; শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-গবেষণা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সকল বিষয়ে উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়া সকলকে উন্নীত করিতে হইবে— তাহা হইলেই এ অধঃপতিত সমাজ আবার উন্নত হইবে।"[১৩৫]

মুসলমান জাতির অধঃপতনের কারণ নির্দেশ করে *মোসলেম দর্পণ* এ বলা হয়েছিল ঃ "প্রত্যেক জাতির পতন হয় কখন ? তদুত্তরে প্রত্যেক ভাবুক এবং জ্ঞানী-ব্যক্তিই বলিবেন যে, যখন তাহারা ধর্ম্মের মূলশিক্ষা, মূলনীতি ও মৌলিক আদর্শ ভুলিয়া যায়— তখনই সে জাতি অবনতির পথে ছুটিয়া চলে। আমরা মোসলমান জাতির অধঃপতনের মূলেও তাহাই দেখিতে পাইতেছি।"[১৩৬]

মুসলিম যুব সমাজকে ধর্মীয়ভাবে উজ্জীবিত হয়ে যাবতীয় উন্নতি আনয়নের জন্য *আল-এস্‌লাম* পত্রিকাতে আহবান জানিয়ে বলা হয়েছিলঃ "যদি স্বকীয় জীবনকে উন্নত করিতে বাসনা থাকে— জগতে কোনও মহৎ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া কীর্ত্তিধ্বজা উড্ডীন করিতে অভিলাষ থাকে, তবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত, অধর্ম্ম পথে চালিত, শোচনীয়, মৃতপ্রায়, অস্থিকঙ্কালসার মোসলেম সমাজকে ধর্ম্ম-সঞ্জীবনী সুধায় পুনরুদ্দীপ্ত করিতে প্রত্যেক মোসলেম যুবকেরই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

সমাজের প্রত্যেক নর নারীকে ধর্ম্মানুশাসন পালন করিতে হইবে— ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে— নিজকে ধার্ম্মিক করিতে হইবে— তবেই সমাজ আপনা হইতেই জাগিবে— তেজোদীপ্ত হইবে— উন্নতিমার্গে দ্রুত অগ্রসর হইবে।"[১৩৭]

ঙ. অর্থনীতি

পত্র-পত্রিকাগুলিতে স্বসমাজের অর্থনৈতিক বিষয়েও লেখালেখি হয়েছিল। *রওশন হেদায়েৎ* এ বাঙলার মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার জন্য ধন উপার্জনের নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবনের আহবান রেখে বলা হয়েছিল ঃ "অর্থ, ধন বা টাকা পয়সা ব্যতীত দুনিয়াতে কোন কাজই সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

তাই সমাজে ধনী ও ধনশালী লোকের আবশ্যকতা অপরিহার্য্য। ধনার্জ্জনের নব নব পন্থার উদ্ভাবন করতঃ জাতিকে ধন-সম্পদশালী ও অর্থশালী হইবার দিকে মাতাইতে ও উৎসাহিত করিতে হইবে। তবেই আমরা প্রতিবেশী জাতির সহিত প্রতিযোগীতায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকিয়া থাকিতে পারিব ও আমাদের সম্ভ্রম

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষা পাইবে। নতুবা নিখিল দুনিয়ায় চিরদিনই আমাদের ঘৃণিত, উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত ও দলিত মথিত হইতে হইবে।"[১৩৮]

অর্থ এবং শিক্ষার অভাব মুসলমান সমাজকে অর্থহীন করে তুলেছিল। এই দুইটি অভাবের বিরুদ্ধে অভিযানের ডাক দিয়ে *জাগরণ* এ লেখা হয়েছিল ঃ "একদিকে অর্থের অভাব যেমন আমাদিগকে শক্তিহীন, জ্ঞানহীন ও শিক্ষাহীন করিয়া রাখিয়াছে,অন্যদিকে আবার শিক্ষার অভাবও আমাদিগকে অর্থহীন করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের প্রথম অভিযান এই দুইটী অভাবের বিরুদ্ধে ঘোষণা করিতে হইবে।"[১৩৯]

আর্থিক দৈন্যতার কারণে মুসলমানরা সমাজে হেয় প্রতিপন্ন বলে *সওগাত* এ বলা হয়েছিল ঃ "আজ আমাদের টাকা নাই ; সকলেই আমাদের ঘৃণা করে, অবজ্ঞা করে, তুচ্ছ করে, গালি দেয়, তাড়িয়ে দিতে চায়।"[১৪০]

শিক্ষা ও আর্থিক দৈন্যতা মুসলমান সমাজকে সমাজের নিম্নতর স্তরে উপনীত করেছিল। হিন্দু সমাজের সঙ্গে মুসলমানদের তুলনামূলক অবস্থানগত দিক আলোচনা করে *সওগাত* পত্রিকায় দেখানো হয়েছিল ঃ "দারিদ্র্য ও মূর্খতার ফলে দেশের সর্ব্বত্রই হিন্দু মহাজন— মোসলমান দেনদার, হিন্দু জমিদার— মোসলমান প্রজা, হিন্দু উকিল— মোসলমান মক্কেল, হিন্দু শিক্ষক— মোসলমান ছাত্র, হিন্দু আফিসার-মুসলমান কুলি; তদ্ভিন্ন রেল, জাহাজ, নৌকা-ট্রাম, গো-যান, অশ্ব-যান ইত্যাদি সকল প্রকার যান বাহনের আগের মুণ্ডর মোসলমানের একচেটিয়া।"[১৪১]

আর্থিক দিক দিয়ে মুসলমানদের এই পশ্চাদ্‌পদতা দূর করতে সমাজের কাহাকেও এগিয়ে আসতে না দেখে *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকাতে দুঃখ প্রকাশ করে লেখা হয়েছিলঃ "কি উপায় অবলম্বনে অর্থসঙ্কট দূরীভূত করিয়া বাঙলার মুসলমানেরা কর্ম্মময় জগতের প্রত্যেক স্তরে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে, এ সমস্যার সমাধান করিতে কাহাকেও দেখা যায় না।"[১৪২] প্রকৃত পক্ষে, হিন্দু সমাজ আর্থিক দিক থেকে নিজেদের বলিষ্ঠ করে তুলেছিল কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ ও অধ্যবসায় দ্বারা, কিন্তু মুসলমান সমাজ অলসতা ও কর্মবিমূখতার কারণে নিজ সম্প্রদায়কে আর্থিক দিক থেকে উন্নত করতে পারেনি।[১৪৩]

বস্তুতঃ পক্ষে, একটি জাতি তখনই সভ্যতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে যখন সে তার অভাব সৃষ্টি ও তা পূরণে সক্ষম হয়। কিন্তু মুসলমান জাতি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড থেকে নিজেদের বিরত রেখে অধঃপতনের দিকে ধাবিত হতে থাকলে তাদের প্রতি হুসিয়ারী উচ্চারণ করে পত্রিকাটিতে তাই বলা হয়েছিল ঃ "যে জাতি অভাব সৃষ্টি ও পূরণ করিতে অক্ষম সে জাতি সভ্যতার দিক অগ্রসর হইতে পারে না।"[১৪৪]

সমাজকে অর্থনৈতিক দিক থেকে বলীয়ান করে তুলবার জন্য কৃষির উন্নতি এবং ব্যবসা-বানিজ্য করা

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন। কিন্তু এদিকে মুসলমান সমাজের নির্লিপ্ততা লক্ষ্য করে *হেদায়াত* পত্রিকায় হতাশার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছিলঃ "ব্যবসা-বানিজ্য, কৃষি শিল্পের উন্নতি অর্থ উপার্জ্জনের এক প্রশস্ত পথ। সেদিকে অনেকেরই আদৌ খেয়াল ও মনোযোগ নাই। যে সমাজে অর্থাভাব, অন্নকষ্ট, জ্ঞানাভাব, ধনবলের দিক দিয়া বলীয়ানের বিষয় উদাসীন, সে সমাজে শিক্ষা ও সভ্যতার বিমল এবং উজ্জ্বল আলোতে সমাজ-গগণের নিবিড় তিমির ভেদ করিয়া আশার প্রদীপ্ত শশধর উদিত হওয়ার আশা সুদূর পরাহত"।[১৪৫]

মোয়াজ্জিন পত্রিকাতে মুসলমান তরুণ সমাজের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করে লেখা হয়েছিল যেঃ "হে তরুণ বন্ধুগণ! বর্ত্তমান অবস্থায় যদি এ কর্ম্মক্ষেত্রে আপনারা অগ্রসর না হন, তাহা হইলে সমাজকে দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইতে সাহায্য করা হইবে মাত্র। দেশ যদি আরও দরিদ্র হয় তাহা হইলে সে লাঞ্জনা— গঞ্জনা আপনাদিগকেই ভোগ করিতে হইবে। আপনাদের জাতিই ক্রমশ: ধরাপৃষ্ঠে হীন হইয়া পড়িবে— বিলুপ্ত হইয়া যাইবে"।[১৪৬]

তাই, শিক্ষিত যুব সমাজকে শিল্প ও বানিজ্য সমস্যা সমাধান করবার জন্য তাদের কে মিল, ফ্যাক্টরী, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানী সংগঠনের দ্বারা বেকার সমস্যা দূরীভূত ও অর্থ সমস্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আহবান জানানো হয়েছিল *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায়। এ প্রসঙ্গে সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়ে পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছিলঃ "যুবকেরা যাহাতে শিল্প-ব্যবসায় বানিজ্যে ব্রতী হইয়া আত্ম প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, তজ্জন্য গভর্ণমেন্ট ও সমাজ নায়কদের সাহায্য এবং সহানুভূতির আবশ্যক।শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিয়া যাহাতে তাহারা ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারে, সে জন্য গভর্ণমেন্টকে স্থানে স্থানে শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং ব্যবসায় করিতে যাইয়া তাহারা যাহাতে মূলধনের নিমিত্ত বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তজ্জন্য- গভর্ণমেন্টের সহায়তায় ব্যাঙ্ক হইতে মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।"[১৪৭]

দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক। উন্নত দেশসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায় ব্যাংক ব্যবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে এক্ষেত্রে অগ্রগামী হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানরা এই ব্যাপারে সচেতন ছিল না। ফলে তারা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা না করে বাড়ীতে অর্থ সঞ্চিত করে রাখায় তাদের সঞ্চিত বিপুল অর্থ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোন কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারতো না। মুসলমান সম্প্রদায়ের এই মানসিকতার প্রতি কটাক্ষপাত করে পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছিল ঃ "জাতির অর্থশক্তিকে যদি সংহত করিয়া তুলিতে হয়, তবে উন্নত ধরণের ব্যাঙ্কের প্রয়োজন। আধুনিক অর্থনৈতিক জগতের জটিল কৃষি, শিল্প ও বানিজ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাঙ্কের আবশ্যকতা কত বেশী— আমেরিকা, ইংলন্ড, জার্ম্মেনী, ফ্রান্স,

Dhaka University Institutional Repository

জাপান প্রভৃতি সমৃদ্ধ দেশসমূহের ইতিহাস পাঠে তাহা জানা যায়। আমাদের দেশের হিন্দু সম্প্রদায় ব্যাঙ্কিং এর দিক দিয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু বাঙলার এত বড় সম্প্রদায়— মুছলমান,— আজ পর্যন্ত একটা ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারে নাই। ইহা হইতে অলসতা ও কর্ম্মবিমুখতা আর কি হইতে পারে।"[১৪৮]

মুসলমান সমাজের অর্থশক্তি বৃদ্ধি করার লক্ষে পত্রিকাটির প্রস্তাব ছিল ঃ "আমাদের সমাজে যে অর্থ বিক্ষিপ্ত এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা কেন্দ্রীভূত করিলে বহু ব্যাঙ্ক চলিতে পারে। ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া কৃষক ও নূতন শিল্পীদিগকে মূলধন সরবরাহ করিতে হইবে।"[১৪৯] বেকার সমস্যার সমাধান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে সমাজে সকল পেশার গুরুত্ব অপরিসীম। এ উদ্দেশ্যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের যুবকদের মত মুসলমান যুব সম্প্রদায়ও যাতে শুধুমাত্র চাকরীর আশায় বেকার হয়ে বসে না থেকে প্রয়োজনবোধে স্বর্ণকার, কর্মকার, চিত্রকর, এমনকি, কবিরাজী পেশা গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ না করে সে ব্যাপারেও পত্রিকাটিতে বলা হয়েছিল।[১৫০]

চিত্রবিদ্যা শিক্ষালাভ করে অর্থ উপার্জনের সুপরামর্শ দেওয়া হয়েছিল *সওগাত* পত্রিকায়। পত্রিকাটিতে দেখানো হয়েছিল যে, চিত্রবিদ্যা বিভাগে ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান ও ললিতকলা শাখায় শিক্ষালাভ করলে 'কর্ম্মাভাবে বসিয়া থাকার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে'। পত্রিকাটিতে মুসলমান শিক্ষার্থীদের প্রতি আশা রাখা হয়েছিল যে, তারা এই শাখাগুলিতে শিক্ষালাভ করে অর্থ উপার্জনের দ্বারা বেকার সমস্যা লাঘবে সক্ষম হবে।[১৫১]

মুসলমান সমাজকে তাদের সম্ভ্রম রক্ষা এবং প্রতিবেশী জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকবার জন্য ধন অর্জনের নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করে জাতিকে ধন-সম্পদশালী ও অর্থশালী হবার পথে উৎসাহিত করবার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল *রওশন হেদায়েৎ* পত্রিকায়। পত্রিকাটিতে মুসলমান সমাজের উদ্দেশ্যে তাই লেখা হয়েছিলঃ "ভ্রাতঃ! তোমরা যদি আবার সৌভাগ্যশালী হইয়া জগতের প্রভু হইতে চাও— তবে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বানিজ্য, তেজারতি, আড়ৎদারী ও দোকানদারী এবং কারিগিরিতে লাগিয়া যাও, ধনার্জ্জনে সচেষ্ট হও— আর উদাসিন থাকিও না! বড় বড় ফার্ম্ম, লিমিটেড, ট্রেডিং কোম্পানি, ষ্টোরস, ফার্ম্মাসী, কারখানা, কারবার খুলিয়া প্রাণপণে ধনবান, অর্থশালী, তেজশালী, বিত্তশালী ও প্রভাবশালী হইতে কোশেশ কর"।[১৫২] আর, স্বজাতির ব্যবসা যাতে স্বজাতির মধ্যে প্রসার লাভ করে সে বিষয়ে মুসলমান সমাজকে বিশেষভাবে মনোযোগী হবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল পত্রিকাটিতে।[১৫৩]

মুসলমান সমাজের অভাব ও দৈন্য সম্পর্কে মুসলিম জনগণকে অবহিত করার উপযুক্ত মাধ্যম হল সিনেমা স্থাপন এবং নাট্যাভিনয়। শুধু তাই নয়, চলচ্চিত্র শিল্পের মাধ্যমে বাঙলার মুসলমানদের ব্যাপক

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনও সম্ভব। তাই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সমাজের দৈন্য চিত্র প্রকাশের দ্বারা সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আর্থিক উন্নয়ন সাধনের জন্য *মাসিক মোহাম্মদীতে* আরও বলা হয়েছিলঃ "বর্ত্তমানে মুসলমানের অভাব ও দারিদ্র ইত্যাদিকে প্রকৃতরূপ দিয়া সমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইলে, সিনেমা স্থাপনে এবং নাট্যাভিনয়ে যত্নশীল হইতে হইবে। প্রচারের সুবিধার জন্য সিনেমা ও নাট্যাভিনয় অপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী কোন উপায় আজও উদ্ভাবিত হয় নাই। ....চলচ্চিত্র আজ দুনিয়ার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। চলচ্চিত্র শিল্পের দ্বারা আমাদের অর্থনৈতিক উপকারও সাধিত হইবে যথেষ্ট পরিমানে।"[১৫৪]

মুসলমান সমাজকে অর্থের অপব্যয় রোধ করে মিতব্যয়ী হবার জন্য লেখনীর মাধ্যমে সুপরামর্শ দেওয়া হয়েছিল *সওগাত* পত্রিকায়। লেখকের মতে, মুসলমান সম্প্রদায় অতিশয় ভোজন বিলাসী হবার কারণে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য অর্থ সঞ্চয় করতে সমর্থ হয় না। এর ফলে সমাজের কৃষক, শিল্পী থেকে আরম্ভ করে শিক্ষিত চাকুরীজীবি সম্প্রদায়ও পর্যন্ত দিন দিন অর্থনৈতিক দূর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য গল্প-সাহিত্য রচয়িতাগণকে লেখনীর মাধ্যমে দস্তুরমত আন্দোলন শুরু করতে হবে। সুতরাং,"যাঁহারা সমাজের কল্যাণ চিন্তা করেন, এ অবস্থার প্রতীকারে যত্নবান হওয়া তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য"।[১৫৫]

অর্থ সৃষ্টি করতে পারলে অর্থকষ্ট দূরীভূত করা সম্ভব। আর এ জন্য 'শ্রম ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন' বলে *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছিল।[১৫৬]

চ. নারীমুক্তি

মুসলমান সমাজে নারী জাতিকে শিক্ষা বিমুখ করে রাখার জন্য সমাজের অর্দ্ধাংশ নারী জাতি শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসর ছিল— যা সমাজের উন্নতিকে অনেকখানি ব্যহত করে। মুসলমান সমাজের দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের দৃষ্টি এই বিষয়েও সচেতন ছিল। তাই, এ ব্যাপারে তাদের অভিমত লেখনীর মাধ্যমে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাগুলিতে তুলে ধরেছিলেন।

স্ত্রী-শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে মোসাম্মাৎ রিজিয়া খাতুন *শরিয়ত* পত্রিকাটিতে বলেছিলেনঃ "যে জাতির ভিতর স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত নাই সে জাতির উন্নতি কখনও সম্ভবপর নয়"।[১৫৭]

স্ত্রী-শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় বিষয়টিকে ধর্মের দোহাই দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য মুসলমান অভিভাবকদের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে পত্রিকাটিতে বলা হয়েছিলঃ "কিন্তু হায়! এখন "স্ত্রী-শিক্ষা" কথাটা শুনিবামাত্রই আমাদের অভিভাবকগণ তীব্র

Dhaka University Institutional Repository

অসম্মতি জানাইয়া তাহাদের কল্পিত শরিয়ত ঠিক রাখেন; কিন্তু শরিয়তের বিধান ঠিক রাখিয়া কি শিক্ষা লাভ করা যায় না? ধর্ম্মকে চিনিবার প্রকৃষ্ট উপায় যে শিক্ষা, তাঁহারা কি তাহা জানেন না।"[১৫৮]

"জগতের ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, মুসলমান দ্বারাই জগতে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার সাধন হইয়াছিল"— বলে পত্রিকাটিতে উল্লেখ করা হয়েছিল।[১৫৯]

এ ব্যাপারে মুসলমান সমাজের অজ্ঞতাকে চিহ্নিত করে পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছিলঃ "আমরা অজ্ঞ তাই আমাদের ভাল-মন্দ বিবেচনা করিবার ক্ষমতা নাই"।[১৬০]

সমাজের কাছে আকুল আবেদন জানিয়ে *মোসলেম ভারত পত্রিকায়* তাই বলা হয়েছিলঃ "জ্ঞান শক্তিহীনের শক্তি, দুর্ব্বলের বল, মূকের ভাষা, এহেন দান হইতে নারীকে বঞ্চিত রাখিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিও না।"[১৬১]

"মায়ের জাতি না জাগিলে দেশ জাগে না, মাতৃশক্তি উদ্বুদ্ধ না হইলে জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না"..... বলে *বুলবুল*, পত্রিকায় সমাজের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করা হয়েছিল।[১৬২]

এ প্রসঙ্গে নজরুল ইসলাম এক অভিভাষণে মুসলিম তরুণ ছাত্র সমাজের কাছে আহবান জানিয়ে বলেছিলেন ঃ "সমাজের স্তরে স্তরে, তার গোপনতম কোণে কোণে, বোরকার অন্তরালে, আবরুর মিথ্যা আবরণে যে আবর্জ্জনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে তার নিরাকরণ কর। তোমরা অনাগত যুগের মশালবর্দ্দার তোমাদের অর্দ্ধেক আসন ছেড়ে দাও কল্যাণী নারীকে"।[১৬৩]

নারীর মুক্তি এবং মঙ্গলের জন্য একটি স্বতন্ত্র নারী সাহিত্য সৃষ্টির আবশ্যকতা তুলে ধরে *মোসলেম ভারত* এ জোর দিয়ে বলা হয়েছিল ঃ "শিক্ষা কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়া নারী সমাজকে সাধারণভাবে শিক্ষিতা করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র নারী সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। এ জন্য বহু নারী লেখিকা চাই। নারী জাতির জন্য বর্ত্তমান সময়ে ইহাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা হইবে।"[১৬৪]

নারীদের উদ্দেশ্যে *জাগরণে* বলা হয়েছিল ঃ "মেয়েদের আত্ম নির্ভরশীলা হ'য়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আমাদের দূরদর্শিনী সুশিক্ষিতা ভগিনীগণকে অগ্রবর্ত্তিনী হয়ে তাদের জ্ঞানরূপ সোনার কাঠির স্পর্শে আমাদের প্রাণহীন দেহে প্রাণ দিতে হবে"।[১৬৫]

আল্লেসা, পত্রিকাতে নারী জাতিকে সমাজের উন্নতির ভিত্তি হিসাবে উল্লেখ করে জোর দিয়ে তাই বলা হয়েছিল ঃ "ন্যায়ের সুক্ষ তুলাদন্ডে কোন জাতির উন্নতির বিষয় সুক্ষভাবে বিচার করলে ইহা সকলকেই ঘাড় নোয়ায়ে একবাক্যে স্বীকার করতে হবে যে মাতৃ জাতিই সমাজের উন্নতির ভিত্তি"।[১৬৬]

ধর্মে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য বিদ্যা অর্জন অবশ্যকরণীয় হলেও, মৌলবী মোল্লাগণের সে আদেশের

Dhaka University Institutional Repository

অপব্যাখ্যা মুসলমান নারী সমাজকে জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে বিমুখ করে রেখেছিল। এ ব্যাপারে *আন্নেসা'য়* আরও উল্লেখ করা হয়েছিল ঃ "ধর্ম্মের বিধান অমান্য করিয়া কুসংস্কার বশে নারী জাতীকে গৃহের কোণে আবদ্ধ রাখিয়া আধুনিক মোসলেম সমাজ তাহার উন্নতির মূলে নিজেই কুঠারাঘাত করিতেছে"।[১৬৭]

স্ত্রী শিক্ষার প্রচলনের ব্যাপারে মুসলমান সমাজকে সচেতন ও যত্নবান হবার আহবান জানিয়ে *প্রভাকর* পত্রিকাতে তাই লেখা হয়েছিল ঃ "তাই বলি, ভ্রাতৃগণ! স্ত্রী জাতির এই অভাব মোচনে আমাদিগের আর উদাসীন থাকা উচিত নহে। এখন প্রাণপণ শক্তিতে সকলের এই সামাজিক মহা অভাব দূরীকরণ নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সমাজে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন না হইলে কদাপি সমাজোন্নত হইবে না এবং আমরাও কখন দেশস্থ অপরাপর সমাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইব না। তাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, সমাজ! কাল বিলম্ব না করিয়া অচিরে স্ত্রী শিক্ষায় যত্নবান হও"।[১৬৮]

নারী জাতিকে শিক্ষিত করে তুলবার জন্য সমাজের সর্বস্তরের জনগণের প্রতি এগিয়ে আসার আহবান রেখে *হেদায়াত* পত্রিকাতে লেখা হয়েছিল ঃ "অতএব আমাদের নারীকুলের শিক্ষার জন্য তুমুল ও বিপুল আন্দোলন চাই। পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে জানানা স্কুল, মাদ্রাছা, মোক্তব প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সমাজ নেতা, মৌলবী-মুন্‌শী, যুবক ও ছাত্র বন্ধুদের কি মাতিয়া উঠিবার প্রাণ নাই? আশাকরি, স্ত্রীশিক্ষার জন্য সকলেই আল্লাহ রছুলের নামে প্রাণপাতে অগ্রসর হইবেন"।[১৬৯]

সমাজের উদ্দেশে *সহচর* এ প্রস্তাব রাখা হয়েছিল ঃ "নগরের প্রত্যেক অংশে, গ্রামের প্রতি পাড়ায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং যাহাতে বালিকাগণ প্রকৃত শিক্ষা পাইতে পারে, তাহারই উদ্যোগ করিতে হইবে।"[১৭০]

স্বীয় কন্যাদের সুশিক্ষায় মনোযোগী হবার জন্য স্ত্রীলোকদের প্রতি আবেদন জানিয়ে *সওগাত* এ লেখা হয়েছিল ঃ "কন্যার বিবাহের সময় যে টাকা অলঙ্কার ও যৌতুক ক্রয়ে ব্যয় করেন, তাহারই কিয়দংশ তাহাদের সুশিক্ষায় ও স্বাস্থ্য রক্ষায় ব্যয় করুন।"[১৭১] কারণ "আমরা চাই আমাদের ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য অধিকার ও স্বাধীনতা, যা থেকে আমাদিগকে বঞ্চিত করা হ'য়েছে। আমরা চাই আমাদের ব্যক্তিত্বের স্বীকার, চাই আমাদের নারীত্বের সম্মান"- বলে *ধূমকেতু* পত্রিকাটিতে জোর আহবান রাখা হয়েছিল।[১৭২]

আপন পরিবার ও প্রতিবেশী ভগিনীগণকে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব উচ্চ শিক্ষিত নারীদের একটি অন্যতম কর্ত্তব্য। এ ব্যাপারে *সহচর* এ শিক্ষিত নারীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে যথার্থই বলা হয়েছিল ঃ "তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, নারী শিক্ষার সৌধ তাঁহাদিগের দ্বারাই তৈয়ারী করিতে হইবে। তাহাদিগকেই আমরা আদর্শ দেখাইব এবং তাঁহারাই নারী-শক্তি জাগরণের প্রধান সহকারী হইবেন।"[১৭৩]

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে, "স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারই, আমাদের অন্যতম প্রধান ব্রত হওয়া উচিত। ইহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দান করা সকলেরই নিতান্ত প্রয়োজন। নারীদিগকে অবরুদ্ধ কারাগার হইতে মুক্ত করা, জ্ঞানালোক দ্বারা তাহাদের চক্ষু ফুটাইয়া দেওয়া এবং সৎ প্রবৃত্তিগুলির চর্চ্চা করিবার সুযোগ প্রদান করা আমাদের মনুষ্যত্বের অন্যতম আদেশ"- বলে পত্রিকাটিতে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছিল।[১৭৪]

পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে "জানানা স্কুল", মাদ্রাসা-মক্তব প্রতিষ্ঠা করে স্ত্রী শিক্ষার জন্য ব্যাপক আন্দোলনের আহবান জানিয়ে সমাজ নেতা,যুবদল ও ছাত্র বন্ধুদের উদ্দেশ্যে *রওশন হেদায়েৎ* পত্রিকাটিতে বলা হয়েছিল ঃ "এই স্ত্রীজাতিকে আগে অবসাদের ঘনিমা হইতে উৎসাহের নিলীমায় প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতে হইবে, তবেই আমাদের সুপ্রভাত সূচিত হইবে"।[১৭৫]

সমাজে সেই রকম নারী কাম্য যাঁর আদর্শ নারী সমাজকে অনুপ্রাণিত করে অন্ধকার হতে আলোর দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে এস. ওয়াজেদ আলি *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় তাই জোর দিয়ে বলেছিলেন ঃ "আমি যে আদর্শ মোসলেম নারীর কল্পনা করি, তিনি হবেন উম্মুল মোমেনিন, বিবি আয়েশা সিদ্দীকার মত; জ্ঞানে অগ্রণী, সমাজ সেবায় সকলের পথ প্রদর্শক, সাহসে দুর্জ্জয়া, সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য রণ-সাজে সজ্জিতা, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ গৃহিণী; ধর্ম্মের উপর, ইসলামের উপর অবিচলিত নিষ্ঠা; কল্যাণী নারীর মূর্ত্তিমতী বিগ্রহ। তাঁর আদর্শ যেদিন আমাদের নারী সমাজকে অনুপ্রাণিত করবে, সেদিন আমাদের নারী সমস্যার উচিত সমাধানও হয়ে যাবে"।[১৭৬]

মুসলমান সমাজে প্রচলিত স্ত্রীজাতির পর্দ্দা প্রসঙ্গেও পত্র-পত্রিকাগুলিতে যুক্তিসঙ্গত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। বস্তুতঃ মুসলমান ধর্মগুরু ও সমাজপতিগণের পর্দ্দা সম্পর্কে অপব্যাখ্যা স্ত্রীজাতিকে অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত করেছিল। এ বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ লেখনীর মাধ্যমে নারী সমাজের দুর্গতি পত্র-পত্রিকায় তুলে ধরেছিলেন এবং এ থেকে তাদের মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করেছিলেন।

পর্দ্দার দোহায় দিয়ে নারী সমাজের এক বৃহৎ অংশকে শিক্ষাগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখায় *জাল্-ইসলাহ* পত্রিকাটিতে ক্ষোভের সঙ্গে বলা হয়েছিলঃ "আমাদের দেশে এখন যে রকম পর্দ্দা প্রথার প্রচলন আছে, পর্দ্দা সেটা মোটেই নয় সেটা হল অবরোধ প্রথা।"[১৭৭]

ইসলাম নারীকে পর্দ্দার সঙ্গে যাবতীয় কার্যাবলী করবার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু শরিয়তের বিধান সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে মুসলমান সমাজ নারীকে শিক্ষা অর্জন পর্যন্ত করতে না দিয়ে সেই অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করে রেখেছিল। এ সম্পর্কে *মোয়াজ্জিন* পত্রিকায় তাই লেখা হয়েছিল ঃ "পর্দ্দার নামে অবরোধ করিয়া রাখিয়া আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে একেবারে অকর্ম্মন্য অপদার্থ করিয়া ফেলা হইয়াছে। খাঁটি

Dhaka University Institutional Repository

এছলামিক পর্দ্দা-নশীন অবস্থায় আমাদের নারীগণ, স্কুলে, কলেজে, মাদ্রাছায়, খেলার মাঠে, বক্তৃতা মঞ্চে, অফিসে, হাটে, বাজারে, যে কোন স্থানে শরিয়তের বিধানুযায়ী যাইতে পারেন। মুছলেম নারী পূর্ব্বকালে যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যন্ত গিয়াছেন, আহত সৈন্যদের সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছেন। আর আমরা আজ অজ্ঞ-অন্ধের ন্যায় কিছুই না বুঝিয়া 'শরিয়ত, শরিয়ত' বলিয়া চীৎকার করিতেছি; এমন কি পর্দ্দার খেলাফ হইবে ভাবিয়া মেয়েদের শিক্ষা পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিয়াছি,- আমরা খাঁটী মুছলমানই বটে!"[১৭৮]

অবরোধ প্রথা সম্পর্কে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মন্তব্য করেছিলেন ঃ "অবরোধ প্রথাকে প্রাণ ঘাতক কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের সহিত তুলনা করা যায়। যেহেতু তাহাতে বিনা যন্ত্রনায় মৃত্যু হয় বলিয়া লোকে কার্ব্বনিক গ্যাসের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবার অবসর পায় না, অন্তঃপুরবাসিনী নারী এই অবরোধ গ্যাসে বিনা ক্লেসে তিল তিল করিয়া নীরবে মরিতেছে"।[১৭৯]

সুতরাং, পর্দ্দা প্রথার অসঙ্গত চাপে পড়ে মুসলমান নারীরা কিরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিল সে বিষয় তুলে ধরে *জান্নেসা* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল ঃ "পর্দ্দা-প্রথার কঠোরতার মধ্যে পড়িয়া আমাদিগকে যে শুধু অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিতে হইয়াছে এমন নহে; আমরা সঙ্গে সঙ্গে অতুল স্বাস্থ্য সম্পদও হারাইয়াছি"।[১৮০]

গোঁড়া পর্দ্দা প্রথাকে সমাজের উন্নতির অন্তরায় হিসাবে চিহ্নিত করে *জাগরণ* পত্রিকায় সমাজের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল ঃ "কিন্তু এই গোঁড়ামী পর্দ্দা যতদিন পর্য্যন্ত ইসলাম জগত হইতে বিলুপ্ত না হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত ইসলাম নারী জগতে শিক্ষার স্বাধীনতা না দেওয়া হইবে, যতদিন রমণী চরিত্র এলেম আলোকে আলোকিত না হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত নারীগণ পুরুষের কার্য্যে তাহাদের বিমল স্পর্শ-বিস্তার না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত মোস্‌লেম কুলের উদ্ধার নাই"।[১৮১]

জাগরণ পত্রিকায় মিস্ ফজিলতুন্নেসা এম-এ তাঁর 'মুস্‌লিম নারীর জাগরণ' নামক প্রবন্ধে যথার্থই বলেন ঃ "শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে পর্দ্দার নামে যে অবরোধ প্রথা চল্‌ছে সেটা নারী হত্যার জন্যে সব অস্ত্রের সেরা অস্ত্র। ঐ অস্ত্রটী নারীর শিক্ষা ও জ্ঞানার্জ্জনের অবস্থা বিশেষে জীবিকার্জ্জনেরও অন্তরায়। অবরোধ ও শিক্ষাহীনতা নারীকে মৃত্যু পথের যাত্রী করেছে।

যারা নারীর জ্ঞানের আলোক বন্ধ করেছেন জেগে উঠে আজ তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই জ্ঞানার্জ্জন এবং জ্ঞান মন্দিরের দ্বার চির অবারিত করতে হবে।"[১৮২]

পুরুষের শক্তি বৃদ্ধির জন্য জগতের কর্মক্ষেত্রে নারীকে এগিয়ে আসবার সুযোগ দানের লক্ষে *সাধনা* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল ঃ "নারীকে আর খর্ব্ব দুর্ব্বল ছোট করিয়া রাখিলে চলিবে না— যতই সে দুর্ব্বল ক্ষুদ্র

Dhaka University Institutional Repository

হইবে ততই পুরুষ ক্ষুদ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে—যতই সে বড় হইবে— জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে সমভাবে পুরুষের হাতে হাত দিয়া বিপুল উৎসাহে অফুরন্ত জ্ঞানান্বেষণের জন্য পর্দ্দার বাহিরে আসিয়া পড়িবে ততই পুরুষের শক্তি বর্দ্ধিতহইবে।''[১৮৩]

স্ত্রী জাতির স্বাধীনতা সম্বন্ধে ইসলাম ধর্মে যে সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তার উল্লেখ করে *সওগাত* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল ঃ "ইসলাম বলিতেছে, নারী! তুমি স্বভাবতই কোমলা ও কমনীয়া। তথাপি তুমি তোমার স্বামী, পিতা, ভ্রাতা, প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণের সহিত হজ্বব্রত সম্পাদনার্থ মক্কায় গমন করিতে পার। তোমার হস্তের মনিবন্ধ পর্য্যন্ত কুন্তলরাজির নিম্ন হইতে কর্ণমূলের শেষ এবং পায়ের গোড়ালির উপরিভাগ পর্য্যন্ত অনাবৃত রাখিয়া, তুমি ইচ্ছা করিলে স্বাধীনভাবে বিচরণ নামাজে যোগদান বা সভা সমিতিতে উপস্থিত হইতে পার।'

পাঠক, ইহা হইতে অনুমান করিতে পারিবেন বর্ত্তমান সভ্যতায় নারীর স্বাধীনতার মূলে কতটুকু ইস্‌লামিক প্রভাব বিদ্যমান"।[১৮৪] অতএব, "এই মহা জাগরণের যুগে ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে গৃহে বসিয়া থাকা আমাদের অনুচিত। ইসলামের বিধানানুসারে দেশের, জাতির ও ধর্ম্মের কাজে নিজকে যথাশক্তি নিয়োজিত করাই কর্ত্তব্য"— বলে *বার্ষিক সওগাত* পত্রিকায় লেখিকা শামসুন নাহার অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।[১৮৫]

ছ. রাজনীতি

রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতীয় মুসলমানদের যে পশ্চাৎপদতা সে ব্যাপারেও মুসলমানদের সচেতন করে তোলার জন্য বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলিতে সুচিন্তিত লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। পত্র-পত্রিকাগুলির মাধ্যমে রাজনীতি বিষয়ে মুসলমানদের অনগ্রসতার কারণ এবং পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায়ের যে অগ্রসরতা তা তুলনামূলকভাবে আলোচনা করে দেখানো হয়েছিল।

অতীতে মুসলমানগণ শাসনক্ষেত্রে যে গৌরবময় স্থানের অধিকারী ছিল পত্রিকাগুলির মাধ্যমে সে কথারও উল্লেখ করে অতীতের উদাহরণ হতে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের স্বস্থানে ফিরিয়ে আনতেও জোর আহবান জানানো হয়েছিল। এ জন্য পত্র-পত্রিকাগুলিতে রাজনীতি বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনা, প্রবন্ধ, কবিতা এবং চিত্র প্রকাশ করা হয়েছিল।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত হবার পর তারা মৃতপ্রায় এক জাতিতে পরিণত হয়েছিল। এই মৃতপ্রায় জাতিকে উজ্জীবিত করার লক্ষে ১৩৪৮ সালের ঈদ সংখ্যা আজাদ পত্রিকায় 'পলাশী হইতে পাকিস্তান' নামক প্রবন্ধে আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছিলেন ঃ "১৭৫৭ সালে পলাশীর

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাসঘাতকতা এদেশের মুসলমান জাতিকে শুধু যে রাজ্য হারা করিয়াছে তা নয়, জাতি হিসাবে তাকে জীবন্মৃতও করিয়া ফেলিয়াছে। রাজ্যহারা হওয়ায় দুঃখ ও দুর্ভাগ্য যত শোচনীয়ই হোক, জাতি হিসাবে জীবন্মৃত হওয়ার চাইতে তা কিছুতেই বেশী নয়। রাজ্যহারা হইয়াও যারা জাতি হিসাবে জীবন্ত হইয়া টিকিয়া থাকিতে পারে, সাময়িকভাবে রাজ্য হারানো তাদের তেমন উদ্বেগের কারণ হইতে পারে না। কারণ জীবন্ত জাতির পক্ষে রাজ্য ফিরিয়া পাওয়া তেমন কঠিন ব্যাপার নয়— অসম্ভব ব্যাপার তো নয়ই। কিন্তু রাজ্য হারানোর ফলে জাতি হিসাবে যাদের মেরুদন্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তাদের আর উদ্ধারের উপায় নাই— তারা নিশ্চিতভাবে মৃত্যুর পথে পা বাড়াইয়াছে।''[১৮৬]

এদেশে বিদেশী তথা বৃটিশ শাসনের ব্যাপারে হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মনোভাব এবং অবস্থান সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করে *আজাদ* পত্রিকায় দেখানো হয়েছিল যে, ঃ "জ্ঞানে, বীর্য্যে, সংস্কৃতিতে মহিমময় নয়টি রাজবংশের যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা সসাগরা ভারতবর্ষে সুদীর্ঘ এক সহস্র বৎসর যাঁরা বিপুল বিক্রমে শাসন-দন্ড পরিচালনা করেছেন, ১৮৫৭ সনের পরাজয়ের ফলে তাঁদের অস্তিত্বই বুঝি পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। .... সেদিনকার সেই জীবন-মরণ সংগ্রামের দিনে সবচেয়ে মারাত্মক ও সবচেয়ে বেদনাদায়ক ব্যাপার ছিল এই যে, ভারতের জনসংখ্যার বিরাট অংশ— সম্পদে বিপদে সহস্র বৎসর মুসলমান যাদের পার্শ্বে দাড়িয়েছে, তারা সেদিন বিরুদ্ধ ও বিদেশী শক্তির প্রতিই আসক্তির পরিচয় দিয়েছে।''[১৮৭] পত্রিকাটিতে এ সম্পর্কে আরও বলা হয়েছিল ঃ "ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুসলমান সেকালে বিদেশের সবকিছুর সঙ্গেই অসহযোগ ঘোষণা করেছিলেন। ইংরেজ এদেশে শুধু পরাধীনতার জিঞ্জির নিয়ে আসে নাই। একসঙ্গে নিয়ে এসেছে পরাধীনতা আর আধুনিকতা। সে কালের মুসলিম নায়করা (সিপাহী যুদ্ধ ও ওহাবী যুদ্ধের নায়করা) একই সঙ্গে পরাধীনতা ও ইংরেজ পরিকল্পিত আধুনিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন।''[১৮৮] এরফলে বাঙলার মুসলমানদের জীবনে যে দুরবস্থা নেমে আসে সে কথা উল্লেখ করে *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল ঃ "ভারতের অন্য সব প্রদেশ অপেক্ষা বাংলার মুসলমানের দুর্দ্দশা পৌঁছিয়াছিল চরম সীমায়। দেড়শত বৎসরের মধ্যে তাঁহারা শিক্ষিত ও ভদ্রের তালিকা হইতে একেবারে অশিক্ষিত ও অভদ্রের তালিকায় নামিয়া গিয়াছিলেন।''[১৮৯]

ইসলাম দর্শন পত্রিকাটিতে তাই লেখা হয়েছিল ঃ ".... এখন মুসলমানের আর সে দিন নাই। এখন মুসলমানের দিকে চাহিলে দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়- চক্ষু স্থির হয়। এখন মুসলমান আত্মবিস্মৃত, হেয়, পদদলিত জাতি।''[১৯০]

পতিত মুসলমান জাতির উদ্দেশ্যে আহবান জানিয়ে *হেদায়াত* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

"মোসলেম! মোসলেম! জাগরে মোসলেম
ত্যাগ'এ মোহ ঘুমের ঘোর,
কতকাল আর রবিরে পতিত
দলিত, মথিত, নিদ্রাভোর ?
....
সিংহের জাতি মোসলেম তোরা
সাজে কি তোদের শৃগাল সজ্জা।
সতত সহিতে বিজাতি বিপ্লব
হয় না কি তোদের আদৌ লজ্জা ?
....
ভীরুর ভূষণ ত্যজিয়া আজি
বীরের ভূষণ লওরে তুলে,
মায়া মমতার নাগ-পাশ ছিড়ি
মারিয়া কুঠার স্বার্থমূলে।
হৃদয়ে ধরিয়া দীপ্ত বাসনা
মুক্ত কররে, তোদের পথ।"[১৯১]

মুসলমানদের উদ্দেশ্যে *আহলে হাদিস* পত্রিকাটিতে বলা হয়েছিল ঃ 'ভাই তুমি ভাবিয়া দেখ, আমার বলিয়া তোমার কিছু আছে কি ? এই যে দুনিয়া যুড়িয়া নবজাগরণের এক বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, কত দলিত, মথিত, পতিত জাতি দিকে দিকে পতাকা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে ভাই ইহার সংবাদ কি কিছু রাখ ?"[১৯২] পত্রিকাটিতে আরও লেখা হয়েছিল ঃ "ভাই তুমি একটু উঠিয়া দাঁড়াও আবার রাজ্য তুমি ফিরিয়া পাইবে, এতদিন যে তোমার শত্রু ছিল, সেও তখন হীন, ক্ষীণ, দীন, মলিন, নিষ্প্রভ ও জড়সড় হইয়া তোমার নামে মস্তক অবনত করিবে, দুদিন পরে দেখিবে, তোমার সেই লুপ্ত, গুপ্ত, সুপ্ততেজ সমুদ্ভাসিত হইয়া তোমার অদৃষ্টফলককে আলোকিত করিতেছে।"[১৯৩]

মুসলমানদের রাজনৈতিক মুক্তি লাভের জন্য *বার্ষিক সওগাত* এ পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল ঃ "আধুনিক বৈষয়িক শিক্ষালাভ করিবার পর জীবন-কর্ম্মে উন্নতিলাভ করিতে হইলে আমাদের পরাধীনতা বিদূরীত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এজন্য অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত মুসলমানদিগকেও রাজনৈতিক মুক্তি সাধনার আন্দোলনে যোগদান করিতে হইবে।"[১৯৪]

পতিত মুসলিম সমাজ আবার যাতে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হয় তার জন্য *মোয়াজ্জিন* এ বলা হয়েছিলঃ "এই সাধনায় চাই অগণিত সাহিত্যিক গায়ক, পন্ডিত, সত্যের তপস্বী এবং প্রচুর অর্থ- অগণিত অর্থ। নির্ভীক চিন্তা, নির্ভীক চিত্ত, স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবনের বল, সত্যের সেবক, স্বার্থ ও বিলাসিতা বর্জ্জিত বীর, জ্ঞানের তপস্বী অফুরন্ত মূল্যবান সুলভ সাহিত্য!— নারী শিক্ষা!-

Dhaka University Institutional Repository

নারী শিক্ষা!!"[১৯৫]

স্বসমাজকে এ জন্য কর্ম্মনিষ্ঠ হবার আহবান জানিয়ে *নূর* পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছিলঃ "সুতরাং আমাদের নবীন প্রচারক এবং শিক্ষিত লোকদিগের জাতির হৃদয়ে নব নব চিন্তা ও নব নব কর্ম্মের ধারা প্রবাহিত করিয়া দেওয়াই হইতেছে পরম কর্ত্তব্য। আমাদের পতন হইয়াছে ধর্ম্মনিষ্ঠার অভাবে নহে— শুধু কর্ম্মনিষ্ঠার অভাবেই।"[১৯৬]

জাগরণ পত্রিকায় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছিলঃ "তবে আশা, এই জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, আমরাও হয়ত একদিন পাশ ফিরে তন্দ্রা বিচ্যুত হ'য়ে দেখ্‌ব, আমাদের জাগরণের পূর্ব্বাচলে উষার অগ্রদূত ছিলেন কা'রা।"[১৯৭]

মুসলমান সাংবাদিক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সুচিন্তিত ও সমাজ সংস্কারমূলক লেখনীর আঘাতে সমাজ ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলে *সওগাত* পত্রিকায় উচ্ছ্বাসের সঙ্গে মন্তব্য করে লেখা হয়েছিলঃ ".... মুসলিম বঙ্গ আজ ধাপে ধাপে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। চিন্তার স্থবিরতা দূর হইলেই সমাজের সম্মোহিত অবস্থা ফমিয়া যাইবে। সম্মোহিত অবস্থা কাটিয়া গেলেই বঙ্গ-মুসলিম আত্মশক্তির উৎসের সন্ধান পাইবে। তখন বঙ্গ-মুসলিমের দুর্জ্জয় গতিবেগে বাধা দেয় কার সাধ্য? আমরা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় আছি।"[১৯৮] আর তাই, যাবতীয় জড়তা,অবসন্নতা কাটিয়ে উঠে কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তে স্বসমাজের সকলের উদ্দেশ্যে *সাধনা* পত্রিকায় তাই আহবান জানানো হয়েছিল ঃ "সময় আসিয়াছে, ভাগ্য পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে, এখন আর হেলায় সময় কাটাইবার অবসর নাই। সকলেই একযোগে এই পুনরুত্থান যজ্ঞ সাধনে অগ্রসর হও"।[১৯৯]

বাংলার এই সকল মুসলমান সাংবাদিকের সীমিত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা বলিষ্ঠভাবে বাঙালি মুসলমানদের যাবতীয় সমস্যাবলী সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন সমাজ উন্নতির পশ্চাতে সংবাদপত্রের আবশ্যকতা কতখানি। অনগ্রসর, উদাসীন, অলস ও নির্লিপ্ত বাঙলার মুসলমানদের সকল আলস্য পরিহার করে তাদেরকে কর্মপথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আহবান জানিয়ে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন মতামত ও পরামর্শ সাময়িকপত্রগুলিতে তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. সম্পাদকীয় ঃ *মোয়াজ্জিন*, ৪র্থ বর্ষ/১ম সংখ্যা/অগ্রহায়ণ/১৩৩৯/পৃ:৫১।

২. সম্পাদকীয় ঃ *ঐ*, ৬ষ্ঠ বর্ষ/৩য় সংখ্যা/আষাঢ়/১৩৪০/পৃ:৭৪।

৩. বার্ষিক বিবরণীঃ *শিখা*, ১ম বর্ষ/১৩৩৩/পৃ:২৬।

৪. রিয়াজ, কলিকাতা মাদ্রাসা, 'মোছলেম জাগরণ,' *আহলে হাদিস* ৪র্থ বর্ষ/১৪শ সংখ্যা/চৈত্র/ ১৩৩৭/পৃ:৮।

৫. অভিভাষণ ঃ খান বাহাদুর নাসির উদ্দীন আহমদ, এম-এ, *শিখা*, ৪র্থ বর্ষ/১৩৩৭/পৃ:১৭।

৬. রিয়াজ, 'মোছলেম জাগরণ', *আহলে হাদিস*, প্রাগুক্ত।

৭. যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?, *ঐ*, ১৯শে অগ্রহায়ণ/১৩৩৬/পৃ:৯।

৮. এ,এস,এম, রফিক্-উদ্দীন, 'তরুণ মুস্লিমের কর্তব্য', *হেদায়াত*, ৫ম বর্ষ/১ম সংখ্যা/অগ্রহায়ণ/পৃ: ১০-১১।

৯. এম, হেরাজুল হক্ মিঞা, 'স্ত্রী-শিক্ষা ও জাতীয় উন্নতি' *হেদায়াত*, ১ম বর্ষ/৫ম সংখ্যা/জ্যৈষ্ঠ/ ১৩৪৩/পৃ: ৯৫।

১০. এসলামাবাদী, "কোর্আনই উন্নতির সোপান", *আল-এস্লাম*, ১ম ভাগ/৯মসংখ্যা/পৌষ/১৩২২/ পৃ:৫২৩।

১১. সম্পাদক, 'যুগপ্রোত', *ইসলাম প্রচার*, ২য়বর্ষ/৫ম সংখ্যা/কার্ত্তিক/১৩৪২/পৃ:১০২।

১২. মৌঃ হবিবর রহমান ফুকুরাবী- কলিকাতা মাদ্রাসা, *ঐ*, *শরিয়ত*, ২য় বর্ষ/৯ম সংখ্যা/পৌষ/১৩৩২/পৃ: ২১৩।

১৩. *ঐ*।

১৪. *ঐ*, পৃ: ২১৪

১৫. খান বাহাদুর নাসিরউদ্দীন আহমদ এম-এ, বি-এল, 'যুক্তিবাদ ও ইসলাম', *জয়তী*, ১ম বর্ষ/১ম সংখ্যা/ বৈশাখ/ ১৩৩৭/পৃ: ৩৪।

১৬. চৌধুরী মোহাম্মদ শামসুর রহমানঃ 'কোরবাণী', *শরিয়ত*, ২য় বর্ষ/৩য় সংখ্যা/আষাঢ়/১৩৩২/পৃ: ৫৫।

১৭. খান বাহাদুর নাসির উদ্দীন আহমদ,'যুক্তিবাদ এ ইস্লাম', *জয়তী*, প্রাগুক্ত।

১৮. মৌঃ হবিবর রহমান ফুকুরাবী- *ঐ*, *শরিয়ত*, প্রাগুক্ত।

১৯. খান বাহাদুর নাসির উদ্দীন আহমদ,'যুক্তিবাদ ও ইস্লাম', *জয়তী*, প্রাগুক্ত।

২০. মৌলবী মুহম্মদ আবদুল্লাহ্, 'বিপ্লবের সাধনা', *তবলীগ* ২য় বর্ষ/৩য় সংখ্যা/ভদ্র/১৩৩৫/পৃ: ৮৫।

২১. উপরোক্ত, পৃ: ১-৩।

Dhaka University Institutional Repository

২২.মোহাম্মাদ ওয়াজেদ আলী,'সাড়া' *নূর*, ১ম বর্ষ/ ২য়-৩য় সংখ্যা/ফাল্গুন-চৈত্র/১৩২৬/পৃ: ১৬২।

২৩. *ঐ* ।

২৪.'মহৎ-জীবন', *সহচর*, ১ম বর্ষ/৬ষ্ঠ সংখ্যা/আষাঢ়/১৩২৯/পৃ:৪৩৯।

২৫. *ঐ*, পৃ: ৪৪৩।

২৬. *ঐ*, পৃ: ৪৪৮।

২৭.'জমইয়তে- ওলামায়ে বাঙ্গালার অনুরোধ-পত্র', *সুনীতি*, ৬ষ্ঠ বর্ষ/৮৩শ সংখ্যা/জ্যৈষ্ঠ/১৩৩৪/ পৃ: ১।

২৮.ইস্‌লামের সাম্য-নীতি ও ভ্রাতৃভাবঃ *মোসলেম দর্পণ*, ৩য় বর্ষ/১ম সংখ্যা/জানুয়ারী/১৯২৭/পৃ:১৯।

২৯.বাংলার মোসলেম সমাজ ঃ *সাপ্তাহিক আহলে হাদিস*, ৩য় বর্ষ/৩৬ সংখ্যা/১৮ই ভাদ্র/১৩৩৭/পৃ: ৮।

৩০.মোহাম্মদ এহিয়া খাঁ, "সমাজে সাম্য", *সাম্যবাদী*, ২য় বর্ষ/৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা/আষাঢ় ও ভাদ্র/১৩৩১/ পৃ: ১২৮।

৩১.ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, এইচ,এম,বি "মানুষের অপমান" *ঐ*, ১ম বর্ষ/১ম সংখ্যা/মাঘ/ ১৩২৯/পৃ: ১২-১৩।

৩২.এম, জাফর আহমদ বি,এ, "আব্বাসীয়া যুগে মুসলমানের জ্ঞান চর্চ্চা", *ইসলাম প্রচার*, ২য় বর্ষ/৫ম সংখ্যা/কার্ত্তিক/১৩৪২/পৃ: ৯৩।

৩৩. *ঐ*।

৩৪.কাজী আবদুল ওদুদ, এম-এ, 'সাহিত্যিকের সাধনা', *মোসলেম ভারত*, ১ম বর্ষ/১ম খন্ড/ প্রথম সংখ্যা/ বৈশাখ/১৩২৭/ পৃ:৪৮।

৩৫.মৌঃ হবিবর রহমান,'আহবান', *শরিয়তে এস্‌লাম*, ৩য় বর্ষ/৭ম সংখ্যা/শ্রাবণ/১৩৩৫/পৃ: ১৬৩।

৩৬.তরিকুল আলম, এম-এ, বি-এল, 'আমাদের শিক্ষা-সমস্যা', *মোস্‌লেম ভারত*, ১ম বর্ষ/২য় খন্ড/৫ম সংখ্যা/ফাল্গুন/ ১৩২৭/পৃ: ৭১২।

৩৭.হুমায়ুন কবির, 'জীবন ও ছাত্র-সমাজ', *বুলবুল*, ৩য় বর্ষ/৭ম সংখ্যা/কার্ত্তিক/১৩৪৩/পৃ: ৫৫৯।

৩৮.এম, হেরাজুল হক মিঞা, তাড়াশ-পাবনা, 'মিলন-সমস্যা', *রওশন হেদায়েৎ* ২য় বর্ষ/১ম সংখ্যা/ আশ্বিন/১৩৩২/পৃ: ১১।

৩৯.মৌঃ রইছ উদ্দিন আহমদ, 'শিক্ষা', *শরিয়তে এস্‌লাম*, ২য় বর্ষ/১ম সংখ্যা/মাঘ/১৩৩৩/পৃ: ১৪।

৪০.আবুল হুসেন, 'বাঙ্গালী মুসলমানের ভবিষ্যৎ', *জাগরণ*, ১ম বর্ষ/২য় সংখ্যা/জ্যৈষ্ঠ/১৩৩৫/পৃ: ৪৪-৪৫।

৪১.সম্মান-লাভের উপায়, *সাম্যবাদী*, ১ম বর্ষ/১ম সংখ্যা/মাঘ/১৩২৯/পৃ: ১০।

Dhaka University Institutional Repository

৪২.সমাজের উন্নতি, *ঐ*, ১ম বর্ষ/২য় সংখ্যা/বৈশাখ/১৩৩০/পৃ: ৪৮।

৪৩.এম, সেরাজুল হক্- তাড়াশ, 'মোছলমান সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা', *শরিয়তে-এস্‌লাম*, ৪র্থ বর্ষ/৭ম সংখ্যা/শ্রাবণ/১৩৩৬/পৃ: ১৫১।

৪৪.আশরাফ উদ্‌দীন আহমদ, বি-এ,'চিঠিপত্রঃ The mosque, Woking, Surrey, England', *মোয়াজ্জিন*, প্রাগুক্ত।

৪৫.আবুল হোসেন, 'আলোচনাঃ আমাদের কর্ত্তব্য কি', *সওগাত*, ৪র্থ বর্ষ/১ম সংখ্যা/আষাঢ়/১৩৩৩/ পৃ: ৪২।

৪৬.শেখ আবুল মন্‌সুর এলাহী বখ্‌শ, 'ছাত্রদের জাতীয় জীবন গঠন', *নূর*, ১ম বর্ষ/২য়-৩য় সংখ্যা/ফাল্গুন-চৈত্র/১৩২৬/পৃ: ১৭০।

৪৭.'পি,সি, রায়ের সাধনা ও সিদ্ধি', *সহচর*, ১ম বর্ষ/৬ষ্ঠ সংখ্যা/আষাঢ়/১৩২৯/পৃ: ৪১৯।

৪৮.চিন্তার ধারাঃ 'আরবী বিশ্ববিদ্যালয়', *নূর*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৪।

৪৯.*ঐ*, পৃ: ১৮৫।

৫০.সানয়িকী, 'মাতৃভাষায় শিক্ষাদান', *সহচর*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৮৯।

৫১.'পি,সি, রায়ের সাধনা ও সিদ্ধি', প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২০।

৫২.চিন্তার ধারাঃ 'বাঙ্গলা ভাষার অনাদর', *নূর*, প্রাগুক্ত,পৃ: ১৮৬।

৫৩.মোজাম্মেল হক, 'লাইব্রেরী', *মাসিক মোহাম্মদী*, ৩য় বর্ষ/১১শ সংখ্যা/ভাদ্র/১৩৩৭/পৃ: ৮৩৫।

৫৪.আবুল মোজাফ্‌ফর আহম্মদ, বি-এ, বি-সি-এল ব্যাব-এট-ল, 'মুসলিম সাহিত্য সমাজঃ সভাপতির অভিভাষণ', *সওগাত*, ৬ষ্ঠ বর্ষ/১০ম সংখ্যা/বৈশাখ/১৩৩৬/পৃ: ৬৮৭।

৫৫.*ঐ*।

৫৬.সৈয়দ আবদুর রব, 'এছলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা', *মোয়াজ্জিন*, ৪র্থ বর্ষ/৫ম সংখ্যা/চৈত্র/১৩৩৯/পৃ: ২০৪।

৫৭.সাদত আলী আখন্দ, 'পারিবারিক লাইব্রেরী', *সওগাত*, ৬ষ্ঠ বর্ষ/৭মসংখ্যা/মাঘ/১৩৩৫/পৃ: ৫০৩।

৫৮.আবুল মোজাফ্‌ফর আহম্মদ, বি-এ,বি-সি-এল ব্যাব-এট-ল, 'মুসলিম সাহিত্য সমাজঃ সভাপতির অভিভাষণ', *সওগাত*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৮৫।

৫৯.মোহাম্মদ লুত্‌ফর রহমান, মহানবীর উত্তরাধিকারিগণ', *মোসলেম ভারত*, ২য় বর্ষ/২য় খন্ড/ ১ম সংখ্যা/ ভাদ্র/১৩২৮/পৃ: ৬৭।

৬০.*ঐ*।

Dhaka University Institutional Repository

৬১.ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, এইচ,এম,বি "মানুষের অপমান" *সাম্যবাদী*, ১ম বর্ষ/১ম সংখ্যা/ মাঘ/ ১৩২৯/পৃ: ১৩।

৬২.মির্জা আলাউদ্দীন বে, 'ধর্ম্মগত উন্নতি ও উপায়', *আহ্‌মদী*, ২য় বর্ষ/৩য় সংখ্যা/আষাঢ়/১৩৩৩/পৃ: ৪৪।

৬৩.মুসলিম সংহতিঃ *জাগরণ*, ১ম বর্ষ/৯ম সংখ্যা/বৈশাখ/১৩৪৫/পৃ: ২।

৬৪.আবু ইউসুফ, 'মানব ও ইছলাম', *ঐ*, ১ম বর্ষ/৫ম সংখ্যা/ভাদ্র/১৩৩৫/পৃ: ১৮২।

৬৫.কৃষক ও ব্যবসা, *হেদায়াত*, ১ম বর্ষ/৩য় সংখ্যা/চৈত্র/১৩৪২/পৃ: ৪৭।

৬৬.আবদুল জব্বার, 'ইসলামের শিক্ষা', *সাধনা*, ২য় বর্ষ/১০ম সংখ্যা/মাঘ/১৩২৭/পৃ: ৩৬৬।

৬৭.মৌঃ শেখ আবদুল গফুর জালালী,'সাম্যবাদ', *সাম্যবাদী*, ১ম বর্ষ/১ম সংখ্যা/মাঘ/১৩২৯/পৃ: ২৬।

৬৮.অধ্যাপক মৌলবী মোহাম্মদ সানাউল্লাহ্, এম্-এ, 'সমাজ-বন্ধন', *ঐ*, ২য় বর্ষ/৩য় সংখ্যা/ বৈশাখ/ ১৩৩১/পৃ: ৯৭।

৬৯.ইয়াকুব আলী চৌধুরী, 'ইস্‌লামের ধারা', *আল্-এস্‌লাম*, ১ম বর্ষ/৯ম সংখ্যা/'পৌষ/১৩২২/পৃ: ৫৩৮।

৭০.সম্পাদকঃ যুগস্রোত, *ইসলাম প্রচার*, ২য় বর্ষ/৫ম সংখ্যা/কার্ত্তিক/১৩৪২/পৃ: ১০১।

৭১.আন্‌ওয়ার হোসেন, এম্-এ, 'অর্থনীতি ও জাতিভেদ', *মাসিক মোহাম্মদী*, ৫ম বর্ষ/৭ম সংখ্যা/ বৈশাখ/ ১৩৩৮/পৃ: ৪৯৬।

৭২.সম্পাদকঃ যুগস্রোত, *ইসলাম প্রচার*, ২য় বর্ষ/৫ম সংখ্যা/কার্ত্তিক/১৩৪২/পৃ: ১০১।

৭৩.মহিলা-মহ্‌ফেলঃ 'বঙ্গ-মোস্‌লেম সমাজে মহিলা জীবন', *মোয়াজ্জিন*, ১ম বর্ষ/২য় সংখ্যা/শ্রাবণ/ ১৩৩৫/পৃ: ৯৬।

৭৪.মওলবী নূর বখ্‌শঃ 'নিদ্রিত জাতি', *ছুন্নত অল্-জামায়াত*, ১০ম বর্ষ/৮ম, ৯ম সংখ্যা/শ্রাবণ-ভাদ্র/ ১৩৫০/পৃ: ১৮১।

৭৫.আবদুল গনি বি-এ,'আলেম সমাজে বেকার সমস্যা', *মোস্‌লেম দর্পণ*, ৩য় বর্ষ/৪র্থ সংখ্যা/এপ্রিল/ ১৯২৭/পৃ: ১৭৫।

৭৬.মোছলমান ও রাজনীতি, দৈঃ ছোঃ, *শরিয়তে এসলাম*, ২য় বর্ষ/৮ম সংখ্যা/ভাদ্র/১৩৩৪/পৃ: ১৮১।

৭৭.তমিজুর রহমান,'উত্থান ও পতন', *সাধনা*, ২য় বর্ষ/৫ম সংখ্যা/ভাদ্র/১৩২৭/পৃ: ১৭৮-১৭৯।

৭৮.বিবিধ প্রসঙ্গ ঃ 'আলেম সমাজের কর্ত্তব্য', *সওগাত*, ৪র্থ বর্ষ/৯ম সংখ্যা/ফাল্গুন/১৩৩৩/পৃ: ৬৫০।

৭৯.সম্পাদকীয় ঃ 'এ সমাজে কিছু স্থায়ী হয় না', *মোয়াজ্জিন*, ৪র্থ বর্ষ/১ম সংখ্যা/অগ্রহায়ণ/১৩৩৯/পৃ: ৫৪।

৮০.বিবিধ প্রসঙ্গ ঃ 'আলেম সমাজের কর্ত্তব্য', *সওগাত*, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৮১.মোহাম্মদ কে, চাঁদ, 'সুফী মরমী পন্থায় গীতবাদ্যের স্থান', সাধনা, ৩য় বর্ষ/৬ষ্ঠ সংখ্যা/আশ্বিন/ ১৩২৮/পৃ: ১৭৪।

৮২.ঐ।

৮৩.শেখ হবিবর রহমান, 'সঙ্গীত ও তাহার প্রভাব', *নূর*, ১ম বর্ষ/২য়-৩য় সংখ্যা/ফাল্গুন-চৈত্র/১৩২৬/পৃ: ১৫০।

৮৪.*ঐ*, পৃ: ১৫৩।

৮৫.অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ এম-এ, "পারিবারিক লাইব্রেরী" ও "উৎসব ও আনন্দ", *সওগাত*, ৬ষ্ঠ বর্ষ/ ৯ম সংখ্যা/চৈত্র/১৩৩৫/পৃ: ৬২৭।

৮৬.গোলাম মোস্তফা বি-এ,বি-টি,'ইসলাম ও সঙ্গীত', *মাসিক মোহাম্মদী*, ৪র্থ বর্ষ/৩য় সংখ্যা/পৌষ/ ১৩৩৭/পৃ: ১৮৬-১৮৭।

৮৭.*ঐ*, পৃ: ১৮৮-১৮৯।

৮৮.*ঐ*, পৃ: ১৮৯।

৮৯.রফিকুল ইসলাম, *আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪)*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃঃ ১২-১৩।

৯০.মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, 'জাতির উত্থান', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকা*, ১ম বর্ষ/৪র্থ সংখ্যা/মাঘ/ ১৩২৫/পৃঃ ৩৫২।

৯১.পৃঃ ২৯২।

৯২.মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ(এম,এ,বি-এল), 'আমাদের (সাহিত্যিক) দরিদ্রতা', আল-এসলাম, ২য় ভাগ/২য় সংখ্যা/ জ্যৈষ্ঠ/১৩২৩/ পৃঃ ৭৬।

৯৩.এম, রজব আলী-বেকার হোষ্টেল, 'ইসলাম ও বর্ত্তমান জগৎ',*শরিয়ত*, ২য় ভাগ/৭ম সংখ্যা/কার্তিক/ ১৩৩২/ পৃঃ ১৬৬।

৯৪.এম, সিরাজুল হক, 'জাতীয় সাহিত্য ও সমাজ', *ইসলাম-নূর*, ১ম বর্ষ/৩য় সংখ্যা/চৈত্র/১৩৩২/পৃঃ ৬২।

৯৫.কবিবর শেখ মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলী, 'বঙ্গীয় মোসলেম জাতীয় সাহিত্য', *শরিয়ত*, ২য় বর্ষ/৫ম সংখ্যা/ভাদ্র/১৩৩২/ পৃঃ ১১০।

৯৬.অধ্যাপক আবদুর রব চৌধুরী এম-এ, 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ', *জয়ন্তী*, ১ম বর্ষ/১১শ ও ১২শ সংখ্যা/ ফাল্গুন ও চৈত্র/১৩৩৭/পৃঃ ২৬৭।

৯৭.*ঐ*

Dhaka University Institutional Repository

৯৮.সৈয়দ এমদাদ-আলী, 'হিন্দু-মুসলিম', *বুলবুল*, ৩য় বর্ষ/৮ম সংখ্যা/অগ্রহায়ণ/১৩৪৩/পৃঃ ৬০৫।

৯৯.এম, সিরাজুল হক, 'জাতীয় সাহিত্য ও সমাজ', ই *সলাম-নূর*, প্রাগুক্ত।

১০০.*ঐ*

১০১.কবিবর শেখ 'মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলী', 'বঙ্গীয় মোসলেম জাতীয় সাহিত্য', *শরিয়ত*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯।

১০২.মওলবী নূরবখ্‌শ, 'নিদ্রিত জাতি', *ছুন্নত অল্-জামায়াত*', ১০ম বর্ষ/১০ম সংখ্যা/আশ্বিন।১৩৫০/পৃঃ ২১৩।

১০৩.খান বাহাদুর আবদুর রহমান খান্ এম,এ,বি,টি, 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ অভ্যর্থনা', *বুলবুল* ৩য় বর্ষ/ ৫ম সংখ্যা/ভাদ্র/১৩৪৩ পৃঃ ৩২২।

১০৪.অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ এম,এ,বি,এল, 'মুসলমানের সাহিত্য-সেবা', *ঐ*, ৩য় বর্ষ/৭ম সংখ্যা/কার্তিক/ ১৩৪৩/ পৃঃ ৫৪১।

১০৫.সিরাজী, 'আত্মত্যাগ ও জাতীয় উন্নতি', *নূর* ১ম বর্ষ/১ম খ্যা/মাঘ/১৩২৬/ পৃঃ ১২-১৩।

১০৬.মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ (এম,এ,বি,এল), 'আমাদের (সাহিত্যিক) দরিদ্রতা', *আল্-এসলাম*, ২য় ভাগ/২য় সংখ্যা/ জ্যৈষ্ঠ/১৩২৩/পৃঃ ৭৬।

১০৭.*ঐ*, পৃঃ ৮০।

১০৮.মৌঃ আমিনুল হক্ চৌধুরী, 'সাহিত্য', *আল্-ইসলাহ*, ১ম বর্ষ/৭ম,৮ম সংখ্যা/জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়/ ১৩৪০/পৃঃ ১৬০।

১০৯.মৌলবী এ,এফ,এম, আবদুল হক, 'সাহিত্যের সার্থকতা', *সাম্যবাদী*, ২য় বর্ষ/৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা/আষাঢ় ও ভাদ্র/১৩৩১/ পৃঃ ১২৫।

১১০.আবদুল মজিদ, 'বাঙলার মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য', *সওগাত* ৪র্থ বর্ষ/২য় সংখ্যা/শ্রাবণ/১৩৩৩/ পৃঃ ৬৫-৬৬।

১১১.অভিভাষণঃ কায়কোবাদ (বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মিলনের মূল সভার সভাপতির অভিভাষণ), *মোয়াজ্জিন*, ৫ম বর্ষ/২য় সংখ্যা/পৌষ/ ১৩৩৯/ পৃঃ ৮৯।

১১২.জাতীয় পত্রিকার আবশ্যকতা, *আহলে হাদিস*, ৩য় বর্ষ/১৭শ সংখ্যা/চৈত্র/১৩৩৬/পৃঃ ৫।

১১৩.মোহাম্মদ ইউসুফ, 'মুসলিম সংস্কৃতি ও বাঙলা সাহিত্য', *নওরোজ*, ৪র্থ বর্ষ/৬ষ্ঠ সংখ্যা/শ্রাবণ/১৩৫২/ পৃ: ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

১১৪.মোহাম্মদ আবদুল হক্, 'জাতীয় জাগরণী ও নজ্‌রুল', *আল্-ইসলাহ্*, ১০ম বর্ষ/২য় সংখ্যা/জ্যৈষ্ঠ/ ১৩৫৪/পৃ: ৫১।

১১৫.আবদুল জব্বার, 'মহানবী মোহাম্মদ(দঃ), *সাধনা*, ১ম বর্ষ/২য় সংখ্যা/জ্যৈষ্ঠ/১৩২৬/পৃ: ৫৮।

১১৬.আবদূল জলিল সিদ্দিকী, 'মানব ও ধর্ম্ম', *শরিয়ত*, ২য় বর্ষ/১ম সংখ্যা/বৈশাখ/১৩৩২/পৃ: ১৫।

১১৭.সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস রুমী, 'ইসলামের উত্থান ও পতন', *ইসলাম দর্শন*, ১ম বর্ষ/১ম সংখ্যা/ বৈশাখ/ ১৩২৭/পৃ: ২৫।

১১৮.*ঐ*।

১১৯.এ,এইচ, আবদুল আলীম- নছিরাবাদী, 'পতিত কেন ?', *শরিয়তে- এস্‌লাম*, ৪র্থ বর্ষ/৬ষ্ঠ সংখ্যা/ আষাঢ়/১৩৩৬/পৃ: ১৩১।

১২০.সম্মান লাভের উপায়, *সাম্যবাদী*, ১ম বর্ষ/১ম সংখ্যা/মাঘ/১৩২৯/পৃ: ১০-১১।

১২১.ইস্‌লামে অবৈধ অনুষ্ঠান, *মোসলেম দর্পণ*, ৫ম বর্ষ/৮ম সংখ্যা/আগষ্ট/১৯২৯/পৃ: ১।

১২২.মৌলবী মুহম্মদ তফাজ্জল হোসেন কুমিল্লায়ী- দেওবন্দ মাদ্রাসা, 'বাঙ্গালী মুসলমানদের প্রতি নিবেদন', *ইসলাম প্রচার*, ১ম বর্ষ/৯ম সংখ্যা/ফাল্গুন/১৩৪১/পৃ: ১০-১১।

১২৩.*ঐ*, পৃ: ১১।

১২৪.মোসাম্মাৎ আনোয়ারা বেগম, 'কোথায় পথ?', *শরিয়তে- এস্‌লাম*, ৪র্থ বর্ষ/১০ম সংখ্যা/কার্ত্তিক/ ১৩৩৬/পৃ: ২৩১।

১২৫.মওলানা মোহাম্মদ আলী, এম,এ-এল,এল,বি, 'মস্‌জেদ', ১ম বর্ষ/২য় সংখ্যা/ফাল্গুন/১৩৪২/পৃ: ৩৫।

১২৬.মোহাম্মদ আব্‌দুর রশীদ্, বি-টী, 'বুদ্ধির ও চিন্তার মুক্তির কথা', *নওরোজ*, ১ম বর্ষ/১ম খন্ড,১ম সংখ্যা/আষাঢ়/১৩৩৪/ পৃ: ৩৯।

১২৭.সৈয়দ আব্‌দুর রব, 'এছলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা', *মোয়াজ্জিন*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮২।

১২৮.প্রথম বর্ষের কার্য্যবিবরণ, *মোস্‌লেম দর্পণ*, ১ম বর্ষ/দ্বাদশ সংখ্যা/ডিসেম্বর/১৯২৫/পৃ: ১।

১২৯.হবিবুর রহমান ফরিদপুরী, 'সমাজের কথা', *ইসলাম-দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০।

১৩০.*ঐ*, পৃ: ৩১।

১৩১.মৌলবী মুহম্মদ তফাজ্জুল হোসেন কুমিল্লায়ী- দেওবন্দ মাদ্রাসা, 'বাঙ্গালী মুসলমানদের প্রতি নিবেদন', *ইসলাম প্রচার*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১।

Dhaka University Institutional Repository

১৩২.মোহাম্মদ আকরম খাঁ, তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলন, সভাপতির অভিভাষণ, *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, ১ম বর্ষ/৪র্থ সংখ্যা/মাঘ/১৩২৫/পৃ: ৩১৪।

১৩৩.মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, 'শিক্ষার কথা', *বুলবুল*, ২য় বর্ষ/২য় সংখ্যা/শ্রাবণ-আশ্বিন/১৩৪১/পৃ: ৯৯।

১৩৪.*ঐ*, পৃ: ১০৫-১০৬।

১৩৫.ইস্‌লাম প্রচারের আবশ্যকতা, *মোসলেম দর্পণ*, ৩য় বর্ষ/২য় সংখ্যা/ফেব্রুয়ারী/১৯২৭/পৃ: ৯৫।

১৩৬.এম, সেরাজুল হক, 'ইসলামের মৌলিকত্ব', *মোসলেম দর্পণ*, ৩য় বর্ষ/১২শ সংখ্যা/ডিসেম্বর/১৯২৭/ পৃ: ৪৯১।

১৩৭.আবদুল গফুর শ্রীহট্ট, 'ধর্ম্মের অধঃপতন', *আল্‌-এস্‌লাম*, ১ম ভাগ/১১শ সংখ্যা/ফাল্গুন/১৩২২/ পৃ: ৬৪২।

১৩৮.এম, সেরাজুল হক্ মিঞা, 'এছলাম ও অর্থনীতি', *রওশন হেদায়েৎ*, ২য় বর্ষ/৪র্থ সংখ্যা/মাঘ/১৩৩২/পৃ: ৬৯।

১৩৯.রকীবউদ্দিন আহ্‌মাদ এম,এ, 'বাঙ্গালী মুসলমানের বাল্যজীবন ও পরিণাম', *জাগরণ*, ১ম বর্ষ/৩য় সংখ্যা/আষাঢ়/১৩৩৫/পৃ: ৯৮।

১৪০.আবুল হোসেন, 'আলোচনাঃ আমাদের কর্ত্তব্য কি', *সওগাত*, ৪র্থ বর্ষ/১ম সংখ্যা/আষাঢ়/১৩৩৩/পৃ: ৪২।

১৪১.সামসের আলী খাঁ, 'মিলনের বাধা', *ঐ*, পৃ: ৪৫।

১৪২.এস, মাহ্‌মুদুর রহমান, 'মুসলিম বাংলার আর্থিক সমস্যা', *মাসিক মোহাম্মদী*, দশম বর্ষ/চতুর্থ সংখ্যা/ মাঘ/ ১৩৪৩/ পৃ: ২২৫।

১৪৩.*ঐ*।

১৪৪.*ঐ*, পৃ: ২২৬।

১৪৫.এম, সেরাজুল হক্, 'বঙ্গীয় মোসলমান পল্লী-সমাজ', *হেদায়াত*, ১ম বর্ষ/ ২য় সংখ্যা/ফাল্গুন/১৩৪২/পৃ: ৩০।

১৪৬.মোহাম্মদ আবদুর রশীদ বি,এ; বি,টী, 'বঙ্গ-মোস্‌লেমের দুরবস্থা ও তাহার প্রতিকার', *মোয়াজ্জিন*,১ম বর্ষ/১ম সংখ্যা/বৈশাখ/১৩৩৫/পৃ: ১৭-১৮।

১৪৭.এস, মাহ্‌মুদুর রহমান, 'মুসলিম-বাংলার আর্থিক সমস্যা', *মাসিক মোহাম্মদী*, ১০ম বর্ষ/৫ম সংখ্যা/ ফাল্গুন / ১৩৪৩ / পৃ: ৩১৩।

১৪৮.*ঐ*, ১০ম বর্ষ/৪র্থ সংখ্যা /মাঘ/১৩৪৩ / পৃ: ২২৯।

১৪৯.*ঐ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৩১২।

Dhaka University Institutional Repository

১৫০.*ঐ, প্রাগুক্ত*।

১৫১.বিবিধ প্রসঙ্গঃ 'সরকারী চিত্র বিদ্যালয় ও মুসলমান', *সওগাত*, ৪র্থ বর্ষ/ ৫ম সংখ্যা/ কার্ত্তিক/ ১৩৩৩/ পৃ: ৩৫৮।

১৫২.এম, ছেরাজুল হক্ মিঞা, 'এছলাম ও অর্থনীতি', *রওশন হেদায়েৎ, প্রাগুক্ত*, পৃ: ৭১-৭২।

১৫৩.খোঁকড়া শাখা জামিয়তের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন, *ঐ*, ২য় বর্ষ/৫ম সংখ্যা/ফাল্গুন/১৩৩২/পৃ: ৯১।

১৫৪.এস, মাহ্মুদুর রহমান, 'মুসলিম বাংলার আর্থিক সমস্যা', *মাসিক মোহাম্মদী, প্রাগুক্ত*,/পৃ:২৩০-২৩১।

১৫৫.বিবিধ প্রসঙ্গঃ 'মুসলমানদের ব্যয় বাহুল্য', *সওগাত*, ৪র্থ বর্ষ/৬ষ্ঠ সংখ্যা/অগ্রহায়ণ/১৩৩৩/পৃ: ৪৩৬।

১৫৬.এস, মাহ্মুদুর রহমান, 'বাংলার মুসলমানের অর্থ-সমস্যা', *মাসিক মোহাম্মদী*, ১০ম বর্ষ/৯ম সংখ্যা/ আষাঢ়/১৩৪৪/ পৃ: ৬৫৫।

১৫৭.মোসাম্মাৎ রিজিয়া খাতুন-খুলনা, 'স্ত্রী-শিক্ষা', *শরিয়ত*, ২য় বর্ষ/৪র্থ সংখ্যা/শ্রাবণ/১৩৩২/পৃ: ৮৬।

১৫৮.*ঐ*, পৃ: ৮৫।

১৫৯.*ঐ*।

১৬০.*ঐ*।

১৬১.মোহম্মদ লুত্ফর রহমান, 'নারীর কথা', *মোসলেম ভারত*, ২য় বর্ষ/২য়খন্ড-২য় সংখ্যা/আশ্বিন/ ১৩২৮/পৃ:৮২।

১৬২.শামসুন নাহার, 'রোকেয়া-জীবনী', *বুলবুল*, ৩য় বর্ষ/৮ম সংখ্যা/অগ্রহায়ণ/১৩৪৩/পৃ: ৫৭৩।

১৬৩.নজরুল ইসলাম, 'অভিভাষণ', *ঐ*, পৃ: ৫৯৮।

১৬৪.মোহম্মদ লুত্ফর রহমান, 'নারীর কথা', *মোসলেম ভারত, প্রাগুক্ত*, পৃ: ৮৫।

১৬৫.মিস্ ফজিলতুন্নেসা এম-এ, 'মুস্লিম নারীর জাগরণ', *জাগরণ*, ১ম বর্ষ/১ম সংখ্যা/বৈশাখ/১৩৩৫/পৃ: ২১।

১৬৬.মোহাং জোবেদ আলি, 'নারীর মুক্তি', *আন্নেসা*, ১ম বর্ষ/৮ম সংখ্যা/অগ্রহায়ণ/১৩২৮/পৃ: ১০০।

১৬৭.শাম্সুন্ নাহার, 'পর্দ্দা প্রথা ও স্ত্রী স্বাধীনতা', *ঐ*, ১ম বর্ষ/৯ম সংখ্যা/পৌষ/১৩২৮/পৃ: ১১২-১১৪।

১৬৮.'মোসলেম স্ত্রীজাতির বিদ্যা শিক্ষা', *প্রভাকর*, ২য় বর্ষ/১ম সংখ্যা/১৩১৯/পৃ: ১১।

১৬৯.এম, ছেরাজুল হক্ মিঞা, 'স্ত্রী-শিক্ষা ও জাতীয় উন্নতি', *হেদায়াত*, ১ম বর্ষ/৫ম সংখ্যা/জ্যৈষ্ঠ/ ১৩৪৩/পৃ:৯৫।

১৭০.আবদুস্ সালাম, 'নারী সেনা', *সহচর*, ১ম বর্ষ/১০ম সংখ্যা/কার্ত্তিক/১৩২০/পৃ: ৭৯১।

১৭১.মিসিস, আর, এস, হোসেন, 'বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি; (সভানেত্রীর অভিভাষণ), *সওগাত*, ৪র্থ বর্ষ/ ১০ম সংখ্যা/চৈত্র/ ১৩৩৩/পৃ: ৬৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৭২.মিসেস ডি,এম, রহমান, 'আমাদের অভাব অভিযোগ', *ধূমকেতু*, মোহর্‌রম সংখ্যা/১৩৪১ হিজরী/ পৃ: ১০।

১৭৩.আবদুস্ সালাম, 'স্ত্রীশিক্ষা', *সহচর*, ১ম বর্ষ/৬ষ্ঠ সংখ্যা/আষাঢ়/১৩২৯/পৃ: ৪২৬।

১৭৪.ঐ।

১৭৫.এম, ছেরাজুল হক্ মিঞা - চৌবিলা মাদ্রাছা, 'স্ত্রী-শিক্ষা ও জাতীয় উন্নতি', *রওশন হেদায়েৎ*, ২য় বর্ষ/ ৬ষ্ঠ সংখ্যা /চৈত্র/১৩৩২/পৃ: ১০৯।

১৭৬.এম ওয়াজেদ আলি, বি.এ,বার-এট-ল, 'মোস্‌লেম নারী', *মাসিক মোহাম্মদী*, ৫ম বর্ষ/১ম সংখ্যা/ কার্ত্তিক/ ১৩৩৮/ পৃ: ৪০।

১৭৭.সৈয়দা মসিহা বেগম, 'মুস্‌লিম নারী-সমস্যা', *আল্-ইসলাহ*, ১০ম বর্ষ/২য় সংখ্যা/জ্যৈষ্ঠ/১৩৫৪/পৃ: ৬০।

১৭৮.সৈয়দ আবদুর রব, 'এছলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা', *মোয়াজ্জিন*, ৪র্থ বর্ষ/৫ম সংখ্যা/চৈত্র/১৩৩৯/পৃ: ২০০।

১৭৯.মিসিস, আর, এস, হোসেন, 'বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি; (সভানেত্রীর অভিভাষণ), *সওগাত*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৯৬।

১৮০.শাম্‌সুন্ নাহার, 'পর্দ্দা প্রথা ও স্ত্রী স্বাধীনতা', *আন্নেসা*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১২।

১৮১.আবু ইউসুফ, 'মানব ও ইছলাম', *জাগরণ*, ১ম বর্ষ/৫ম সংখ্যা/ভাদ্র/১৩৩৫/পৃ: ১৮৪।

১৮২.মিস্ ফজিলতুন্নেসা এম-এ, 'মুস্‌লিম নারীর জাগরণ' *জাগরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ: ২২।

১৮৩.আবুল হোসেন, 'নারীর অধিকার', *সাধনা*, ৩য় বর্ষ/৬ষ্ঠ সংখ্যা/আশ্বিন/১৩২৮/পৃ: ১৯৩।

১৮৪.মোহাম্মদ এনামুল হক্, 'প্রাচীন মুসলমানের শিক্ষা ও সাধনা', *সওগাত*, ৪র্থ বর্ষ/৭ম সংখ্যা/পৌষ/ ১৩৩৩/পৃ: ৪৪৯।

১৮৫.শামসুন নাহার, 'নারী জাগরণী', *বার্ষিক সওগাত*, অগ্রহায়ণ/১৩৩৩/পৃ: ৪৯।

১৮৬.ঈদ-সংখ্যা *আজাদ*, কার্ত্তিক/১৩৪৮/পৃ: ৬।

১৮৭.মুহম্মদ হবিবুল্লাহ্, 'ভারতীয় মুসলিম রাজনীতির জন্মকথা', *আজাদ*, ঈদ-সংখ্যা/কার্ত্তিক/১৩৪৭/পৃ: ৭।

১৮৮.ঐ।

১৮৯.সৈয়দ এম্‌দাদ আলী, 'মুসলিম বাংলার আত্মকথা', *মাসিক মোহাম্মদী*, ১০ম বর্ষ/১ম সংখ্যা/কার্ত্তিক/ ১৩৪৩/পৃ: ১।

১৯০.এম.এস. আশরাফ হোসেন, 'মুসলমান ছাত্রের আত্মবিস্মৃতি', ৫ম বর্ষ/৫ম সংখ্যা/ফাল্গুন/১৩৩২/পৃ: ১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৯১.মৌলবী এলাহী বখ্‌শ আল্‌জামালী, 'বঙ্গ-মোস্‌লেমের প্রতি', *হেদায়াত*, ১ম বর্ষ/৫ম সংখ্যা/জ্যৈষ্ঠ/ ১৩৪৩/পৃ: ৮১-৮৩।

১৯২.জাতীয় পত্রিকা ঃ *আহলে হাদিস*, ২য় বর্ষ/৪৪শ সংখ্যা/কার্ত্তিক/১৩৩৬/পৃ: ৯।

১৯৩.*ঐ*।

১৯৪.মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, "বাঙ্গলার মুসলমান", *বার্ষিক সওগাত*, ৩য় সংস্করণ/১৩৩৩/পৃ: ৭।

১৯৫.ডাঃ লুৎফর রহমান, 'মুসলমান', *মোয়াজ্জিন*, ৪র্থ বর্ষ/৩য় সংখ্যা/মাঘ/১৩৩৯/পৃ: ১৪১।

১৯৬.ইসলাম ও আমল (ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার একাংশ), *নূর*, ১ম বর্ষ/৫ম সংখ্যা/জ্যৈষ্ঠ/ ১৩২৭/ পৃ: ৩২৯।

১৯৭.অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ এম-এ, 'আমীর আলী', *জাগরণ*, ১ম বর্ষ/৭ম সংখ্যা/কার্ত্তিক/ ১৩৩৫/পৃ: ২৬৩।

১৯৮.সম্পাদকের দফ্‌তর, *সওগাত*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৮৯।

১৯৯.তমিজুর রহমান, 'উত্থান ও পতন', *সাধনা*, ২য় বর্ষ/১২শ সংখ্যা/চৈত্র/১৩২৭/পৃ: ৪৬২।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা ১৯০৬ - ৪০

কুড়ি শতকের প্রারম্ভে বাংলাকে বিভক্ত করার বৃটিশ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী যে অসন্তোষ দানা বাঁধে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার দ্বারা তা চরম আকার ধারণ করে। আর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে পরিচালিত হিন্দুদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলমানের মতবিরোধকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত অধিকাংশ পত্র পত্রিকাগুলি রাজনৈতিক ভূমিকায় সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং মুসলমান সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাঁদের রাজনৈতিক ভাবনা ও মতামত দ্বারা স্বসমাজকে উজ্জীবিত করতে লেখনীর মাধ্যমে যে প্রয়াস পান তা তুলে ধরা হয়েছিল।

মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় মোহাম্মদ আকরম খাঁ পতন যুগের প্রকৃত ইতিহাস শিরোনামে এক প্রবন্ধে বাংলার মুসলমানদের তিনি অধঃপতিত না বলে অধঃপাতিত বলেছিলেন। এর কারণ হিসাবে তিনি দায়ী করেছিলেন মুসলমানদের স্বাভাবিক অবসাদজনিত দোষ-ত্রুটি, তখনকার শাসনযন্ত্রনীতি ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে।[১] *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় সৈয়দ এমদাদ আলী উল্লেখ করেছিলেন যে, যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে মুসলমানরা নির্জীব, গতিহীন, সম্বিতহারা ও নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন ছিল ততদিন পর্যন্ত হিন্দু পক্ষ তাদের বিরুদ্ধে কোন সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন করেনি।[২]

এমদাদ আলীর মতে, পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ এবং সরকার প্রদত্ত সকল সুবিধা ভোগ করে হিন্দুগণ অত্যন্ত সবল ও উন্নত হয়ে ওঠে। তাঁদের মধ্যে 'পেট্রিয়টিজম' ও 'নেশন্যালিজমের' সৃষ্টি হয়। ফলে তাঁরা হিন্দু ভারতের পুনরুত্থানের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে। কিন্তু লর্ড কার্জন ভারতের যড়লাট হয়ে এসে প্রশাসনিক কারণে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা করলে তাতে বাঁধার সৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলে তারা মুসলমানদের শত্রুর চোখে দেখতে আরম্ভ করে।[৩]

তাঁর ভাষায়, 'মুসলমানের সম্বিত লাভের সঙ্গে সঙ্গেই এই বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছে এবং যতই মুসলমান তাহার নিজের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ততই এই বিদ্বেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।'[৪]

Dhaka University Institutional Repository

মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় এই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছিল যে, রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, তিলক প্রভৃতি খ্যাতনামা হিন্দুগণ ছিলেন একদিকে সংস্কারক এবং অপরদিকে জাতীয়তাবাদী। তাঁদের শিক্ষার মধ্যদিয়ে ভারতবর্ষের জাতীয় অভ্যুত্থানের যে ধারণা শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে গড়ে উঠে তা ছিল সম্পূর্ণ হিন্দুভাবাপন্ন। ফলে রাষ্ট্রীয় এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তার দুটি দিক দেখতে পাওয়া যায় - যা একদিকে ইংরেজ বিরোধী অপরদিকে মুসলমান বিরোধীও।[৫] এর ফলে মুসলমানরা যে দুটি বিষয় উপলব্ধি করেন তা হলো প্রথমতঃ সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দুরা রাষ্ট্রতন্ত্রে নিজেদের অধিকার স্থাপন করতে চাচ্ছেন এবং অনেকটা কৃতকার্য্যও হতে চলেছেন, দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের অনুমান, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করতে পারলে হিন্দুরা দেশে যে ধারার প্রবর্তন করবেন তা তাদের বিশিষ্ট হিন্দু জাতীয়তার ধারা।[৬] পত্রিকাটিতে তাই লেখা হয়েছিল ঃ হিন্দু-জাতীয়ত্বের প্রতিযোগিতায় মুসলমানত্ব ক্ষুণ্ন হইতে পারে, এই আশঙ্কা হইতে ও স্বদেশী আন্দোলনের দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের মুসলমানদের মনে সর্ব্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও ইসলামীয় আদর্শ অনুসরণ করিবার আকাঙ্খা জাগে।।[৭]

মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে *সওগাত* পত্রিকায় মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী লিখেছিলেন যে, মুসলমানগণ ভারতে একান্ত ভাগ্যহীন, ভারতীয় মুসলমানগণ ভারতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি বলেই স্বদেশ তাকে বিদেশী করে রেখেছে। তাদের শূণ্য প্রাণের আকুলতা ভারতের বাহিরের মুসলমানকে আকড়ে ধরে শান্তি লাভের চেষ্টা করে।[৮]

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছিল 'মুসলমানের প্রতি হিন্দুর অনুদারতা এবং অসহানুভূতি' সে কথা উল্লেখ করে সৈয়দ এমদাদ আলী *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় বলেছিলেন যে, ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাঙলাকে বিভক্ত করার মধ্য দিয়ে অনুন্নত মুসলমানদের উন্নতি সাধনের যে পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন তারফলে মুসলমানরা আশান্বিত হয়েছিল। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের এই নবজাগ্রত অবস্থা বাঙালি হিন্দু সহজ ও সরলভাবে গ্রহণ না করে এই বিভাগের বিরুদ্ধে হিন্দু অধিবাসীগণ তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করলে তা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও মন কষাকষির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[৯]

মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্য লক্ষ্ণৌ শহরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দ সমবেত হন। এরপর ১৯০৬ সালের পহেলা অক্টোবর সুপ্রসিদ্ধ আগা খাঁ ডেপুটেশান সিমলায় বড়লাটের নিকট ভারতের মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে এক আবেদনপত্র পেশ করেন। এই আবেদনে যাঁরা দস্তখত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ হলেন- সুলতান মোহাম্মদ শাহ

Dhaka University Institutional Repository

আগা খাঁ নবাব মোহসিন-উল-মুল্‌ক, নবাব ভিকার-উল-মুলক্, প্রিন্স মোহাম্মদ বখতিয়ার শাহ্, ল্যাপ্টান্যান্ট মালিক ওমর হায়াত খাঁ তিওয়ানা, কর্ণেল আবদুল মজিদ খাঁ, হাকিম আজমল খাঁ, স্যার আদমজী পীর ভাই, সৈয়দ আলী ইমাম, স্যার আবদুর রহিম, মিয়া মোহাম্মদ শফি, সৈয়দ নবীউল্লাহ, সৈয়দ কেরামত হোসেন, সাহেবজাদা আফতাব আহমদ খাঁ ও নবাব আলী চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। ঈদসংখ্যা *আজাদ* পত্রিকায় মুহম্মদ হবীবুল্লাহ এ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করে দেখিয়েছিলেন যে, ১৯০৬ সনের ডেপুটেশান ১৮৯২ সনের ইন্ডিয়া এ্যাক্টের নির্বাচনে ভারতীয় মুসলমানের প্রতিনিধিত্বের শোচনীয়তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুসলিম সমাজের অতীত, জনসংখ্যা, মর্যাদা, রাজনৈতিক গুরুত্ব ইত্যাদির প্রেক্ষিতে আইনসভায়, জেলা বোর্ডে, মিউনিসিপ্যালিটিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র-প্রতিনিধিত্বের যে দাবী করেন, পরবর্তীকালে লর্ড মিন্টো ডেপুটেশানের দাবী স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করে নিয়ে সরকারীভাবে ঘোষণা দেন- মুসলিম সমাজের মর্যাদা নির্ধারিত হবে শুধু তাদের জনসংখ্যা হিসাবে নয়, বরং তাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং সাম্রাজ্যের প্রতি তাদের সাহায্যের অনুপাতে।[১০] তিনি আরও বলেন যে, পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজ বড়লাটের কাছ থেকে নিজেদের দাবী ও অধিকারের যৎসামান্য স্বীকৃতি লাভ করলে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণ সৃষ্টি হয় এবং নবাব সলিমুল্লাহ্‌র প্রস্তাবে এবং হাকিম আজমল খাঁ ও মওলানা জাফর আলী খাঁর সমর্থনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যার স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন মহামান্য আগা খাঁ ও সেক্রেটারী নির্বাচিত হন নবাব ভিকার-উল-মুলক্। লীগের দু'টি উদ্দেশ্য ও আদর্শ হল ঃ প্রথমত, মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করা ও তাদের অভাব অভিযোগ সরকারের সম্মুখে পেশ করা, দ্বিতীয়, মুসলিম সমাজের স্বার্থে ব্যাঘাত না করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন।[১১] এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে 'নিজেদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে মুসলমান সমাজ এ সময় খুব সচেতন হলেও ভারতবাসীর সাধারণ রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে এঁরা মোটেই উদাসীন ছিলেন না' বলে পত্রিকাটিতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন।[১২] তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, ভারতশসচিব মুসলমান সমাজের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হলেও ১৯০৮ সনের ২৭শে নভেম্বরের ডেসপ্যাচে আসন সংরক্ষিত করে যুক্ত নির্বাচন প্রথাকেই সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু ১৯০৯ সালে সৈয়দ আমীর আলীর নেতৃত্বে লীগের পক্ষ থেকে একটি ডেপুটেশান বিলেতে ভারত সচিব লর্ড মর্লের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন যে, যুক্ত নির্বাচনে কোনযোগ্য মুসলমান প্রার্থী নির্বাচিত হতে পারবেন না। সাত কোটি মুসলমান (ভারতবর্ষের) বর্ণ ও ধর্মের দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি। এই আবেদনের পর লর্ড মর্লে ও প্রধানমন্ত্রী এ্যাসকুইথ মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচন ও রাজনৈতিক গুরুত্ব স্বীকার করে নেন। এইভাবে ১৯০৯ সালের মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কারে মুসলমান স্বতন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

জাতি হিসাবে স্বতন্ত্র নির্বাচন লাভ এবং তাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনা করে বিভিন্ন আইন সভায় তাদেরকে সংখ্যাতিরিক্ত আসন প্রদানের মধ্য দিয়ে দেড়শ বছরের উপেক্ষা ও অবিচারের পর balance of power নীতির বদৌলতে মুসলমানদের দাবী খানিকটা স্বীকৃতি লাভ করে।[১৩]

অতএব মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন কেন হয়েছিল সে সম্পর্কে *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় এক প্রবন্ধে সৈয়দ এমদাদ আলী যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন যে, কুড়ি শতকের প্রারম্ভে ভারতীয় মুসলমানরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের প্রতিপক্ষ হিন্দুদের চাইতে অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে বুঝতে পেরে নিজেদের জন্য একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়। এর জন্য যে আলোচনা তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করে ১৯০৬ সালে ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।[১৪]

বঙ্গভঙ্গ পরবর্তীকালে হিন্দুগণ স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙলা বিভক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এ সম্পর্কে ১৩১৩ সালের ফাল্গুন সংখ্যা *ইসলাম-প্রচারক* পত্রিকায় মন্তব্য প্রকাশ করে বলা হয়েছিল যে, মুসলমান দলপতিগণ সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করাতে হিন্দুরা আশাহত হয়ে বিকৃত স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা যে বাধার সৃষ্টি করছে তাতে দেশে অশান্তির আগুনই জ্বলে উঠেছে।[১৫] কংগ্রেসী হিন্দুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে পত্রিকাটিতে বলা হয়েছিল যে, যখন পাল-ব্যানার্জি ও তাদের সমর্থনকারীরা বঙ্গের চতুর্দ্দিকে সভাসমিতি করছেন তখন সেখানে কোন মুসলমান কখনও বাঁধা প্রদান করেন নাই, কিন্তু মুসলমানরা কোন সভা করতে উদ্যাগী হলেই হিন্দুরা ইট পাটকেল নিক্ষেপের দ্বারা দাঙ্গা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তা পন্ড করে দেয়।[১৬] পত্রিকাটিতে বিভিন্ন দাঙ্গা সৃষ্টিকারী ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছিল যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নবাব বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী কার্সেটজী'কে শোচনীয়রুপে মারপিট, একজন মুসলমান রুটিওয়ালার হিন্দুর বন্দুকের গুলিতে প্রাণ ত্যাগ। কিন্তু মুসলমান নেতারা শান্তিপ্রিয় ও উদার বলেই হিন্দুর এই সমস্ত বাড়াবাড়ি সহ্য করে চলে এবং কোনরকম সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েনি বলে পত্রিকাটিতে মন্তব্য করা হয়েছিল।[১৭]

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর হিন্দু সমাজের যে অসন্তোস এবং যে সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা তার বর্হিঃপ্রকাশ তারা দেখিয়েছিল সে সম্পর্কে ইসলাম-প্রচারক পত্রিকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল।[১৮] হিন্দু জমিদার ছাড়াও অন্যান্য হিন্দুদের দ্বারা দরিদ্র মুসলমানদের অত্যাচার, কোরবাণী কার্য্যে বাধা প্রদান প্রভৃতি উল্লেখ করে মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ জোরালো কণ্ঠে বলেন যে, 'এই জাতিই কোন্ প্রাণে ও

Dhaka University Institutional Repository

কোন মুখে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একতা স্থাপনের কথা বলেন, আমরা বুঝিতে অক্ষম।"[১৯] লেখক এই বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, হিন্দুগণ ঘৃণিত স্বার্থপরতা ও কপটতা যতদিন ত্যাগ না করবেন ততদিন তাদের উদ্দেশ্য কখনই সফল হবে না।[২০]

আজাদ পত্রিকায় বলা হয়েছিল যে, হিন্দু সমাজের চাপের মুখে ১৯১১ সালে বৃটিশ সরকার বাঙলা বিভক্তি বাতিল করলে মুসলমানদের তা চরম আঘাত করে। যার ফলে মুসলিম লীগের মূলনীতি ধীরে ধীরে বা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়। ১৯১৩ সালের ১৪ই মার্চ লক্ষ্ণৌতে মুসলিম লীগ স্বায়ত্বশাসনকে মূলনীতি বলে গ্রহণ করে।[২১] বঙ্গভঙ্গ রদ করার পর বাংলার মুসলমানদের বিভিন্ন সরকারী উচ্চপদ এবং চাকরীক্ষেত্রে কিরূপ পরিস্থিতির স্বীকার হতে হয়েছিল *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় সে সম্পর্কে আলোচনা করে বলা হয়েছিল যে কোন কারণেই হোক শাসন পরিষদের মেম্বার আর স্বায়ত্বশাসনের মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য বড় বড় চাকরী ক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান তার ত্রিসীমায় প্রবেশাধিকার হতে বঞ্চিত ছিল।[২২] মুসলমান শাসনামলে হিন্দুদের সার্বিক অবস্থার তুলনামুলক আলোচনা করে *সওগাত* পত্রিকায় গোলাম আহমদ এক প্রবন্ধে এই বলে মন্তব্য করেন যে, অথচ মুসলিম শাসনামলের চিত্র ছিল ভিন্ন। মুসলমান শাসকদের সময় শসন, বিচার সৈনিক বিভাগসহ সকল ক্ষেত্রেই হিন্দুগণ বিশিষ্ট পদে নিযুক্ত থাকতেন।[২৩] তাই মুসলমানদের আপন করে নেওয়ার আবেদন রেখে *আল্-এসলাম* পত্রিকাতে লেখক হিন্দু সমাজের উদ্দেশ্যে বলেছিলেনঃ 'ভাই হিন্দু! মুসলমানকে তোমরা আপন বলিয়া থাক, কার্যতও তাহাদের আপন হও। তাহাদের বেদনাগুলি নিজেরই বেদনার ন্যায় অনুভব করিতে শিখ।"[২৪]

আজাদ এ বলা হয়েছিল, ১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে তুরস্কের পক্ষে ভারতীয় মুসলমানরা সমর্থন জ্ঞাপন করলে মুসলমান নেতাদের অনেকেই তখন ভারত রক্ষা আইন বলে অন্তরীণে আবদ্ধ হয়। যাঁদের মধ্যে ছিলেন মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা মাহমুদ-উল-হাসান প্রমুখ। এর ফলে মুসলমান সমাজ রাজভক্তির পথ থেকে অনেকখানি সরে দাঁড়িয়েছিল। এরপর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র চেষ্টাই ১৯১৫ সালে বোম্বাই এ একই সঙ্গে লীগ ও কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে কংগ্রেসের পক্ষে নেতৃত্ব করেন এস পি সিংহ আর লীগের সভাপতি হন মজহারুল হক। এর মধ্যদিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয় তারই ফলে হিন্দু মুসলিম মিলন রুপলাভ করে ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে।[২৫] প্যাক্টের তাৎপর্য তুলে ধরে পত্রিকাটিতে আরও বলা হয়েছিল যে, লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় এই কারণে যে, এই প্যাক্টে কংগ্রেস স্বীকার করে নেয় মুসলিম লীগ মুসলিম ভারতের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং কংগ্রেস-লীগ যুক্তভাবে আরতের দাবী বৃটিশ

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের নিকট পেশ করে। তাছাড়া এই চুক্তি অনুসারে কংগ্রেস মুসলিম সমাজের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী মেনে নিয়েছিল। বস্তুতঃ লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের পরে কংগ্রেস ও লীগ অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান রাজনীতি ক্ষেত্রে একতাবদ্ধ হয়ে চলতে থাকে। ১৯১৯ সালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মহাযুদ্ধ শেষে সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে খলিফার সাম্রাজ্যকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করবার প্রস্তাবে সায় দিলে এই সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠতর হয় এবং নেতারা এই সময় থেকে কয়েক বৎসর বার বার কংগ্রেস ও লীগের অধিবেশন একই স্থানে হওয়ার মধ্যদিয়ে একই স্বদেশ প্রেমের আদর্শে কাজ করেন।[২৬] কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য স্থায়িত্ব লাভ না করার পিছনে দু'টি কারণকে দায়ী করে পত্রিকাটিতে বলা হয়েছিল যে, এই সময় গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠে তা গণ আন্দোলনে পরিণত হলেও প্রধানতঃ দু"টি কারণে হিন্দু-মুসলমানের মিলন তাসের ঘরের মতই উড়ে যায়। প্রথমতঃ গান্ধী-দর্শন ও তার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, দ্বিতীয়তঃ হিন্দু-মুসলমানের মূলগত বিরোধ।[২৭]

হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য বিনষ্ট হবার কারণে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর *ধূমকেতু* পত্রিকায় 'ঝাড়ুদার' ছদ্মনামে 'হিন্দুস্থানের পাহারাওয়ালা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখে উভয় সম্প্রদায়ের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন এবং প্রশ্ন রেখেছিলেন যে, 'তা হলে বাবুরা কি স্পষ্ট করে বল্‌তে চান্ যে গৌরাঙ্গ প্রেম ছাড়া ত্রাণ পাবার আর উপায় নাই?"[২৮]

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে মুসলিম লগি নেতারা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন সে সম্পর্কে *আজাদ* এ মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বলেন, ১৯২৭ সনের মার্চ মাসে দিল্লী প্রস্তাবের মাধ্যমে জিন্নাহ্ ও মোহাম্মদ আলী এই বিরোধ মিটাবার প্রস্তাব রাখেন। দিল্লী প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, সিন্ধু স্বতন্ত্রী-করণ এবং সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের প্রস্তাবে হিন্দুরা রাজী হলে তারা যুক্ত নির্বাচন গ্রহণ করবেন।[২৯] প্রবন্ধটিতে তিনি আরও দেখিয়েছিলেন যে, জিন্নাপন্থীরা হিন্দু মুসলিম মিলনের জনা অতীব আগ্রহী ছিলেন এবং মিলন প্রশ্নকে কেন্দ্র করে লীগ দ্বিখন্ডিত হলেও তাঁরা এ ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে কোন রকম আপোষ করেননি। দেখা গিয়েছিল ১৯২৭ সালে যখন স্যার শফি লাহোরে লীগের অধিবেশন করছিলেন সে সময় জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী, আলী ইমাম, ইয়াকুব, আনসারী প্রমুখ মিলনপন্থীরা কলকাতায় সমবেত হয়ে লীগের অধিবেশন করেন। আর ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে লীগের পক্ষ থেকে জিন্নাহ কলকাতায় অনুষ্ঠিত অল পার্টি কনভেনশানে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্ত এসব মিলন-প্রচেষ্টা সুফলপ্রসু হয় নাই। কারণ কংগ্রেস 'নেহরু- প্রস্তাব'কে জাতীয় দাবী বলে গ্রহণ করলে মিলনপন্থীদের মিলন-স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। কারণ নেহরু রিপোর্টে স্বতন্ত্র নির্বাচন ও মুসলমানদের সংখ্যাতিরিক্ত আসন অস্বীকৃত হওয়া ছাড়াও

Dhaka University Institutional Repository

বাঙলা ও পাঞ্জাবের মুসলমানদের সংরক্ষিত আসনও বাতিল হয়ে গিয়েছিল। মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ট প্রদেশে সংখ্যানুপাতে আসন সংরক্ষিত হয়েছিল দশ বছরের জন্য।[৩০] এর ফলে মোহাম্মদ আলীর যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে *আজাদ* এ প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধে বলা হয়েছিলঃ 'এই অবিচারে মোহাম্মদ আলী এতখানি আহত হয়েছিলেন যে বিহার মুসলিম কনফারেন্স (ডিসেম্বর, ১৯২৮) সভাপতি হিসাবে বলেছিলেনঃ জন কোম্পানীর আমলে লোকে বলতঃ 'খালক্ খোদা কি, মুলক্ মালেকা কা, হুকুম কোম্পানী বাহাদুর কা"। নেহরু প্রস্তাব কাজে পরিণত হলে লোকে বলবেঃ 'খালক্ খোদা কি, মুলক্ ইংরেজ কা, হুকুম হিন্দু মহাসভা বাহাদুর কা"।[৩১]

পত্রিকাটি থেকে আমরা আরও অবহিত হই যে, ১৯২৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর আগা খাঁর সভাপতিত্বে দিল্লীতে বিভিন্ন মুসলিম দলের যে সম্মিলিত অধিবেশন হয়েছিল তাতে মোহাম্মদ আলী এবং অন্যান্য কংগ্রেসী নেতারাও যোগ দিয়েছিলেন। এই সম্মেলনে মুসলিম সমাজের সম্মিলিত দাবি প্রস্তুত করা হয়। এর কিছুদিন পর জিন্নাহ ও স্যার শফির দলের বিরোধ মিটে গিয়ে আবার সম্মিলিত মুসলিম লীগ গঠিত হয়। অতঃপর মুসলিম সমাজের জাতীয় দাবী বিশ্লেষণ করে জিন্নাহ তা দফাওয়ারীভাবে লিপিবদ্ধ করেন- এই দাবীই জিন্নার চৌদ্দ দফা বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[৩২]

নিখিল ভারত সর্ব্বদল মোসলেম সম্মেলনী অনুষ্ঠানে নেহেরু-রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছিল। *আহলে হাদিস* পত্রিকা "স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ও ফেডারেল গভর্ণমেন্ট চাই" এই দাবী জানিয়ে সর্ব্বদল সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হাকিম মোহাম্মদ জমিল খান তাঁর যে অভিভাষণ পাঠ করেন তা প্রকাশ করেছিল।[৩৩] জমিল খান তাঁর অভিভাষণে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন যে, নেহেরু রিপোর্টে ভারতীয় মুসলমান সমাজের অস্তিত্বের অবসান করতে চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে 'বর্ত্তমান সময় ভারতীয় মোসলমান সমাজের সম্মুখে এক কঠোর পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে তাহাদের জীবন মরণ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে।"[৩৪] পত্রিকাটি হতে আরও জানা যায় যে, নিখিল ভারত খেলাফত কনফারেন্সের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে মৌলানা হযরত মোহানী নেহরু রিপোর্টের সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, মুসলমানদের-চিরকাল অধীন করে রাখার জন্য নেহরু রপোর্ট রচিত হয়েছে। অতএব, যে সমস্ত যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত দাবি উপেক্ষা করে নেহরু রিপোর্ট সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে গ্রাহ্য করা যায় না।[৩৫]

মুসলমানদের দাবী-দাওয়াকে অগ্রাহ্য করে নেহরু রিপোর্ট অপরিবর্তিত রাখা হলে *আহলে-হাদিস* পত্রিকার ঐ সংখ্যায় এ সম্পর্কে নিম্নলিখিতভাবে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

'শোচনীয় হিন্দুয়ানী মেন্টালিটি
সাম্প্রদায়িক সমস্যায় কন্‌ভেনশন
মোসলমানদের দাবী সম্পূর্ণ পদদলিত
নেহরু-রিপোর্ট অপরিবর্ত্তিতই রহিল।"[৩৬]

১৯২৮ সালে পন্ডিত মতিলাল নেহরু কর্তৃক রচিত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছিল ভারতীয়দের দাবী বৃটিশ পার্লামেন্টকে জানাবার জন্য। কিন্তু নেহরু-রিপোর্টে মুসলমানদের কাঙ্খিত দাবীকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। বিষয়টি মুসলমান সমাজ স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। এ ঘটনায় মুসলমান সমাজের ধারণা জন্মেছিল যে, "কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা নামে বিভিন্ন হলেও আসলে এক, স্বাধীন হিন্দু-ভারত প্রতিষ্ঠাই তাদের প্রধানতম উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে মুসলমান অন্তরায় বলে তাদের নেহরু রিপোর্টে এমন করে রাখা হলো যেন তারা আর মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে"--বলে *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল।[৩৭] পত্রিকাটিতে লেখক তাই বলেছিলেন ঃ 'মিঃ জিন্নার ১৪টি দাবীর কতটা আমরা পেয়েছি, তা' আমরা বাংলার মুসলিমদের ভেবে দেখতে বলছি। দেবতা আমরা হ'তে চাই না, মানুষ থেকেই আমরা আমাদের যা প্রাপ্য তা' আদায় ক'রে নেবো, বেশীও আমরা চাই নে।"[৩৮]

বাংলার মুসলমানদেরকে তাদের অতীত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য পত্র-পত্রিকাগুলিতে সৈয়দ এমদাদ আলী এ সম্পর্কিত একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। মুসলমানদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস অটুট রাখার উদ্দেশ্যে *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় আরেকটি প্রবন্ধে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের রাজনৈতিক জাগরণের সূচনাপর্বে আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দুসমাজ যেভাবে settled fact কে unsettled করে দিয়েছিল, সেই একই পথ অনুসরণ করে তারা লাভবান হতে চাইলে ভুল হবে। কারণ ১৯১১ সালের মুসলমানে আর বর্ত্তমানকালের বাঙালি মুসলমানে বিস্তর প্রভেদ রয়েছে। সেই সময় মুসলমান সমাজ নিদ্রিত ও আত্মচিন্তা বিমুখ থাকলেও বর্ত্তমানে মুসলমানদের সেই অবস্থা অনেকখানি কেটে গিয়েছে।[৩৯]

সাপ্তাহিক মোহাম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত অপর একটি প্রবন্ধে সৈয়দ এমদাদ আলী বাংলার মুসলমানদের মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহবান জানিয়ে বলেছিলেন যে, রাজনীতিতে দয়া বলে কোনও কথা নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে যারা দুর্বল তারা কখনও রাজনৈতিক অধিকার আদায় করতে ারে না। এক্ষণে বাংলার মুসলমান যদি সবল হয়ে নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার আদায় করতে চায় তাহলে তাদেরকে মুসলিম লীগের পতাকা তলে সমবেত হতে হবে।[৪০]

Dhaka University Institutional Repository

মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী *আল্-এসলাম* পত্রিকায় এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, স্বদেশবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন কংগ্রেস, কংগ্রেস ও লীগ প্রভৃতি সভা-সমিতি এবং সংবাদপত্রের মধ্যদিয়ে চিরকালই সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বের সঙ্গে কালযাপনের পক্ষপাতের নীতি পোষণ করলেও, মুসলমান হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য ও জাতীয়তাকে এবং নিজ ধর্ম বিধি ব্যবস্থার মর্য্যাদাকে রক্ষা করার মধ্য দিয়েই তা করতে হবে।[৪১] অন্যদিকে, *আল্-এসলাম* পত্রিকার আরেকটি সংখ্যায় মোহম্মদ আন্ওর আলী 'এছলামে জাতীয়তা' নামক এ প্রবন্ধে এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে 'উন্নত আমোছলমান রাজ্যে বাস না করে বরং একটি স্বাধীন অনুন্নত মুসলিম রাষ্ট্রে বাস করা মুসলমানদের জন্য অধিকতর শ্রেয়"।[৪২]

ইসলাম-দর্শন পত্রিকায় এছহাক মিঞা বি.এ. হিন্দু সমাজের জাতীয় আদর্শের উদাহরণ তুলে ধরে লিখেছিলেন যে, হিন্দু সমাজ তার পূর্ব পুরুষের ভাব এবং চিন্তা দ্বারা জীবন পূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পুরুষের আদর্শকে সামনে রেখে অগ্রসর হয়ে তার সমাজকে জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করার মধ্যদিয়ে সকলকে একসূত্রে আবদ্ধ করছে। কিন্তু মুসলমান সমাজ তা থেকে কিছুই শিখছে না।[৪৩] এজন্য তিনি বাঙালি মুসলমানদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে জাতীয় আদর্শে, জাতীয় শিক্ষায়, জাতীয় দীক্ষায় এবং জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে, বিশ্বের বুকে ও স্বদেশের সম্মুখে নিজের জীবন ও জাতীয়তাকে বড় করে তুলে ধরবার আহবান জানিয়েছিলেন।[৪৪] *ইসলাম-দর্শন* পত্রিকায় মুসলমানদের সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে বলা হয়েছিল ঃ 'ভারতীয় মুসলমানের সম্মুখে আজ যে কালমেঘ ঘণীভূত হইয়া দেখা দিয়াছে, উহা অপসৃত করিয়া দেশ ও জাতির মুখে পূর্ণিমার হাসি ফুটাইতে হইলে চাই - 'তাঞ্জিম"।[৪৫]

দেশে যুক্ত ও স্বতন্ত্র নির্বাচনের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সেই সময় দীর্ঘ বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছিল। মিশ্র নির্বাচন সম্পর্কে মোহাম্মদ আকরম খাঁ লিখিত একটি প্রবন্ধ *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিল। তাতে তিনি এ প্রসঙ্গে ব্যাপক আলোচনা করেছেন।[৪৬] মিশ্র-নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে বাংলার ব্যবস্থাপক সভাতেও মুসলমানগণ অতি সহজে নিজেদের অধিকার ও প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিতে সক্ষম হবে বলেও মন্তব্য করা হয়েছিল।[৪৭]

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ তাঁর 'পাকিস্তানের পটভূমি' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন যে, মুসলমান সমাজের দাবী হিন্দু নেতারা গ্রহণ করতে না পারার কারণে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বার বার অনুষ্ঠিত মিলন বৈঠকগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। তাছাড়া ১৯৩১ সালে গান্ধীজী মুসলমানদের সঙ্গে কোনরকম সমঝোতা ছাড়াই দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। তবে জিন্নাহ স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে অটল থাকায় সাম্প্রদায়িক

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যার সমাধানে গান্ধী ব্যর্থ হন। ১৯৩১ সনের ১৪ই নভেম্বর পন্ডিত মালব্য ও অন্যান্য হিন্দু নেতাগণ প্রধানমন্ত্রীকে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের জন্য আবেদন জানান এই প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে যে, তাঁরা ও হিন্দু সমাজ রোয়েদাদ মেনে নেবেন।[৪৮] তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সৃষ্টির মধ্যদিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলন স্বপ্নকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।[৪৯] এ সম্পর্কে *দৈনিক আজাদ* পত্রিকাতে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ নিয়ে স্থানীয় (বাংলার) কংগ্রেসের সঙ্গে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের এক মতবিরোধের মীমাংসা করার জন্য কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পন্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৯শে কার্তিক, ১৩৪৩ সনে কলকাতায় আগমন করলে *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় তাঁর আগমনকে স্বাগত জানিয়ে বলা হয়েছিলঃ ... সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ও প্রাদেশিক কংগ্রেস যে বিচার আলোচনা বা আপোষ নিষ্পত্তি করিবেন, বাংলার শতকরা ৫৫ জন অধিবাসীর অভিমত ও অনুভূতিরও একটু স্থান তাহাতে থাকা চাই, এরূপ কথা বলিলে বিশেষ অন্যায় করা হইবে বলিয়া মনে হয় না। বাংলার কংগ্রেস বাঙ্গালীর কংগ্রেস না হিন্দুর কংগ্রেস, তাহার একটা স্পষ্ট ও চরম সিদ্ধান্ত এবার হইয়া যাইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।"[৫০]

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্পর্কে মুসলমান সমাজের বক্তব্য অতি স্পষ্ট ছিল। তারা চেয়েছিল ১৯১৬ সালের মত কংগ্রে ও মুসলিম লীগ এ ব্যাপারে সম্মিলিতভাবে নিষ্পত্তির চেষ্টা করতে। কিন্তু মুসলমান সমাজকে উপেক্ষা করে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সংক্রান্ত বিষয়ে একতরফা আন্দোলন সৃষ্টি করা হলে তার ফল সুগম হয়ে উঠবে না এবং এর নিষ্পত্তির ব্যাপারে মুসলমান সমাজ অন্য চেষ্টা গ্রহণ করবে বলে পত্রিকাটিতে উল্লেখ করা হয়েছিল।[৫১] ২২শে কার্তিক, ১৩৪৩ সালের *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল যে, এলবার্ট হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমাজতান্ত্রিক দলের উদ্যোগে আহুত এক বিরাট জনসভায় পন্ডিত জওহরলাল নেহরু 'সমাজতন্ত্র ও ভারতের স্বাধীনতা' বিষয়ে এক বক্তৃতাদানের শেষে বলেছিলেন, বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে চিন্তা না করলেও চলবে। দেশবাসী যদি সত্যই স্বরাজ স্থাপন করতে উৎসুক হন তবে তাদেরকে কংগ্রেসকেই সর্বতোভাবে সাহায্য করতে হবে। স্বরাজ ভিক্ষায় মিলবার বস্তু নয়, স্বরাজ লাভ করতে হলে দেশবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে।[৫২]

পত্রিকাটিতে সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করে মুসলমানদের সাবধান হতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল 'সাম্প্রদায়িক রোয়দাদকে ধ্বংস করার জন্য প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কংগ্রেস উভয়ই যে প্রচন্ড সংকল্প নিয়ে 'কাউন্সিলের ভিতরে ও বাহিরে আন্দোলন করতে যাচেছ, তাতে রোয়েদাদের অনুকূলে স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত কংগ্রেসপন্থী কোন মুসলমানকে আগামী নির্বাচনে ভোট দেওয়া

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গত হবে না।[৫৩] 'এ সব বিষয়ে এখন হইতে সতর্ক না হইলে পরিণামে মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে হইবে।"- বলে আরও মন্তব্য করা হয়েছিল।[৫৪] পত্রিকাটির সম্পাদকীয়তে তাই বলা হয়েছিল কংগ্রেস বাংলার সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন প্রকার সমাধান না করে বরং তাঁরা এই শোচনীয়তার চিত্রকে আরো শোচনীয়তর করে তুলছে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের নামে বাংলার মুসলমানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রাম ঘোষণা করে।[৫৫]

১৯৩৭ সালের *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিস্তারিত উল্লেখ পাওয়া যায়। জিন্নাহ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে মোহাম্মদ আলী পার্কে যে বক্তব্য প্রদান করেন ১৯৩৭ সালের ৫ই জানুয়ারী *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদের শিরোনাম ছিল 'ভারতীয় মুছলমানগণ দল বিশেষের দ্বারা পরিচালিত হইবে না,' 'দেশ ও ধর্ম্মের সেবার জন্য আহবান'। এই বক্তব্যে জিন্নাহ প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে, আজ অল-ইন্ডিয়া মোসলেম লীগ নূতন শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত মুসলমানদের অধিকার আদায় করতে বদ্ধ পরিকর। মুসলমানগণকে কোনরকম প্রতারণায় না ভোলার জন্য তিনি আহবান জানান। তিনি স্পষ্টভাষায় বলেছিলেন, 'এই প্রদেশে মুছলমানদের ব্যাপারে হিন্দুরা ও কংগ্রেস অত্যন্ত হস্তক্ষেপ করিতেছেন। তাঁরা মুছলমানদিগকে পৃথক কাজ করিতে দিন, ইহাই আমার প্রার্থনা। পন্ডিত জওয়াহেরলাল বলিয়াছেন, ভারতে দুইটি দল বর্ত্তমান, কংগ্রেস ও গভর্ণমেন্ট। আমি বলি, পন্ডিতজীর জানা উচিত ভারতে একটি তৃতীয় দল বিদ্যমান, সেটী মোছলেম লীগ। এই দল কোন দল বিশেষের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতে বাধ্য নহে।'[৫৬]

২৫শে পৌষ, ১৩৪৩ সালের *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে, জিন্নাহ ৬ই জানুয়ারী বিকেলে কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংঘের সভায় বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। বক্তৃতায় তিনি মুসলিম ঐক্যের দ্বীপ শিখা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার আহবান জানিয়ে তরুণ ছাত্র সমাজকে মুসলিম লীগের কার্যধারা পড়তে, চিন্তা করতে এবং তা বিশ্লেষণ করে দেখবার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, ভারতের বৃহত্তম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও সহযোগিতা স্থাপনের উদ্দেশ্যেই তিনি বর্ত্তমানে চেষ্টা করছেন। যদি হিন্দু ও মুসলমানগণ ব্যাপক দৃষ্টি নিয়ে অগ্রসর হয় তবেই দেশের কাজ বিনা বাধায় আরও ভালভাবে করা সম্ভব। এই নিমিত্ত পুরাতন লক্ষ্মৌ চুক্তির চেয়ে উন্নত ধরণের চুক্তি তিনি কামনা করেন।[৫৭]

পত্রিকাটি থেকে আরও জানা যায় যে, ঐদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লা মুসলিম হলের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি কেবলমাত্র বাঙলাদেশের নয় সমগ্র ভারতের মুসলমানগণের সঙ্ঘবদ্ধতার আদর্শ বিশেষ দৃঢ়তা সহকারে ঘোষণা করেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন যে, স্বতন্ত্র নির্বাচন কাম্য, এর ফলে মুসলমান

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ অপরাপর সম্প্রদায়সমূহ সহযোগিতা করতে চাইলে তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতায় অগ্রসর হতে পারবেন। বাংলার মুসলমানগণ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১১৯টি আসন পাবেন এবং তাঁদরকেই সাহসের সঙ্গে সন্তোষজনকভাবে অপেক্ষাকৃত দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য পালন করতে হবে।[৫৮]

১৯৩৭ সালের ১১ই জানুয়ারি পন্ডিত জওহরলাল নেহরু পূর্ণিয়ায় যে বক্তৃতা প্রদান করেন তা ১২ই জানুয়ারি *দৈনিক আজাদ* এ প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি থেকে জানা যায় ঐ বক্তৃতায় পন্ডিত নেহরু মন্তব্য করেছিলেন যে, বর্ত্তমানে ভারতে কেবলমাত্র দুইটি শক্তি বর্ত্তমান- বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতীক কংগ্রেস। দেশের অন্যান্য কয়েকটি শক্তিশালী দল যারা নতুন সমাজতান্ত্রিক নীতি দ্বারা পরিচালিত, সেগুলি কংগ্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তৃতীয় ও মধ্যম দলসমূহ ও যে সমস্ত দলের কোন স্থির সিদ্ধান্ত নাই এই ঐতিহাসিক দিক থেকে তাদের কোন মূল্য এবং বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই। তবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও জনসাধারণের মঙ্গল বিধানের ভিত্তিতে কংগ্রেস মুসলিম লীগের সঙ্গেও সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।[৫৯] তিনি আরও বলেন, কংগ্রেসের কর্মকান্ড জনসাধারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং কংগ্রেস অবগত যে, হিন্দু এবং মুসলমান জনসাধারণ সাম্প্রদায়িক সমস্যার আদৌ চিন্তা করে না।[৬০] এরই পরিপ্রেক্ষিতে *দৈনিক আজাদ* এর আরেকটি সংখ্যায় নেহরুর বক্তৃতা সম্পর্কে 'পন্ডিতজীর দৃষ্টিভ্রম' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে ব্যাপক সমালোচনা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের নীতির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে অতীতে ডা. মুঞ্জে, ভাই পরমানন্দ অথবা ডা. কুর্ত্তাকুটী প্রমুখ মহাসভাপন্থী হিন্দু নেতাদের কথার সঙ্গে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।[৬১] ১৯১৬ সালে 'লীগ-কংগ্রেস প্যাক্টে' এর মত কার্যাবলী যে কংগ্রেসে ঘটেছিল, হিন্দু-মুসলিম প্যাকেটর প্রয়োজনীয়তা ও হিন্দু-সভার বিরুদ্ধতা সম্বন্ধে পরবর্তীকালে ১৯২৪ সালে তিনি (নেহরু) যে বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন তা কেন করেছিলেন সে সমস্ত বিষয় উল্লেখ করে সম্পাদকীয়তে তাই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল - 'পন্ডিতজীকে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করি, প্যাক্টের যদি কোন মূল্যই না থাকে, তবে ১৯২৮ সালে 'নেহরু-কমিটি' গঠিত হইয়াছিল কেন? সে কমিটির কার্য্যে কংগ্রেসের তদানীন্তন সেক্রেটারী হিসাবে তিনিই বা উৎসাহ সহকারে কঠোর শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন কেন?"[৬২] সুতরাং এ বিষয়ে অসমর্থতার কৈফিয়ৎ দিয়ে সমস্যার প্রতিকার চিন্তা ত্যাগ করা সমীচীন নয় বলে পত্রিকাটির সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়েছিল।[৬৩]

দৈনিক আজাদ থেকে জানা যায়, জওহরলাল নেহরুর বক্তব্যের উত্তরে জিন্নাহ এক বিস্তারিত বিবৃতি প্রদান করেছিলেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, মুসলিম লীগ দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন সংগ্রামে যে কোন উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাতে হাত রেখে ও বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জাতীয় সংগ্রামের সম্মুখীন হতে

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চাৎপদ হবে না। কিন্তু এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করার পূর্বে ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সমস্যা শুরুতেই সমাধান করতে হবে। এ ব্যাপারে মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ ছাড়াও ভারতের সকল সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করাই তাঁর উদ্দেশ্য। মুসলিম লীগ ভারতে কোন বৃহৎ সঙ্ঘের সঙ্গে ততদিন পর্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধ হতে ইচ্ছুক নয়, যতদিন পর্যন্ত তারা জানতে না পারে যে, ঐ বৃহৎ সঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য ও নীতি সকল সম্প্রদায়ের দ্বারাই সর্বতোভাবে অনুমোদিত ও সমর্থিত হয়।[৬৪] জিন্নাহ আরও বলেছিলেন যে, নেহরু ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের উপযুক্ত যোদ্ধা ছাড়া আর কিছু আশা করেন না, কিন্তু প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে অসম্মতি জ্ঞাপন, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের সম্মতি দানের সময় পন্ডিতজীর প্রকৃত যোদ্ধৃবেশ ও প্রকৃত যোদ্ধার ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়নি।[৬৫]

জিন্নাহ তাই বলেছিলেন যে, 'আমি এই সমালোচনা নিয়ে বাক্ বিতন্ডা করে আমাদেরই মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করতে চাই না। কারণ এইরূপ বাক্ বিতন্ডার ফলে দেশের কোন উপকার সাধিত হতে পারে না। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আমরা পরস্পরকে বুঝবার চেষ্টা করবো।[৬৬]

কংগ্রেস শাসনতন্ত্রকে অচল করে দেওয়ার কথা বললে তার পরিপ্রেক্ষিতে ১২ই মার্চ, ১৯৩৭ সালে নয়া দিল্লীতে জিন্নাহ যে অভিমত প্রকাশ করেন *দৈনিক আজাদ* -এ তা সবিস্তারে তুলে ধরা হয়েছিল।[৬৭] পত্রিকাটি থেকে জানা যায় জিন্নাহ বলেছিলেন যে, কংগ্রেসের শাসনতন্ত্র ধ্বংসের বাণীতে বাস্তবতার অভাবই পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা যদি অচল অবস্থার সৃষ্টি করতে চান, তাহলে শাসনতন্ত্রকেই কার্যকরী করতে সাহায্য করবেন। গবর্ণর যদি মুসলিম লীগের কাজে হস্তক্ষেপ করে কিংবা বাধা প্রদান করে তবে তারাও অচল অবস্থার সৃষ্টি করতে ইতস্ততঃ করবেন না এবং এ ব্যাপারে দেশের জনগণের অভিমত চাইবেন।[৬৮]

কংগ্রেসের মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করে আল্-ইস্লাহ পত্রিকাটিতে বলা হয়েছিল যে, বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে উপলক্ষ রেখে এবং তাদের আড়ালে থেকে মুসলিম কালচার ও বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করার নামই যদি পূর্ণ স্বরাজ হয় তাহলে কংগ্রেসকে এখন হিন্দু মহাসভার বৃহত্তর সংস্করণ ও উচ্চ জাতীয় আভিজাত্যপূর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। All India National Congress নাম হলেও তা সর্বভারতীয়ত্ব ও জাতীয়তার ভূমিকা ছেড়ে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।[৬৯]

যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যায় কম তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল *বুলবুল* পত্রিকায়। বলা হয়েছিল : 'দীর্ঘ তিন বৎসর যাবত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় ক'রে স্বাধীনতার রঙ্গ-ভূমি ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের হৃৎপিন্ডের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার নকশা আঁকা হচ্ছে। সে নক্শার খস্ড়া হতে স্পষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

বুঝা যাচ্ছে, হিন্দু ও মুসলমান রুদ্রমূর্ত্তিতে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে সেই স্বাধীনতার অভিনয় শুরু করবে। এই অভিনয়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মুষ্টিমেয় মুসলমানের কি অবস্থা হবে, তা ভাববার বিষয়।"[৭০]

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মুসলমানদের মধ্যে ভাষা, মত এবং স্থানগত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একতার প্রয়োজনীয়তার কথা *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকাটিতে ব্যক্ত করা হয়েছিল।[৭১] একটি জাতির জন্য 'সর্বাপেক্ষা জঘণ্য ও সর্বাপেক্ষা অধিক সর্বনাশকর অবস্থা হলো তার পরাধীনতা'- বাংলার মুসলমানদের প্রতি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করে- পত্রিকাটিতে দেখানো হয়েছিল যে, স্পেনের মুসলমানগণ শিক্ষা-সভ্যতায় এবং অর্থ-সম্পদে বিজয়ী খৃষ্টানদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্বেও, পরাধীনতার অভিশাপে তাদের অস্তিত্ব পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।[৭২] সুতরাং বাংলার মুসলমানদের অস্তিত্বও যাতে পরাধীনতার অভিশাপে ইতিহাসের পুরাতত্ত্বমাত্রে পরিণত না হয় সেই বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে পত্রিকাটিতে মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছিল।[৭৩] *হেদায়েত* পত্রিকায় মুসলমানদের একতাবদ্ধ হয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।[৭৪] অন্যদিকে, বাংলার মুসলমান সমাজকে নিজেদের শক্তির পরিচয় অপরাপর সমাজের কাছে তুলে ধরবার আহ্বান জানিয়ে *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় বলা হয়েছিলঃ '... আমাদের বল কতটুকু তা অপর সমাজকে জানিয়ে দিতে হবে। আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুরা আমাদের সত্যকার স্বরূপ ও শক্তি জানেনা বলেই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ গুরুতর আকার ধারণ করছে।"[৭৫]

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এর ফলে ভারতের পুরাতন বিরোধ পুনরায় নগ্নমূর্তি ধারণ করেছিল। কংগ্রেস সাতটি প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব অর্জন করলেও 'তারা গণতন্ত্র ও শাসকোচিত মনের উদারতা কোথাও প্রদর্শন করতে পারেনি' বলে কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে প্রায়ই মুসলমান ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি নির্যাতনের সংবাদ পাওয়া যেত। বাংলার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক এইসব ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বলে *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছিল।[৭৬] এ প্রসঙ্গে পত্রিকাটিতে তাই মন্তব্য করা হয়েছিলঃ 'আজ তাই স্বায়ত্বশাসন ভারতের মত শত জাতিতে শতধা বিভক্ত দেশে দায়িত্ববোধহীন সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের হস্তে মারাত্মক অস্ত্রে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে।"[৭৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত সময়কালে ভারতের সর্বত্র মুসলমান সম্প্রদায় সামাজিক, সংস্কৃতি, ধর্মীয় সকল দিক থেকে যে নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিল তা ১৩৪৫ সনের *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী* (ঈদসংখ্যা) এর ১০৬-১১২ পৃষ্ঠার স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা হয়েছিল।

মুসলমান রাজনীতিবিদগণের মধ্যে কোন দলীয় বিভেদ না রেখে রাজনৈতিক লক্ষ অর্জনের স্বার্থে তাঁদেরকে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করবার অনুরোধ করা হয়েছিল *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায়। পত্রিকাটিতে আবদুল বারী তাঁর এক প্রবন্ধে মুসলমান নেতাদের সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, যখন মুসলিম লীগ-পার্লামেন্টারী বোর্ড বাঙলার বিভিন্ন মুসলমানদের একত্রিত করে লীগ বোর্ডকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে তৎপর তখন ফজলুল হক প্রমুখ প্রজা সমিতির নামে সমাজকে শত বিচ্ছিন্ন করতে প্রয়াস চালাচ্ছেন।[৭৮] এই জাতীয় ভূলের জন্য মুসলমানরা দুই যুগ পিছিয়ে পড়বে'- বলে তিনি এ জাতীয় সর্বনাশকর পথ থেকে ফজলুল হক সাহেবকে সরে এসে মূলদলের সঙ্গে একতাবদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।[৭৯]

অবশেষে বাঙলায় মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিরাজমান বিরোধের অবসান হয়েছিল। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বাঙলা বোর্ডের সেক্রেটারী এইচ এম সোহরাওয়ার্দী এই বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সমস্ত নির্বাচিত সদস্যদের অভিপ্রায় অনুযায়ী লীগ ও প্রজা-পার্টির নেতৃবর্গ নূতন শাসনতন্ত্রকে কার্য্যকরী করার জন্য এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হতে স্থির করেছেন। এই সম্পর্কে আলোচনার পর উভয়দলের অনুমোদন সাপেক্ষে এক চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়েছিল বলে *দৈনিক আজাদ* থেকে জানা যায়।[৮০]

লীগ ও প্রজাপার্টির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি মুসলমান রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। এ ব্যাপারে *দৈনিক আজাদ* এর নিজস্ব সংবাদদাতা লিখেছিলেন যে, মুসলিম লীগ ও প্রজাপার্টির নেতাদের মধ্যে প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করে। বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে এবং বিভিন্ন দলের প্রধান পক্ষের নিকট সন্ধান নিয়ে তিনি যতদূর জানতে পারেন, তাতে মনে হয়েছে নির্বাচিত সদস্যদের অধিকাংশই লীগ-প্রজা প্যাক্টের সংবাদে বিশেষ আনন্দিত হয়েছেন। আর সাধারণ মুসলমান সমাজ সমগ্রভাবে প্যাকেটর ঘোর পক্ষপাতী। প্যাকট ভেঙ্গে যাবে, একথা শুনতে কোন মুসলমানই যেন প্রস্তুত নয়।[৮১]

Dhaka University Institutional Repository

হানাফী পত্রিকায়ও 'মোসলেম-বঙ্গের রাজনীতি ক্ষেত্রে ঐক্য প্রতিষ্ঠা" এবং 'লগি বোর্ড ও প্রজাপার্টিতে মিতালী" এই শিরোনামে উভয়দলের মিলন-সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।[৮২] মিলন-সংবাদের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে পত্রিকাটিতে মন্তব্য করা হয়েছিলঃ '... মোসলেম বঙ্গের সর্ব্বত্রই এহ মিলন সংবাদে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই আশা করিতেছেন যে, মৌ. এ কে ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইবেন এবং অতঃপর উভয় দল দেশ ও সমাজের কল্যাণের জন্য সমবেতভাবে সাধনা করিতে সমর্থ হইবেন।[৮৩]

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ফলে বাংলার রাজনৈতিক গগণে এক নতুন যূগের সূচনা হয়েছিল। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ জয়লাভ করে প্রজাপার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন দল গঠন করে। বাংলার জনপ্রিয় নেতা এ কে ফজলুল হক সংখ্যাগুরুর সমর্থন লাভ করে ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রধানমন্ত্রী রূপে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। দেখা যায়, মুসলিম বাঙলার পত্র-পত্রিকায় '১৯৩৭ সালের স্বায়ত্বশাসিত বাঙ্গলা - নয়া শাসনতন্ত্রের প্রথম বৎসর" - এই শিরোনামে উক্ত খবর প্রকাশ করা হয়েছিল।[৮৪]

মোহাম্মদী পত্রিকায় কোয়ালিশন দলের সাফল্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ভারতের যে কোন রাজনৈতিক দলের চেয়ে যেমন নিরপেক্ষ সংখ্যাগুরু তেমনি সংহত, সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুপরিচালিত। এখানেই বাংলা গবর্ণমেন্টের সঙ্গে কংগ্রেসী গবর্ণমেন্টগুলির স্বাতন্ত্র, সুবিধা ও অসুবিধা। কিন্তু বাঙলা গবর্ণমেন্ট কোন বিশিষ্ট ও একমাত্র দলের গবর্ণমেন্ট নয়, এই গবর্ণমেন্ট লগী, প্রজা, তপসীলভুক্ত জাতি, ইউরোপীয়, হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান সকলের সমবায়ে গঠিত। তা সত্বেও বাঙলার কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা সমস্ত অসুবিধা জয় করতে সক্ষম হয়েছে।[৮৫]

১৯৩৯ সালের ৮ই এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল কমিটির এক সভায় যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে মাননীয় এ. কে. ফজলুল হক সভাপতি নির্বাচিত হন। *হেদায়েত* পত্রিকায় এই নির্বাচনের ফলাফল তুলে ধরা হয়েছিল।[৮৬] অতঃপর এ. কে. ফজলুল হক সভাপতির আসন গ্রহণ করে যে অভিভাষণ দান করেন সে সম্পর্কে পত্রিকাটিতে সবিস্তারে বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল। তিনি অভিভাষণে মূসলমান সমাজের দূরবস্থার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেন। এবং মুসলমান সমাজকে বাঁচার জন্য তাদেরকে (সমস্ত জাতিকে) সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে মুসলিম লীগে যোগ দিতে আহ্বান জানান।[৮৭]

মুলতঃ ঐ অভিভাষণে তিনি স্বসমাজকে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেনঃ 'আপনাদের কাছে আমার শেষ নিবেদন, মোছলেম লীগকে আপনারা দৃঢ়

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করুন। সঙ্গে সঙ্গে আপনারা প্রস্তুত হউন। দরকার হলে, আমাদের সকলকে জেহাদের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এছলামকে ও মুছলমানকে রক্ষা করবার জন্য আমরা দেহের শেষ রক্তবিন্দু দান করতে প্রস্তুত।"[৮৮]

জাগরণ পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, সিন্ধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মিলনীতে ভারতীয় উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তি এবং হিন্দু ও মুসলমান এই দুটি জাতির সংস্কৃতিগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি ও দুই জাতির রাজনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য ভারতবর্ষকে দুইটি যুক্তরাষ্ট্রে অর্থাৎ মুসলমান রাজ্যসমূহের যুক্তরাষ্ট্র ও অমুসলমান রাজ্যসমূহের যুক্তরাষ্ট্রে বিভক্ত করা একান্ত আবশ্যক বলে বিবেচনা করা হয়েছিল।[৮৯] সম্মেলনে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে নিখিল ভারত যুক্তরাষ্ট্রের যে পরিকল্পনা তার তীব্র প্রতিবাদ করা হয় এবং এর বিরোধিতা করে বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে উহা প্রবর্ত্তিত না করার জন্য অনুরোধ করে-বলে পত্রিকাটিতে উল্লেখ করা হয়েছিল।[৯০] সম্মেলন মনে করেছিল যে, উহা ভারতের জনসাধারণের বিশেষ করে মুসলমানদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। সম্মেলনে তাই হুসিয়ারী উচ্চারণ করে আরও বলা হয়েছিলঃ 'এই সম্মেলন আরও ঘোষণা করিতেছে যে, উপরে বর্ণিত নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রতন্ত্র রচিত না হইলে এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সহিত পরামর্শক্রমে রচিত ও নিখিল ভারত মুসলিম লগি কর্তৃক গৃহীত না হইলে কোন রাষ্ট্রতন্ত্র ভারতবর্ষের মুসলমানগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে না।"[৯১] *জাগরণ* পত্রিকা হতে আরো অবহিত হওয়া যায় যে, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ পাটনা অধিবেশনে কংগ্রেসী প্রদেশ সম্পর্কিত প্রস্তাবে বলা হয়েছিলঃ "মুসলমানদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করিবার জন্য সক্রিয় কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা হউক।"[৯২]

বাংলার মুসলমান সমাজকে কোন রকম ভ্রান্ত ধারণায় ও প্রলোভনে জড়িয়ে না পড়ার জন্য লীগের উচ্চতর পরিষদের সদস্য মওলানা মোহম্মদ আকরম খাঁ অনুরোধ করেছিলেন। তিনি মুসলমানদের মানুষের সম্মান নিয়ে বাঁচার জন্য আলস্য-জড়তা ত্যাগ করে তাদেরকে জেগে ওঠার কথা বলেছিলেন।[৯৩] 'নিখিল ভারত মোছলেম লীগের নানা শাখা-প্রশাখা স্থাপন করিয়া নিজেদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করা এবং স্বীয় মর্য্যাদাকে সংহত করিয়া তোলাই হোক তাঁহাদের আগামী কয়েক মাসের একমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য" - বলে তিনি *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় স্বসমাজের কাছে আহ্বান রেখেছিলেন।[৯৪]

যদিও "মুছলিম লীগের পাকিস্থান নিয়া ভারতময় সমালোচনার অন্ত নাই"[৯৫] তথাপি 'মুছলমানদের উন্নতি ও সংহতি সাধনে পাকিস্তান পরিকল্পনার জরুরী প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে' বলে আসাম লীগ সম্মেলনের সভাপতি এ. কে. ফজলুল হক যে অভিমত ব্যক্ত করেন তা আল-জালাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৯৬]

Dhaka University Institutional Repository

ফজলুল হক বলেনঃ "... সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া তাঁহার মনে এই প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে পাকিস্থান পরিকল্পনা প্রবর্ত্তিত হওয়া দরকার কারণ, যে সকল প্রদেশে মুছলমানরা সংখ্যালঘু অবস্থায় ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিতেছে এবং বহু অসুবিধা ভোগ করিতেছে এই পরিকল্পনা তাহাদের সংহতি সাধনে সমর্থ হইবে। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমাদের যাহারা বিরোধী, তাহারা এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যে কলরব আরম্ভ করিয়াছে এবং উঁহাকে মানিয়া লইতে অনিচছা জ্ঞাপন করিতেছে, তাহা হইতেই উহা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়।"[৯৭]

সুতরাং এ কে ফজলুল হকের প্রস্তাবে ১৯৪০ সালে লগি একবাক্যে 'পাকিস্তান'কে আদর্শ বলে গ্রহণ করে। ভারতের মুসলমান এর পর নিজেদের মাইনরিটি বলে আর পরিচয় না দিয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র জাতি বলে পরিচয় দেয়। 'তাদের দাবী আর আইন সভার আসনে সীমাবদ্ধ নয়। তারা দাবী করছে স্বতন্ত্র আবাসভূমির'- বলে *আজাদ* পত্রিকাটিতে উল্লেখ করা হয়েছিল।[৯৮]

উপসংহার

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, রাজনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ বাঙলার মুসলমানদেরকে তাদের দাবি সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের সচেতন লেখক, চিন্তাশীল ব্যক্তি, সাংবাদিকগণ মুসলমান স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট রাজনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ, সম্পাদকীয়, সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলেন- যার প্রভাব মুসলমান সমাজের উপর সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। ১৯০৬-৪০ সময়কালে মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকায় মুসলমানদের রাজনীতি চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা, স্বতন্ত্র নির্বাচন লাভ, তাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনার ভিত্তিতে বিভিন্ন আইন সভায় সংখ্যাতিরিক্ত আসন প্রদান, ১৯১৬ সালের লক্ষ্মৌ প্যাক্ট, নেহরু রিপোর্টের সমালোচনা, সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ, ১৯৩৭ সালের নির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে লেখা হয়েছিল। মুসলমান রাজনীতিবিদদের মধ্যে কোন রকম দলীয় বিভেদ না রাখার প্রতি জোর আবেদন করা হয়েছিল।

সুতরাং, সাংবাদিকতার মাধ্যমে বাঙলার মুসলমান সাংবাদিক এবং লেখকগণ স্বসমাজের মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, "পতন যুগের প্রকৃত ইতিহাস', *মাসিক মোহাম্মদী*, ৭ম বর্ষ/১ম সংখ্যা/কার্তিক/১৩৪০/পৃ: ৫৮-৫৯।

২. সৈয়দ এম্‌দাদ-আলী, 'মুসলিম বাংলার আত্মকথা', ঐ, ১০ম বর্ষ/প্রথম সংখ্যা/কার্ত্তিক/১৩৪৩) পৃ. ১।

৩. সৈয়দ এমদাদ-আলী, ঐ, পৃ. ২।

৪. ঐ, পৃ. ১০।

৫. সঙ্কলনঃ 'হিন্দু-মুসলিম বিরোধের গোড়ার কথা', ঐ, পৃঃ ৭২।

৬. ঐ, পৃ. ৭৩।

৭. ঐ।

৮. মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, 'ভারতীয় মুসলমান ও স্বাদেশিকতা', *সওগাত*, ৪র্থবর্ষ/২য় সংখ্যা/ শ্রাবণ/১৩৩৩/ পৃ: ৯৬-৯৭।

৯. সৈয়দ এমদাদ আলী, 'মুসলিম লীগ ও বাংলার মুসলমান', *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী*, ঈদ-সংখ্যা/১৩৪৪/ পৃ: ৮।

১০. মুহম্মদ হবীবুল্লাহ, 'পাকিস্তানের পটভূমি' *আজাদ*, ঈদ সংখ্যা/কার্ত্তিক/১৩৪৮/ পৃ. ১৪।

১১. ঐ, পৃ. ১৪-১৫।

১২. ঐ, পৃ. ১৫।

১৩. ঐ।

১৪. সৈয়দ এমদাদ আলী, 'আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাস', *মাসিক মোহাম্মদী*, ১৫শ বর্ষ/ ১ম সংখ্যা/ কার্ত্তিক/১৩৪৮/ পৃ: ৫।

১৫. ইসলাম-প্রচারক, ফাল্গুন/১৩১৩/উদ্ধৃত ঃ কাজী আবদুল মান্নান, এম. এ, *আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* (প্রথম খণ্ড), রাজশাহী ঃ ১৯৬১, পৃ. ২০৯-২১০।

১৬. ঐ, পৃ. ২১০।

১৭. ঐ।

১৮. সম্পাদক, 'জাতীয় ও ধর্ম্ম-সংবাদ', *ইসলাম প্রচারক*, ৮ম বর্ষ/৩য় সংখ্যা/বৈশাখ/১৩১৪/পৃ:১২০।

১৯. 'জাতীয় ও ধর্ম্ম-সংবাদ', ঐ, ৮ম বর্ষ/৮ম সংখ্যা/পৌষ/১৩১৪/পৃ:৩১৭-৩১৮।

২০. ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

২১. মুহম্মদ হবীবুল্লাহ, 'পাকিস্তানের পটভূমি' *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫।

২২. আলোচনা ঃ প্রেসিডেন্সী বিভাগের মুছলমান, *মাসিক মোহাম্মদী*, ৫ম বর্ষ/৭ম সংখ্যা/বৈশাখ/ ১৩৩৯/ পৃ. ৫১৫।

২৩. খোন্দকার গোলাম আহ্‌মদ, 'এসলামের শাসননীতি', *সওগাত*, ৪র্থ বর্ষ/ ৯ম সংখ্যা/ ফাল্গুন/ ১৩৩৩/ পৃ. ৬১৫।

২৪. শেখ হবিবর রহমান, 'জাতীয় সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান', *আল-এসলাম*, ২য় ভাগ/১ম সংখ্যা/ বৈশাখ/১৩২৩/পৃ: ৪৪।

২৫. মুহম্মদ হবীবুল্লাহ, 'পাকিস্তানের পটভূমি' *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫।

২৬. *ঐ*, পৃ. ১৬।

২৭. *ঐ*।

২৮. ঝাড়ুদার, 'হিন্দুস্থানের পাহারাওয়ালা', *ধূমকেতু*, ১ম বর্ষ/ ২০শ সংখ্যা/ ২১শে কার্ত্তিক/ ১৩২৯/ পৃ.৫।

২৯. মুহম্মদ হবীবুল্লাহ, 'পাকিস্তানের পটভূমি' *প্রাগুক্ত*।

৩০. *ঐ*।

৩১. *ঐ*।

৩২. *ঐ*।

৩৩. নিখিল-ভারত সর্ব্বদল মোসলেম সম্মিলনী, *আহলে হাদিস*, ২য় বর্ষ/ ৪র্থ সংখ্যা/ পৌষ/১৩৩৫/ পৃ.৫।

৩৪. *ঐ*।

৩৫. *ঐ*, ২য় বর্ষ/ ৬ষ্ঠ সংখ্যা/ পৌষ/ ১৩৩৫/ পৃ. ২।।

৩৬. *ঐ*।

৩৭. সৈয়দ এমদাদ আলী, 'আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাস', *মাসিক মোহাম্মদী*, ১৫শ বর্ষ/ ১ম সংখ্যা/ কার্ত্তিক/১৩৪৮/ পৃ: ৬।

৩৮. সৈয়দ এমদাদ আলী, *প্রাগুক্ত*; পৃ: ৭।

৩৯. সৈয়দ এমদাদ-আলী, 'মুসলিম বাংলার আত্মকথা', *প্রাগুক্ত*; পৃ. ৬।

৪০. সৈয়দ এমদাদ আলী, 'মুসলিম লীগ ও বাংলার মুসলমান', *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী*, প্রাগুক্ত; পৃ: ৮৫।

৪১. এছলামাবাদী, "আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা", *আল-এসলাম*, ৫ম ভাগ/১০ম সংখ্যা/ মাঘ/ ১৩২৬/ পৃ:৫৬৯-৫৭০।

৪২. মোহাম্মদ আনওর আলী, "এছলামে জাতীয়তা", *ঐ*, ৫ম ভাগ/১১শ সংখ্যা/ ফাল্গুন/ ১৩২৬/ পৃ:৬০৬-৬০৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪৩.এছহাক মিঞা বি-এ, "মোসলমান ছাত্রের হিন্দু-ভাব", *এস্‌লাম দর্শন*, ৫ম বর্ষ/১ম সংখ্যা/ আশ্বিন/ ১৩৩২/ পৃ: ২২।

৪৪.*ঐ*, পৃ. ২৩।

৪৫.*ঐ*, পৃ. ৩৬।

৪৬.মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'মিশ্র ও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন' *মাসিক মোহাম্মদী*, ৪র্থ বর্ষ/১০ম সংখ্যা/শ্রাবণ/ ১৩৩৮/পৃ: ৭২১।

৪৭.ইতিহাসের শিক্ষা, *ঐ*, পৃ. ৭২৪।

৪৮.মুহম্মদ হবীবুল্লাহ, 'পাকিস্তানের পটভূমি' *আজাদ*, ঈদ সংখ্যা/*প্রাগুক্ত*; পৃ. ১৬, ৫৭।

৪৯.*ঐ*।

৫০.স্বাগত জওয়াহের লাল, *দৈনিক আজাদ*, বৃহস্পতিবার, ১৯শে কার্ত্তিক/ ১৩৪৩/ পৃ.৪।

৫১.*ঐ*।

৫২.*ঐ*, রবিবার, ২২শে কার্ত্তিক/ ১৩৪৩/ পৃ. ৭।

৫৩.বিবিধ-প্রসঙ্গ, *ঐ*, মঙ্গলবার/ ২৪শে কার্ত্তিক/ ১৩৪৩/ পৃ. ৪।

৫৪.*ঐ*।

৫৫.কংগ্রেসের অহেতুক দাবি, *ঐ*, বৃহস্পতিবার/ ৩রা অগ্রহায়ণ/ ১৩৪৩/ পৃ. ৪।

৫৬.*ঐ*, মঙ্গলবার/ ২১শে পৌষ/ ১৩৪৩/ পৃ. ৫।

৫৭.*ঐ*, ২৫শে পৌষ/ ১৩৪৩/ পৃ. ৩।

৫৮.*ঐ*।

৫৯.*ঐ*, মঙ্গলবার/ ২৮শে পৌষ/ ১৩৪৩/ ১২ই ফেব্রুয়ারী/ ১৯৩৭/ পৃ. ৩।

৬০.*ঐ*।

৬১.পণ্ডিতজীর দৃষ্টিভ্রম, *ঐ*, বুধবার/ ২৯শে পৌষ/ ১৩৪৩/ পৃ. ৪।

৬২.*ঐ*।

৬৩.*ঐ*।

৬৪.*ঐ*, ৯ই মাঘ/ ১৩৪৩/ ২২শে ফেব্রুয়ারী/ ১৯৩৭/ পৃ. ৮।

৬৫.*ঐ*।

৬৬.*ঐ*।

৬৭.*ঐ*, ১৩ই মার্চ/ ১৯৩৭/ পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

৬৮.*ঐ*।

৬৯.মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী, 'বর্ত্তমান রাজনীতির ধারা', *জাল-ইস্‌লাহ*, ৪র্থ বর্ষ/১ম সংখ্যা/ শ্রাবণ/১৩৪৪/ পৃ: ৬।

৭০.আবুল হোসেন, এম. এ, এম-এল, 'বাংলার রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ', *বুলবুল*, ১ম বর্ষ/২য় সংখ্যা/ ভাদ্র-অগ্রহায়ণ/১৩৪০/ পৃ: ১৫৪।

৭১.আলোচনা ঃ লক্ষ্ণৌ-লীগ, *মাসিক মোহাম্মদী*, ১১শ বর্ষ/ ১ম সংখ্যা/ কার্ত্তিক/ ১৩৪৪/ পৃ. ৭৬-৭৮।

৭২.আলোচনা ঃ ইতিহাসে শিক্ষা, *ঐ*, ১১শ বর্ষ/ ২য় সংখ্যা/ অগ্রহায়ণ/ ১৩৪৪/ পৃ. ১৪৭।

৭৩.*ঐ*, পৃ. ১৪৮।

৭৪.মৌ. গোলাম রব্বানী, কৈথন, করুই-বর্দ্ধমান, 'রমজান', *হেদায়াত*, ২য় বর্ষ/২য় সংখ্যা/ পৌষ/ ১৩৪৩/ পৃ: ৩৪।

৭৫.জরীন কলম, 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ', *মাসিক মোহাম্মদী*, ১২শ বর্ষ/ ১০ম সংখ্যা/ শ্রাবণ/ ১৩৪৬/ পৃ. ৭১৯।

৭৬.মজলুম ঃ 'ক্ষমতা-গর্ব্বিত কংগ্রেসী শাসন ও স্বৈরাচারের এক দিক', *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী*, ঈদ সংখ্যা/ ১৩৪৫/ পৃ. ১০৫-১০৬।

৭৭.*ঐ*, পৃ. ১০৫।

৭৮.আবদুল বারী, 'মোছলেম বঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতি', *দৈনিক আজাদ*, রবিবার/৪ঠা মাঘ/ ১৩৪৩/১৭ই জানুয়ারী/১৯৩৭/ পৃ. ৩।

৭৯.*ঐ*।

৮০.*ঐ*, মফস্বলে- ৩রা ফাল্গুন/সোমবার/১৪ই ফেব্রুয়ারী/১৯৩৭/ পৃ. ৭।

৮১.মোছলেম লীগ পার্লামেন্ট্রারী বোর্ড ও বাঙ্গলার মন্ত্রীত্ব সমস্যা, *ঐ*, ১৬ই ফেব্রুয়ারী/১৯৩৭/ পৃ. ৩।

৮২.মোছলেম বঙ্গের রাজনীতি ক্ষেত্রে ঐক্য-প্রতিষ্ঠা, 'লীগ-বোর্ড ও প্রজা-পার্টিতে মিতালী', *হানাফী*, (কোরবাণী সংখ্যা), ১১শ বর্ষ/৩০শ সংখ্যা/ফাল্গুন/১৩৪৩/ পৃ. ৩।

৮৩.*ঐ*।

৮৪.রাজনীতিক ঃ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আর্থিক বিবর্ত্তন, *সাপ্তাহিক মোহাম্মদ*, ঈদসংখ্যা/১৩৪৫/ পৃ. ৮৯।

৮৫.প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসনের দুই বৎসর, *মোহাম্মদী*, ১৩৪৬/ পৃ. ২৫।

৮৬.বিবিধ-সংবাদ, 'প্রাদেশিক মোসলেম লীগের কর্ম্মকর্ত্তার নির্ব্বাচন', *হেদায়াত*, ৪র্থ বর্ষ/৬ষ্ঠ সংখ্যা/ বৈশাখ/ ১৩৪৬/ পৃ. ১৬৩।

৮৭.মোসলেম লীগের সাধারণ সভায় মাননীয় মি. এ কে ফজলুল হকের অভিভাষণ, *ঐ*, ৪র্থ বর্ষ/৭ম সংখ্যা/ জ্যৈষ্ঠ/১৩৪৬/ পৃ. ১৭৮।

৮৮.*ঐ*, পৃ. ১৮১-১৮২।

Dhaka University Institutional Repository

৮৯.সিন্ধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মিলনীতে গৃহীত প্রস্তাব, *জাগরণ*, ১ম বর্ষ/৩২শ সংখ্যা/ কার্ত্তিক/ ১৩৪৫/ পৃ. ৮।

৯০.*ঐ*।

৯১.*ঐ*।

৯২.'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ পাটনা অধিবেশন' - 'কংগ্রেসী প্রদেশ সম্পর্কিত প্রস্তাব', *ঐ*, ১ম বর্ষ/ ৪২শ সংখ্যা/ পৌষ/ ১৩৪৫/ পৃ. ৬।

৯৩.*দৈনিক আজাদ*, ৮ই মে/ ১৯৩৭/ পৃ. ৪।

৯৪.*ঐ*।

৯৫.মুসলিম জাতির উপর নিষেধাজ্ঞা, *আল-জ্বালাল*, ১ম বর্ষ/ ৩৫শ সংখ্যা/ ফাল্গুন/ ১৩৪৭/ পৃ. ২।

৯৬.'আসাম লীগ সম্মেলনের সভাপতি মাননীয় মি. হকের অভিভাষণ, *ঐ*, ১ম বর্ষ/ ৩২ শ সংখ্যা/ মাঘ/ ১৩৪৭/ পৃ. ৪।

৯৭.'মুছলমানদের দুরবস্থা', *ঐ*।

৯৮.মুহম্মদ হবীবুল্লাহ, 'পাকিস্তানের পটভূমি' *আজাদ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

পাকিস্তান আন্দোলনে সংবাদ পত্রের ভূমিকা, ১৯৪০-৪৭

১৯৪০ সাল নাগাদ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে দুটি ধারা লক্ষ করা গিয়েছিল। প্রথমত: বিচ্ছিন্নতাবাদী ধারা, দ্বিতীয়ত: ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তার ধারা। প্রথম ধারায় অধিকাংশ মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক মনোভাব চরম পর্যায়ে উপনীত হতে দেখা যায়। দ্বিতীয় ধারায় লক্ষ করা যায় যে, বাঙালি মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র অংশ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই ধারার প্রবক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কাজী নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির প্রমুখ। তাঁরা যে সকল পত্রিকায় লিখতেন সেগুলিতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে অভিমত তুলে ধরেছিলেন।[১] 'পাকিস্তান' দাবিকে মূল লক্ষ করে মুসলিম লীগ এর স্বপক্ষে জনসাধারণের সম্মুখে যে বক্তব্য দিয়েছিল, সমসাময়িক বিভিন্ন সংবাদ-সাময়িকপত্র সেগুলি প্রকাশ করে জনমত জোরালো করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। পাশাপাশি 'নবযুগ', 'পল্লী-বান্ধব' প্রভৃতি পত্রিকায় ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির কথা বলা হয়েছিল। ১৯৪০-৪৭ সময়কালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এর প্রতিফলন কিরুপ হয়েছিল সে সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হলো।

পাকিস্তান আন্দোলন চলাকালীন সময়েও দেখা যায় যে, বাঙলার সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে এ, কে, ফজলুল হক ১৯৪০ সালে বাঙলায় গোল টেবিল বৈঠক আহবান করেছিলেন। ঐ বৈঠকে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট ৪৩ জন নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। হিন্দু এবং মুসলমান সদস্যদের নামসহ ঐ সংবাদটি ২৪ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ সালের দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[২] পত্রিকাটি পরের দিন রিপোর্ট করেছিল যে, বিকেল ৩টার সময় সেক্রেটারিয়েটে প্রধানমন্ত্রীর কক্ষে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সম্মেলনে উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় ৪২জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।[৩] পত্রিকাটিতে যাঁদের নাম প্রকাশিত হয়েছিল তাঁরা হলেন এ, কে, ফজলুল হক, স্যার নাজিমুদ্দীন, নওয়াব মোশাররফ হোসেন, ঢাকার নওয়াব বাহাদুর, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ, এন, আর, সরকার, স্যার বি,পি, সিংহ রায়, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জ্জী ডাঃ বি,পি, রায়, মিঃ শরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী, মিঃ তুষার কান্তি ঘোষ, স্যার এম, এন, মুখার্জ্জী, এস,এম, ব্যানার্জ্জী, বি,পি, চ্যাটার্জ্জী,

Dhaka University Institutional Repository

পি,ভি, রায়কত, এম, বি, মল্লিক, স্যার বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা, পদ্মরাজ জৈন, নশীপুরের রাজা ভূপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ বাহাদুর, এম,কে, বসু, এল,সি, চ্যাটার্জ্জী, মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী, তমিজউদ্দীন খান, খায়রুল আনাম খাঁ, অশ্বিনীকুমার ঘোষ, অনুকূল চন্দ্র দাস, বিরাট চন্দ্র মন্ডল, পুলিনবিহারী মল্লিক, ফজলুর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরী, কে শাহাবুদ্দীন, এ,আর, সিদ্দিকী, খান সাহেব হামিদউদ্দীন আহমদ, খান বাহাদুর এম,এ, মোমেন, খান বাহাদুর হাশেম আলী, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি।[৪] বৈঠকে বাঙলার সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় ফজলুল হক এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে, প্রাণখুলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমবেত ও ঐকান্তিক চেষ্টা দ্বারা এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।[৫]

১৯৪০ সালের ২২শে মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সম্মেলনে সভাপতি হিসাবে এম, এ, জিন্না যে অভিভাষণ দেন, ২৩ মার্চের *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় তা গুরুত্ব সহকারে ছাপানো হয়েছিল। পত্রিকাটি থেকে জানা যায় ঐ অভিভাষণে জিন্নাহ হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক আবাস প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতবর্ষ বিভাগের দাবী করে বলেছিলেন যে, মুসলমানরা বৃটিশ গবর্ণমেন্ট কিংবা কংগ্রেস কাউকেই বিশ্বাস করতে পারে না। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আড়াই বৎসর ধরে চলার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, সমস্ত প্রকার রক্ষাকবচ বে-ওয়ারিশ চিঠিরই সামিলমাত্র।[৬] লীগের রাজনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কে উপস্থিত জনতাকে লক্ষ করে সম্মেলনে তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে, ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক সমস্যাকে নতুনভাবে বিবেচনার জন্য তাঁরা যে দাবি করেছেন বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তা মেনে নিয়েছেন এবং অন্যান্য দাবি সম্পর্কে পত্র ব্যবহার চলছে।[৭]

২৪শে মার্চ *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় লিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনের সংবাদ পরিবেশন করে মন্তব্য করা হয়েছিল যে, এই অধিবেশনটি ভারতীয় মুসলমানদের সর্বাধিক প্রতিনিধিত্বমূলক সভাসমূহের অন্যতম ছিল। কারণ সম্মেলনে পাঞ্জাব, বাঙলা ও আসামের মন্ত্রীমন্ডলী ছাড়াও ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাসমূহের মুসলমান সদস্যদের অধিকাংশই উপস্থিত ছিলেন, যাঁরা জিন্নাহর অলিখিত একশত মিনিটের অভিভাষণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করেছিলেন।[৮] পত্রিকাটিতে মুসলিম লীগের তৃতীয় দিনের মূল অধিবেশনের বর্ণনা দিয়ে বিহার মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট নওয়াব মোহাম্মদ ইসমাইল খান, বেলুচিস্তান মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ইসা খান, মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদের লীগ দলের নেতা আবদুল হামিদ, বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদের মুসলিম লীগ পার্টির ডেপুটি লীডার ইসমাইল চুন্দ্রিখার, মধ্য প্রদেশ মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ আবদুর রউফ শাহ এবং পাঞ্জাবের ডাঃ মোহাম্মদ আলম প্রদত্ত বক্তৃতা তুলে ধরা হয়েছিল।[৯] ঐ সভায় ডাঃ আলম তাঁর বক্তৃতায় তেজোদীপ্ত কন্ঠে বলেছিলেন যে, 'স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র

Dhaka University Institutional Repository

নিছক কল্পনা বিলাস নয়'। অন্যদিকে আবদুল হামিদের অভিমত হলো- নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গত ৩৭ বৎসর ধরে স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে এই আশায় হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন যে, ভারত স্বাধীন হলে দেশের প্রত্যেক অধিবাসীই স্বাধীনতা ভোগ করবে। কিন্তু এগারটি প্রদেশের মধ্যে (৭ টিতে) সাতটিতে আড়াই বৎসরব্যাপী কংগ্রেস রাজ তাঁদের এই বিশ্বাস ক্ষুন্ন করেছে'। ইসমাইল চুন্দ্রিখার তাঁর বক্তৃতার একস্থানে বলেন যে, মুসলমানগণ কংগ্রেস প্রস্তাবিত গণ-পরিষদ পরিকল্পনা কখনই সমর্থন করবে না, কারণ তাতে মুসলমানদের ভাগ্যে মাত্র এক চতুর্থাংশ আসন বাড়বে।[১০]

লীগের লাহোর অধিবেশন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল সে কথা উল্লেখ করে পত্রিকাটিতে বলা হয়েছিলঃ"... এই অধিবেশনে লীগের নীতিকে নূতনভাবে লক্ষ্যাভিসারী করার ফলে মোছলেম জাগরণের ইতিহাসে এক নবযুগ সূচিত হইয়াছে। স্বায়ত্তশাসিত এবং সার্ব্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন নির্বাচননূলক অঞ্চলসমূহ লইয়া স্বাধীন মোছলেম ভারতের প্রতিষ্ঠাই লীগের লক্ষ্য বলিয়া বর্ত্তমান অধিবেশনে সুনির্দ্দিষ্টভাবে নির্ণীত হইয়াছে"।[১১]

সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের পাশাপাশি একটি ক্ষীণ ব্যতিক্রমধর্মী ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী ধারার নিদর্শন পাওয়া যায়। স্বল্পশিক্ষিত ও রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার তরঙ্গ প্রবাহিত করার প্রতি বাঙালি মুসলমান সাংবাদিকগণ সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেও কোন কোন পত্রিকা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়িক বিভেদ ভুলে গিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে অর্থাৎ ভারতে বসবাসকারী সকল ধর্ম,বর্ণ ও গোত্রের অধিবাসী বৃন্দকে সম্মিলিতভাবে ভারতবর্ষকে একটি শক্তিশালী দেশরূপে প্রতিষ্ঠিত করার করার আহবান জানিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে রাজশাহী থেকে প্রকাশিত পত্রিকা '*পল্লী-বান্ধব*' এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে-ইংরেজ শাসকের স্বপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য সরকার ভারতবাসীকে অস্ত্র দিয়ে উৎসাহিত না করায় ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ সালে 'পল্লী-বান্ধব' এর এক সম্পাদকীয়তে ইংরেজ শাসকের সমালোচনা করে বলা হয়েছিলঃ" ইংরেজ ভারতবাসীকে মেষশাবকে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবাসীর হাতে অস্ত্র দিতে ইংরেজ সাহস পায় নাই"।[১২]

এটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, *পল্লী-বান্ধব* "ভারতে ইংরেজ শাসন ভগবানের দান"[১৩] বলে মন্তব্য করেছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষ বিশেষতঃ ইংরেজ শক্তির সপক্ষে জোর প্রচারাভিযান, অর্থ ও সৈন্য

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রহ এবং জার্মানী ও জাপানের 'বর্বরতা' সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছিল। একই সঙ্গে পত্রিকাটি ভারতবর্ষকে স্বাধীন, সার্বভৌম ও শক্তিশালী দেশ হিসাবে দেখতে চেয়েছিল।

এছাড়াও ১৯৪৪ সালের ঈদসংখ্যা *নবযুগ* পত্রিকায় অধ্যাপক হুমায়ুন কবির তাঁর 'লীগ ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা' নামক প্রবন্ধে পাকিস্তান দাবীকে অযৌক্তিক এবং উদ্দেশ্যমূলক বলে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন।[১৪] তিনি ঐ প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে, ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের অর্জ্জিত সাফল্যে ইংরেজ শাসকের এই ভয় হয়েছিল যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে সকল ভারতবাসী সম্মিলিতভাবে স্বাধীনতার দাবী করে বসলে তা অগ্রাহ্য করা সম্ভবপর হবে না। তাই ভারতবাসীর মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি এবং জাতীয় স্বাধীনতার মুখপাত্র কংগ্রেসের প্রভাব ক্ষুন্ন করার মধ্যে ইংরেজ এ সমস্যার একমাত্র সমাধান খুঁজে পেয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে সাভারকর এর নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভাকে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গঠন এবং অন্যদিকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে সমস্ত সুবিধা দিয়ে মুসলিম লীগের সাহায্যে কংগ্রেসের অসামান্য প্রভাবের ব্যাঘাত ঘটানোর ব্যবস্থা করা হয়।[১৫] তাঁর মতে, জিন্নাহর পূর্বে আরও অনেক মুসলমান নেতা ভারতের ইতিহাসে লক্ষ করা গিয়েছিল যাঁদের কাউকেই ইংরেজ শাসক মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু জিন্নাহকে আগ্রহভরে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র নেতা হিসাবে স্বীকৃতিদানের মধ্যে বৃটিশরাজের এই মনোভাবই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।[১৬] তিনি জিন্নাহকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের 'ক্রীড়নক' বলে তাঁর (জিন্নাহর) কঠোর সমালোচনা করেছিলেন।[১৭] হোমরুল লীগ সংক্রান্ত কাজ, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি সাধন প্রভৃতি ভূমিকার কারণে মিঃ জিন্নাহ ভারতের সর্বত্র সুনাম অর্জন করেছিলেন। আর সরোজিনু নাইডু তাঁকে 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের দূতরূপে' অভিহিত করেছিলন বলে পত্রিকাটিতে মন্তব্য করে হুমায়ুন কবির লিখেছিলেনঃ" আর আজ মিঃ জিন্না 'মুসলমান রাষ্ট্র আর' হিন্দু রাষ্ট্রের' কথা বল্‌ছেন এবং 'পাকিস্তান' ও 'হিন্দুস্থান' এই দুইটি ভাগে দেশকে ভাগ করতে চাচ্ছেন। এর চাইতে বেদনাদায়ক পরিবর্তন অথবা অবাঞ্ছিত রুপান্তরের নজীর বোধহয় ইতিহাসে আর নেই।"[১৮]

পাকিস্তান দাবীর সপক্ষে জনমত সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় মুসলমান সাংবাদিকগণ যে কোন কোন সময় সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে নিজেদের উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা সত্যই প্রশংসনীয় ব্যাপার।

সাপ্তাহিক সংবাদপত্র *যুগভেরী*তেও বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য তাদের যে কর্মকান্ড সে বিষয়েও ব্যাপকভাবে আলোচনা স্থান পেয়েছিল, পত্রিকাটিতে

Dhaka University Institutional Repository

'কিছুতেই হিন্দু প্রভুত্ব মানিয়া লইব না' শিরোনাম দিয়ে সিন্ধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সভায় জিন্নাহ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা প্রকাশ করা হয়েছিল। ঐ বক্তৃতায় জিন্নাহ মুসলমানদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, বৃটিশ ভারত ত্যাগ করলে অখন্ড হিন্দুস্তানের কেন্দ্রে হিন্দুদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এ অবস্থায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন একটা প্রহসনে পরিণত হবে। কারণ তখন তাদেরকে কেন্দ্রীয় সরকারের হুকুম পালন করতে বাধ্য করা হবে। তাছাড়া মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশ গুলির অবস্থা ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের মত হয়ে দাঁড়াবে। যেখানে সমস্ত রাজ্যকে স্বাধীন মনে হবে অথচ কোন ক্ষমতা তাদের থাকবে না। এ জন্য তিনি মুসলমানদের হিন্দু প্রভুত্ব মেনে না নেওয়ার জন্য আহবান জানান।[১৯]

আহমদনগর জেলা লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় বোম্বাই প্রাদেশিক মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীর সালারে-সুবা ডাঃ আবদুল হামিদ কাযী (পি-এইচ.ডি) এই বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃতির ভিত্তিতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও তার নেতা জিন্নাহ দেশের স্বাধীনতার জন্য গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা চালাতে এবং কংগ্রেসের সঙ্গে মীমাংসায় উপনীত হতে সর্বদাই রাজী আছেন। যে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের উপর দেশের স্বাধীনতা নির্ভর করে, সেই ঐক্য প্রতিষ্ঠায় গান্ধী যদি আন্তরিক থাকেন তবে তিনি পুনরায় জিন্নাহর নিকট পত্র মারফৎ স্পষ্ট ভাষায় মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবি মেনে নেওয়ার কথা ঘোষণা করুন। জিন্নাহ গান্ধীর কাছে মুসলমানদের দাবির স্বীকৃতিজ্ঞাপক পত্র আশা করেন, কোন প্রেমপত্র নয়।[২০]

জিন্নাহ ভারতের প্রায় সর্বত্রই যখন যেখানে সমাবেশ করেছেন সেখানেই তিনি লীগের 'পাকিস্তান' দাবিকে কেন্দ্র করে যে কর্মকান্ড তার সাফল্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। ১৯৩৭ সাল বিশেষ করে ১৯৪০ সালে 'পাকিস্তান পরিকল্পনা' গ্রহণের পর হতে মুসলিম লীগ এ যাবৎ বিচ্ছিন্ন, অসংঘবদ্ধ ও লক্ষ্য হারা মুসলমান প্রাণে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চার করা ছাড়াও সকল মুসলমান সংখ্যাগুরু প্রদেশ যেমন বাঙলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল। পত্র-পত্রিকাগুলি জিন্নাহর নেতৃত্বে লীগের এই সমস্ত অগ্রগতির কথা উচ্ছাসের সঙ্গে প্রকাশ করেছিল।[২১]

যুগভেরী পত্রিকায় এই সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল যে, জিন্নাহ বেলুচিস্তান সফর করলে সেখানকার মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা লক্ষ করা গিয়েছিল। ১৯৪৩ সালের ৩ জুলাই বেলুচিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম সম্মেলন আরম্ভ হয় এবং দুই দিন অধিবেশন চলে। অধিবেশনের শেষ দিনে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে কাজী মোহাম্মদ ঈশা খান মিঃ জিন্নাহকে 'আমির' এর (নিদর্শন) স্বীকৃতি স্বরূপ

Dhaka University Institutional Repository

তরবারী উপহার দিলে এর ব্যবহার সম্পর্কে জিন্নাহ বলেছিলেন যে 'শুধু আত্মরক্ষার জন্যই এই তরবারী কোষমুক্ত করা হবে, আক্রমন উদ্দেশ্যে নয়'।[২২] পত্রিকাটি আসাম প্রাদেশিক লীগকে উপযুক্ত পরিমাণে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার জন্য এ ব্যাপারে আসামের সকল মুসলমান জনসাধারণকে সাহায্য করতে অনুরোধ জানিয়েছিল।[২৩]

নিখিল আসাম মুসলিম লীগ গণ্যমান্য মুসলমান ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণসহ যে কনফারেন্সের আয়োজন করেছিল পত্রিকাটিতে সে সম্পর্কেও রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, হায়দারাবাদের নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান, নবাব ইস্‌মাইল খান, চৌধুরী খালিকুজ্জামান, খাজা নাজিমুদ্দিন, রাজা মাহমুদাবাদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে দাওয়াত করা হয়েছিল। এছাড়া ২লক্ষ শ্রোতা ও ৫০/৬০ হাজার ফওজে ইস্‌লাম যাতে একত্রে বসতে পারে এরূপ একটি বিরাট প্যান্ডেল প্রস্তুত করা হচ্ছে। বস্তুত জানমাল কুরবাণী করে পাকিস্তান হাসিল করবার জন্য আসামের জনগণকে বদ্ধপরিকর হতে আহবান জানানো হয়েছিল ঐ কনফারেন্সে।[২৪]

তাই *যুগভেরী*'র সম্পাদকীয়তে একই সঙ্গে আশাবাদ ও হুশিয়ারী উচ্চারণ করে লেখা হয়েছিলঃ "আশাকরি, যুগ-মানবের এই ঐক্যের আহবান ব্যর্থ হইবে না এবং তাঁর রক্তসঙ্কেতে সচেতন হইয়া আমাদের আত্মভোলা মুসলিম ভ্রাতাভগ্নী আল্লার রজ্জুকে আঁকড়াইয়া ধরিবেন। জানিবেন-মুহূর্তের গাফ্‌লাৎই আমাদের মরণ বহিয়া আনিবে"।[২৫]

হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানের লক্ষে রাজা গোপালাচারী গান্ধীর অনুমোদনক্রমে কতকগুলি সূত্র রচনা করেন যা ১৯৪৪ সালের *দেশের কথা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[২৬] সূত্রগুলি হলো :

(১) স্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্র সংক্রান্ত নিম্নোক্ত শর্তাদি সাপেক্ষে লীগ ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করে এবং পরিবর্ত্তনকালীন সময়ের জন্য অস্থায়ী গর্বণমেন্ট গঠনে কংগ্রেসের সহায়তা করবে।

(২) যুদ্ধাবসানে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের নিশ্চিতভাবে মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকাগুলির জেলাসমূহের সীমানা নির্দ্ধারণের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করা হবে। এই সকল অঞ্চলে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার বা অন্য কোনও বাস্তব ভোট-ব্যবস্থার ভিত্তিতে গণভোট দ্বারা হিন্দুস্তান হতে পৃথক হওয়ার প্রশ্ন চূড়ান্ত ভাবে মীমাংসিত হবে। সংখ্যাগুরু দল হিন্দুস্তান হতে পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত করলে তা-ই কার্যকরী হবে। সীমান্তবর্ত্তী জেলাগুলির ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনও রাষ্ট্রে যোগদানের অধিকার থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) গণভোট গ্রহণের পূর্বে প্রত্যেক দলের নিজ নিজ মতবাদ প্রকাশের অধিকার থাকবে।

(৪) পৃথক হওয়ার পর নিরাপত্তা,বানিজ্য, চলাচল ব্যবস্থা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলি নিয়ে পারস্পরিক চুক্তি হবে।

(৫) সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতেই অধিবাসীদের স্থানান্তরিত করা যাবে।

(৬) বৃটেন ভারত শাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তরিত করার পরই কেবল এই সকল শর্ত পালিত হওয়া বাধ্যতামূলক হবে।[২৭]

কিন্তু রাজা গোপালাচারী রচিত সূত্র জিন্নাহ ব্যক্তিগত দায়িত্বে গ্রহণ ও বর্জনে তাঁর অসমর্থের কথা জানিয়ে তা লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সমক্ষে উপস্থাপিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ঐ পত্রিকাটিতে মন্তব্য করা হয়েছিল যে, ইতিপূর্বেও লীগের সমক্ষে বহু আপোষ প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল কিন্তু তা ধোপে টিকে নাই। তবে কেবল লীগ তার দাবিতে অটল থাকার কারণে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে শুধু তা-ই নয়, বরং ইংরেজ সরকার এবং কংগ্রেসের লীগের দাবীকে ক্রমাগত অনুমোদন দানের কারণে লীগের কর্মকর্তারা একদিকে যেমন তাঁদের দাবীর মাত্রা জোরদার করছিলেন অপরদিকে তেমনি তাঁদের ভাবগতিও অধিকতর অনমনীয় হয়ে উঠছিল। তাই আবারো যাতে মিলন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে না যায় সেই কারণে রাজা গোপালাচারী জিন্নাহর পূর্ব অনুমোদন চেয়েছিলেন।[২৮]

পত্রিকাটিতে বলা হয়েছিল যে, লীগ নেতাদের মনে রাখা উচিত ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশই যদি পাকিস্তানের সমর্থক হয়, তাহলে পাকিস্তান এলাকার সুনির্দিষ্টভাবে সংখ্যালঘু অধিবাসীদের ভোটের জোরে তা উল্টানো যাবে না। কিন্তু লীগ ছাড়াও অন্যান্য মুসলমান দল আহ্‌রার, খাকসার, মুসলিম মজলিস, আজাদ মুসলিম-সম্মেলন প্রভৃতি সকলেই লীগের নীতি ও কার্য্যক্রমের বিরোধী। তাছাড়া লীগের সবচাইতে বেশী আপত্তি মনে হয় রাজাজীর প্রস্তাবের শেষ সূত্রের বিরুদ্ধে ছিল বলেই তা গ্রহণ করতে অসম্মত হয়েছিল।[২৯]

উল্লেখ্য যে, *দেশের কথা* পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারা অসাম্প্রদায়িক ছিল। পত্রিকাটির অধিকাংশ বক্তব্যই ছিল অবিভক্ত-ভারত সম্পর্কিত। পত্রিকাটিতে তাই ইংরেজ শাসকের কঠোর সমালোচনা করে লেখা হয়েছিল যে, বৃটিশ গবর্ণমেন্টের দুমুখো নীতির কারণে ভারত ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে বিভক্ত হওয়ার দিকেই অগ্রসর হতে থাকে। সরকার কংগ্রেসের অখন্ড জাতীয়তার দাবিকে সুস্পষ্ট ভাষায় সমর্থন না করায় এবং বিগত কয়েক বৎসর ধরে লীগের ভারত বিভাগের দাবীকে আমেরী প্রচ্ছন্নভাবে প্রশ্রয় দেওয়ার কারণে

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান পরিকল্পনা এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ভারতবাসীর পক্ষে এখন এই অপ্রিয় সত্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া বিকল্প কোন পন্থা নাই।[৩০] এ সম্পর্কে পত্রিকাটিতে তাই বলা হয়েছিলঃ "ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য আজ অনেকটা সন্দেহের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। পাকিস্তান দাবী সম্পর্কে যিনি যেরূপ মতই পোষণ করুন না কেন, এ বিষয়ে সকলেই একমত যে দেশের কোনও বড় রকমের এলাকাকে জোর করিয়া মৈত্রীবদ্ধ রাখা যাইবে না। যাহাই ঘটুক না কেন, একথা সুনিশ্চিত যে, মৈত্রীর মূল্য হিসাবে আমাদিগকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের পরিকল্পনা ত্যাগ করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টকে সর্ব্বনিম্ন ক্ষমতা দান-- ইহাই হইবে মুসলমান এবং দেশীয় রাজ্যগুলির দাবী"।[৩১]

১৯৪৫ সালের ১লা জুলাই *দেশের কথা* পত্রিকায় আরও রিপোর্ট করা হয়েছিল যে, ভারতীয় সমস্যার সমাধান এবং অচলাবস্থার অবসানের জন্য সাময়িকভাবে শাসন পরিষদ গঠন সম্পর্কে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সম্প্রদায়ের নেতাদের যে সম্মেলন আহবান করেছিলেন, তার অধিবেশন আরম্ভ হয়েছিল ১৯৪৫ সালের ২৫ জুন, সোমবার ১১টার সময় সিমলার লাট-প্রাসাদে। এই সম্মেলনে যোগদানকারীগণ ছিলেন-সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব, সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রী স্যার গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লা, পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী মালিক খিজির হায়াৎ খান, আসামের প্রধানমন্ত্রী স্যার মোহাম্মদ সাদুল্যা, বাঙলার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দীন, বিহারের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিং, মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রবিশঙ্কর শুক্ল, বোম্বাই এর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বি,জি,খের, যুক্ত প্রদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, মাদ্রাজের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজা গোপালাচারী, উড়িষ্যার প্রধানমন্ত্রী পার্লাকিমেদীর রাজা, কেন্দ্রীয় পরিষদের কংগ্রেসী দলের নেতা ভুলাভাই দেশাই ও লীগ দলের সহকারী নেতা নবাবজাদা লিয়াকত আলি খান এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদের লীগ ও কংগ্রেস দলের নেতাগণ। এছাড়াও, তফসিলী, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়সমূহের নেতারাও সম্মেলনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। কংগ্রেস দলের সভাপতি হিসাবে মৌলানা আজাদ এবং লীগ সভাপতি হিসাবে জিন্নাহ আলোচনায় মূখ্য অংশগ্রহণ করেন।[৩২] অতএব পত্রিকাটি "লীগ ও কংগ্রেসের দাবী' এই শিরোনামে সংবাদ দিয়েছিল যে, শাসন পরিষদের আসন বন্টন বিষয়ে লীগের দাবী ছিল যে, নূতন শাসন পরিষদে যে মুসলমান সদস্যগণকে মনোনীত করা হবে, লীগই তাঁদের সকলকে নির্বাচিত করবে। অন্যদিকে কংগ্রেস বড়লাটকে স্পষ্টভাবে জানিয়েছিল যে, কংগ্রেস তার জাতীয় স্বরূপ ত্যাগ করে কেবল একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে না।[৩৩] পত্রিকাটিতে সিমলা সম্মেলনের প্রায় অচলাবস্থার সংবাদ দিয়ে লেখা হয়েছিল যে, বড়লাট

Dhaka University Institutional Repository

এই পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগকে সাহায্য না করলে শাসন পরিষদে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আশা করা যাবে না। সম্মেলনের অধিকাংশ প্রতিনিধি জিন্নাহর দাবীর বিরোধী ছিল।[৩৪]

মওলানা আবুল কালাম আজাদ দেশবাসীকে ওয়াভেল-পরিকল্পনা সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহ প্রদর্শন না করার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন এবং একই সঙ্গে পরিকল্পনাটিকে অগ্রাহ্য করার মধ্যে কোন লাভ হবে না বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। আর মুসলমানদের লক্ষ করে তিনি বলেছিলেন যে, লীগ বহির্ভূত মুসলমানরা যে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভের বিরোধী তা নয়, তবে পদ্ধতিগত দিক দিয়ে তাঁরা মুসলিম লীগের সঙ্গে একমত নয়।[৩৫]

তবে, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিরোধী দলের পক্ষ হতে এ, কে, ফজলুল হক ওয়াভেল-পরিকল্পনাকে সমর্থন জানিয়ে বড়লাটের নিকট এক তার করেছিলেন। তারবার্তায় তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ করে বলেছিলেন যে, বিশেষ একটি দল জিদ করে সহযোগিতায় অসম্মত হলেও বড়লাট যেন তাঁর পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার চেষ্টা করেন। এই তারের অনুলিপি রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পন্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নিকটও প্রেরণ করা হয়েছিল বলে পত্রিকাটিতে উল্লেখ করা হয়েছিল।[৩৬]

এ সম্পর্কে লীগ সমর্থিত *মিল্লাত* পত্রিকার মন্তব্য করা হয়েছিলঃ "সিমলা কন্‌ফারেন্সের সময় গান্ধীজী এক পকেট হইতে বাহির করিলেন- ফজলুল হককে, অন্য পকেট হইতে মওলানা আজাদকে"।[৩৭]

ভারতীয় অচলাবস্থার মীমাংসার জন্য সিমলায় যে নেতৃ-সম্মেলন আরম্ভ হয়েছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে মত-পার্থক্যের কারণে শেষ পর্যন্ত তা লক্ষ অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল। *দেশের কথা* পত্রিকাটিতে বড়লাট এবং সম্মেলনের তিনজন বিশিষ্ট দলনেতা-লীগ সভাপতি জিন্নাহ, কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ প্রদত্ত বিবৃতি পাঠকদের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করা হয়েছিল।[৩৮] লর্ড ওয়াভেলের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, পূর্বে স্বীকৃত কোন ফরমূলার উপর ভিত্তি না করে তিনি সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন দলকে তাঁদের নামের তালিকা পেশ করতে বলেছিলেন। এতে সবগুলি দলের পক্ষ থেকে নামের তালিকা পেলেও লীগের পক্ষ থেকে নামের কোন তালিকা তিনি পাননি। এক্ষেত্রে ওয়াভেল লীগের কতিপয় সদস্যসহ তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদের সাময়িক একটি তালিকা রচনা করেন যা জিন্নাহ বা লীগের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় নাই। মিঃ জিন্নাহর দৃঢ় মনোভাবের কারণে আলোচনা চালান তাঁর পক্ষে নিরর্থক বলে মনে হয় এবং সম্মেলন ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার জন্য তিনি কোন একটি দলকে দায়ী করেন নাই কারণ তাঁর মতে সব দলেরই দাবি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।[৩৯] জিন্নাহ

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর বিবৃতিতে জানান যে, লীগ বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চেয়েছিল নতুন গবর্ণমেন্টে অন্যান্য দলের সমান লীগের প্রতিনিধি গ্রহণের ভিত্তিতে। লীগ প্রত্যেক সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের যথোপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণের পক্ষপাতি হলেও অন্যান্য সংখ্যাল্প দল লীগের লক্ষ পাকিস্তানে সম্মত না থাকায় তিনি নামের তালিকা প্রেরণে আপত্তি করেছিলেন। আরও বেশী আপত্তির কারণ হিসাবে লীগ-বহির্ভূত মুসলমানদের গ্রহণ করার প্রস্তাবকে উল্লেখ করেছিলেন তিনি। কারণ লীগের মতে এটাই ছিল মূল সমস্যা।[৪০] মওলানা আজাদ তাঁর বিবৃতিতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার ব্যাপারে বড়লাটের দায়িত্বকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। বড়লাটের দ্বিধাপূর্ণ ও সংশয়শঙ্কুল মনোভাব সম্মেলনের জন্য সঙ্গত ও সহায়ক ছিল না এবং একমাত্র বড়লাট যদি দৃঢ় মনোভাব রাখতেন তাহলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার মিমাংসা সম্ভব ছিল।[৪১]

১৯৪৬ সালের নির্বাচন সম্পর্কে জিন্নাহ তাঁর কোলকাতার জনসভায় উর্দ্দুতে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন *মিল্লাত* পত্রিকা জনগণের অবগতির জন্য তা বাঙলায় প্রকাশ করেছিল।[৪২] ঐ বক্তৃতায় তিনি ইংরেজ এবং হিন্দুর গোলামী হতে মুক্তি লাভের একমাত্র পথ হিসাবে 'পাকিস্তান' অর্জনকেই উল্লেখ করেছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত প্রশ্ন ভুলে গিয়ে পাকিস্তান লাভের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকলকে নির্বাচনে কাজ করার আহবান জানিয়েছিলেন।[৪৩] এই নির্বাচন সম্পর্কে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ ও পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ বাংলার মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, সর্বক্ষণ মনে রাখতে হবে যে বাঙলা দেশ পাকিস্তানের মধ্যমণি। আরব্ধ পাকিস্তান সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়ের শেষ যুদ্ধটি সম্পূর্ণ জয় করার ভার একক গ্রহণ করতে হবে বাঙলার মুসলমানকে। এজন্য সবকিছু বা সর্বস্ব পণ করে তাদের লড়তে হবে।[৪৪]

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের সাফল্য অর্জিত হওয়ার পর *মিল্লাত* পত্রিকার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করা হয়েছিলঃ "পাকিস্তানকে সমাধিস্থ করিবে বলিয়া কংগ্রেস যে কবর খুঁড়িতে মাতিয়াছিল সেই কবরে অখন্ড ভারতের স্বপ্ন-সাধকে সমাধিস্থ করিতে বাঙলার মুসলমান যে আজ প্রস্তুত হইয়াছে এই নির্ব্বাচনের ফলাফলে সেই শুভ বার্ত্তাই ঘোষিত হইল। জগতের নিপীড়িত ও শোষিত জনগণ যে জয়যাত্রা শুরু করিয়াছে বাঙলার মুসলমানের আসন যে সেই কাফেলার পুরোভাগে সেই পরম সত্যই এবার প্রমাণিত হইল। পাকিস্তানই এই নির্ব্বাচনের একমাত্র "ইশু" ছিল। বাঙালী মুসলমান পাকিস্তানের স্বপক্ষে একবাক্যে রায় দিয়াছে"।[৪৫] পত্রিকাটিতে আরও বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তানের জন্য বাঙলার মুসলমান যে ত্যাগ, দুঃখ, কষ্ট বরণ করতে প্রস্তুত এবং পাকিস্তানের জেহাদে বাঙলার ঘরে ঘরে শত সহস্র মোজাহেদ তৈরী হয়ে রয়েছে এই নির্বাচনে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।[৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

এ,কে, ফজলুল হক ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগ রাজনীতি থেকে পদত্যাগ করে পুনরায় লীগের রাজনীতিতে কেন যোগদান করতে চেয়েছিলেন, সে সম্পর্কে তিনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন ১৯৪৫ সালের ২৭মে *দেশের কথা* পত্রিকায় "লীগে ফিরিতে চাই কেনঃ মিঃ এ,কে, ফজলুল হকের বিবৃতি' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল।[৪৭] ঐ বিবৃতিতে লীগের (বর্ত্তমান) রাজনৈতিক নীতি সম্পূর্ণ পরিবর্তনের দরকার বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি লীগে ফিরতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।[৪৮] পুনরায় মুসলিম লীগে যোগদান করার পর ফজলুল হক বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি পদপ্রার্থী হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে ১৯৪৭ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় সংবাদ দিয়ে বলা হয়েছিল যে, এ, কে, ফজলুল হক মুসলিম জাতির খেদমত এবং পাকিস্তানের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করবার মানসেই সভাপতি পদপ্রার্থী হয়েছিলেন বলে জানিয়েছিলেন।[৪৯]

১৯৪৭ সালের ২৪ মার্চ এর *দৈনিক আজাদ* পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, পাকিস্তান আন্দোলনের পাশাপাশি বাঙলাকে অখন্ড ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বলবৎ রাখার জন্য বাংলার লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছিল যে,বাংলার উজীরে আজম হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দ্দী মুসলিম ইনষ্টিটিউটে এক বিরাট জনসভায় সভাপতির অভিভাষণে উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, হিন্দু কংগ্রেস পাঞ্জাব ও বাঙলাকে বিভক্ত করণের দাবী করে প্রকৃতপক্ষে 'পাকিস্তান' স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু বাঙলা অবিভাজ্য,বাঙলার একের সঙ্গে অপরের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ এবং স্বার্থও এক। পাকিস্তান শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, হিন্দুর জন্যও। সুতরাং পাকিস্তান হতে পশ্চিম বাঙলাকে বাদ দেওয়া যায় না।[৫০] পত্রিকাটিতে রিপোর্ট করা হয়েছিল যে, ১৯৪৭ সালের ৫ এপ্রিল তারকেশ্বরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু কনফারেন্স বাঙলাদেশের সকল জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানের সহযোগে বাঙলার হিন্দুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি গঠনের ব্যবস্থা অবলম্বন করবার জন্য ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে একটি কার্যকরী কাউন্সিল গঠন করবার ভার অর্পণ করেছিল। ঐ সম্মেলনে এক বাণী প্রেরণ উপলক্ষে বীর সাভারকর হিন্দুস্তানের অখন্ডতা রক্ষার জন্য হিন্দুগণকে সর্বপ্রথমেই পাকিস্তানকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তাব রেখেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে একটি স্বতন্ত্র হিন্দু প্রদেশ গঠন, আসাম হতে যে কোন মূল্যে মুসলিম অনাধিকার প্রবেশকারীদের বহির্গত করণ, পূর্ব পাঞ্জাবে একটি হিন্দু-শিখ প্রদেশ গঠন এবং সিন্ধুর হিন্দু অধ্যুষিত জেলাসমূহকে বোম্বাইয়ের সঙ্গে সংযোগ করার মধ্য দিয়ে।[৫১] কিন্তু বাঙলার প্রধানমন্ত্রী এইচ,এস, সোহরওয়ার্দ্দী বৃহত্তর ও ঐক্যবদ্ধ বাঙলা গঠনের পক্ষে ছিলেন। বাঙলাকে বিভক্ত করার অর্থই হল হিন্দু, মুসলমান অথবা তফশিলী সম্প্রদায়ের পক্ষে আত্মহত্যার সামিল বলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালের *মিল্লাত* পত্রিকার এক সম্পাদকীয়তে বাঙলাকে বিভক্ত করার জন্য কংগ্রেস কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয়েছিল।[৫৩] 'যত সব কায়েমী স্বার্থবাদী বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে দেশটাকে ছারখার করিতেছে' শিরোনামে পত্রিকাটিতে যুব সমাজের প্রতি এই বলে আহবান জানানো হয়েছিল যে, বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও সুবিধাসমূহ সমভাবে ভোগ করবার জন্য যাতে বাঙলার হিন্দু-মুসলমান চিত্তরঞ্জন দাসের ৫০'৫০ নীতি গ্রহণ করে সে ব্যাপারে যুব সমাজ এগিয়ে আসেন এবং বাঙলার ঐতিহ্য ও উজ্জল ভবিষ্যতের স্বার্থে একতাবদ্ধ হয়ে বিরুদ্ধ মনোভাব পরিত্যাগ করে বাঙলাকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করেন।[৫৪]

'বাঙালীর দাবী: স্বাধীন সার্ব্বভৌম বাঙলা' শিরোনামে *মিল্লাত* পত্রিকায় বলা হয়েছিল যে, মুসলিম লীগ নেতা খাজা নাজিম উদ্দিন ষ্টেটসম্যান পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বাঙলা সম্পর্কে এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনই বাঙলার মুসলমান এবং অমুসলমান সকল সম্প্রদায়ের জনগণের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। তিনি এ কথাও বলেছিলেন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস বাঙলাদেশকে ভাগ করা হলে তা বাঙালীর স্বার্থে চরম আঘাত স্বরূপ হবে। এমনকি, যে কোন হিন্দু-বন্ধুর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় এই দাবীই তিনি লক্ষ করেছেন যে, বাঙলার সমস্যা সমাধান করার অধিকার বাঙলাকেই দেওয়া হউক।[৫৫] এ সম্পর্কে সৈয়দ মোয়াজ্জমউদ্দীন হোসেন 'বঙ্গ'-বিভাগ পরিকল্পনায় গলদ' নামক এক প্রবন্ধে এই পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছিলেন, বড়লাট যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, মুসলমানদের স্বতন্ত্র সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবী মেনে নিতে হলে পাঞ্জাব ও বাঙলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহকে হিন্দুস্তানের প্রতি আনুগত্য সম্পন্ন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য করার দাবীকে উপেক্ষা করা যায় না। যদিও এই যুক্তি অত্যন্ত জোরালো, কিন্তু দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের মধ্যে মীমাংসা করবার সময় বৃটিশ সরকার দেশের জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থকে অবহেলা করতে পারেন না।[৫৬]

তবে শেষ পর্যন্ত 'অখন্ড বাঙলা'র স্বপ্ন রচনাকারীদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য যে প্রচেষ্টা তা সফল হয় নাই। এই দাবীকে (উপেক্ষিত হয়ে বাঙলা বিভক্ত হয়েছিল) উপেক্ষা করে বাঙলাকে বিভক্ত করা হয়েছিল।[৫৭]

ভারতীয়দের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করার উদ্দেশে বৃটিশ সরকার যে পরিকল্পনা রচনা করে তা পেশ করবার জন্য বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৭ই মে মুসলিম লীগ, কংগ্রেস ও শিখ প্রতিনিধিবৃন্দের এক বৈঠক আহবান করেছিলেন। ঐ বৈঠকে আমন্ত্রিত নেতৃবৃন্দরা ছিলেন- কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, পন্ডিত জওহরলাল নেহরু, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল, লিয়াকৎ আলী খাঁ, সরদার বলদেব সিং। এছাড়াও

Dhaka University Institutional Repository

বড়লাট দেশীয় *রাজ্যের* আলোচনা কমিটির সদস্যগণকেও ঐ দিন বিকেলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আহবান করেছিলেন--বলে *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।[৫৮] ঐ পত্রিকাটিতে আরও রিপোর্ট করা হয়েছিল, ১৯৪৭ এর ১২ই মে রবিবার জিন্নাহ দাবী করেন যে বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার ভেঙ্গে দিয়ে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের প্রতিনিধিস্থানীয় দুইটি গণ-পরিষদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। ইতিপূর্বে সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল অন্তবর্ত্তী সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের যে বিকল্প প্রস্তাব করেছিলেন তাকে তিনি 'স্বপ্ন বিলাস' বলে আখ্যায়িত করেন এবং মুসলিম লীগ কখনও তাতে সম্মত হবে না বলে মন্তব্য করেন।[৫৯]

অত:পর ১৯৪৭ সালের ১৯ মে পত্রিকাটিতে 'বড়লাট লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের বিলাতযাত্রা' শিরোনামে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছিল যে ঃ "বড়লাট গতকল্য বৈকালে কংগ্রেস- মোছলেম লীগ নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎকারের সময় তাঁহাদিগকে ভারতীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জ্ঞাপন করেন। বৃটিশ মন্ত্রিসভার নিকট তিনি যে পরিকল্পনা পেশ করিবেন বড়লাট তাহাও তাহাদিগকে জানাইয়াছেন।

বড়লাটের পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় নাই, তবে এইটুকু জানা গিয়াছে যে, ভারত বিভাগ অবধারিত"।[৬০]

'শীঘ্রই দুইটি গণপরিষদের হস্তে ক্ষমতা অর্পণের সম্ভাবনা' শিরোনামে পত্রিকাটি হোয়াইট হল মহলের সংবাদ দিয়ে আরও জানিয়েছিল যে, বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পূর্বেই ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি চুক্তির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন।[৬১] ঐ মহল দুইটি গণপরিষদের নিকট ক্ষমতা অর্পণের ব্যাপারে জোর অভিমত ব্যক্ত করেছিল--বলে পত্রিকাটিতে উল্লেখ করা হয়েছিল।[৬২]

দৈনিক আজাদ পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা আরও জানিয়েছিলেন যে, অবশেষে কংগ্রেস এবং বৃটিশ গভর্ণমেন্ট উভয়েই ভারত বিভাগের নীতি স্বীকার করতে বাধ্য হলে জিন্নাহ ক্ষমতা হস্তান্তরের কার্য্য আরম্ভ করার পূর্বেই বিদ্যমান অন্তবর্ত্তী সরকারকে দুইটি সরকারে বিভক্ত করার দাবি জানিয়েছিলেন, যার একটি হিন্দুস্তানের প্রদেশগুলির এবং অপরটি পাকিস্তানের প্রদেশগুলির শাসনকার্য্য পরিচালনা করবে। উভয় রাষ্ট্রের নতুন শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়া পর্যন্ত এই দুইটি অস্থায়ী সরকারের অস্তিত্ব থাকবে।[৬৩] উক্ত সংবাদদাতা এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আরও মন্তব্য করেছিলেন যে, 'ইতিপূর্বে কংগ্রেসী নেতা সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলও

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপ দাবি উত্থাপন করেছিলেন। এক্ষণে জিন্নাহর দাবি কংগ্রেসের দাবির অনুরূপ হলেও তাঁর প্রস্তাব মূলতঃ ভারত বিভাগের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শুধু এই কারণেই কংগ্রেস জিন্নাহর দাবির বিরোধিতা করতে পারে না'।[৬৪] তিনি আরও জানিয়েছিলেন, বড়লাটের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সরকারী মহল মনে করেন যে, শুরুতেই এই ধরণের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে না এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, বাঙলা ও আসামের জনসাধারণ পাকিস্তানে থাকতে অথবা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় কিনা তা নির্দ্ধারণের জন্য বড়লাট ঐ প্রদেশগুলিতে গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন। এরপর বিদ্যমান অন্তবর্ত্তী সরকারকে দুইটি সরকারে বিভক্ত করে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।[৬৫] পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান রাষ্ট্রগঠন সম্পর্কে পত্রিকাটিতে ১৯৪৭ সালের ১লা জুনের সংবাদ দিয়ে রিপোর্ট করা হয়েছিল: "এইরূপ আভাষ পাওয়া গিয়াছে যে, মোছলেম লীগকে বিভক্ত-বাংলা ও বিভক্ত-পাঞ্জাবসহ পাকিস্তান প্রদান করা হইবে। পাঠান লীগ পাকিস্তানে যোগদান করিবে, কিনা, সেই সম্পর্কে পাঠানগণই সিদ্ধান্ত করিবে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান এই দুইটী রাষ্ট্র গঠিত হইবে।

জানা গিয়াছে যে, মধ্যবর্ত্তী সরকার পুন:গঠিত হইবে এবং ভারতের গভর্ণর জেনারেলকে অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডার গভর্ণর জেনারেলের ন্যায় পদ-মর্য্যাদা ও ক্ষমতা প্রদান করা হইবে"।[৬৬]

ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন লাট প্রাসাদে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য ২রা জুন এক সম্মেলন আহবান করেন। ঐ সম্মেলনে মুসলিম লীগ, কংগ্রেস ও শিখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের অধিবেশনে বড়লাট বৃটিশ সরকারের ঘোষণা-পত্র সমবেত নেতৃবৃন্দের হস্তে অর্পণ করেছিলেন। *দৈনিক আজাদ* পত্রিকা দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনের বিস্তারিত বর্ণনা এবং বড়লাট ভবনের এশতেহার জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করেছিল।[৬৭] পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছিলঃ "১৬ই মে'র ঘোষণার সহিত বর্ত্তমান পরিকল্পনার বড় পার্থক্য হইতেছে এইখানে যে, ১৬ই মে'র ঘোষণায় বলা হইয়াছিল যে, দুইটী পৃথক সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাইতে পারে না, কিন্তু বর্ত্তমান পরিকল্পনায় ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।... আশা করা যাইতেছে যে আগামী আগষ্ট মাসের মধ্যেই ভারত পূর্ণ ডোমিনিয়নের মর্য্যাদা লাভ করিবে"।[৬৮] ৪ঠা জুন পত্রিকাটির এক সম্পাদকীয়তে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' শিরোনামে তাই উচ্ছাস প্রকাশ করে বলা হয়েছিলঃ"মোছলেম ভারতের পূর্ণ আজাদীর সাধনা এতদিনে সফল হইতে চলিয়াছে। মোছলেম লীগের লক্ষ্য পাকিস্তান প্রবল প্রতিবন্ধকতার বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া বাস্তব সত্যে রূপায়িত হইতে যাইতেছে। কায়েদে আজমের এবং ভারতীয় মুছলমানের আজীবনের

Dhaka University Institutional Repository

স্বপ্নসাধ পাকিস্তান ভারতবর্ষের দিকচক্রবালে প্রত্যক্ষ অরুণ আলোকরূপে দেখা দিতেছে। পাকিস্তান এখন আর সন্দেহের দোলায় শূণ্যে দোদুল্যমান নয়। পাকিস্তান এখন প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব সত্য হইয়া দৃশ্যমান। পাকিস্তান জিন্দাবাদ"।[৬৯]

পত্রিকাটি থেকে জানা যায়, ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বৃটিশ গভর্ণমেন্টের যে ঘোষণা প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে বাঙলা এবং পাঞ্জাব প্রদেশকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা ছিল। ঐ বিবৃতিতে প্রদেশ দুইটিকে বিভক্ত করার পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, বাঙলা ও পাঞ্জাবের আইন পরিষদ দুই ভাগে বিভক্ত হবে। এক ভাগ মুসলমান প্রধান জেলাগুলির প্রতিনিধিত্ব করবে এবং অপর ভাগ বাকী অংশের প্রতিনিধিত্ব করবে। প্রত্যেকটি আইন পরিষদের দুইটি অংশের সদস্যগণ পৃথকভাবে মিলিত হয়ে স্ব স্ব প্রদেশকে বিভক্ত করা হবে কিনা সে ব্যাপারে ভোট প্রদান করবেন। যে কোন অংশ যদি সাধারণ সংখ্যাধিক্যে প্রদেশ বিভাগের সপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে সেই প্রদেশ বিভক্ত হবে এবং সেই অনুযায়ী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। এছাড়াও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে এক বা দুইটি কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা সম্পর্কে ঐ সময়ে চলমান পার্লামেন্টের অধিবেশনে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট একটি আইন পাশ করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন।[৭০]

অতঃপর *দৈনিক আজাদ* আরও রিপোর্ট করেছিল যে, ৩রা জুন নয়াদিল্লী থেকে বড়লাটের ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার পর ঐ দিনই বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন, মোহাম্মদ আলী জিন্না এবং পন্ডিত জওহরলাল নেহরু বেতার বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বেতার বক্তৃতায় বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ভারতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দিয়েছিলেন। মন্ত্রিমিশনের কিংবা ভারতের সামগ্রিক ঐক্য রক্ষার অনুকূলে অন্য কোনও পরিকল্পনা সকলের নিকট গ্রহণীয় না হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করে এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, কোন একটি বৃহৎ অঞ্চলে যেখানে এক সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে তাদেরকে জোর করে অন্য সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বিশিষ্ট গভর্ণমেন্টের অধীনে বাস করতে বাধ্য করবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এক্ষেত্রে উপায় হলো বলপ্রয়োগে বাধ্য না করে অঞ্চল বিভক্তকরণ। মুসলিম লীগের ভারত বিভাগের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একই যুক্তির দ্বারা কয়েকটি বিশেষ প্রদেশ বিভাগের দাবীকে 'অখন্ডনীয় যুক্তি' বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি ভারত বিভাগ ও প্রদেশ বিভাগকে সমর্থন না করে এ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান ভারতবাসীদের নিজেদেরই করা উচিত বলে বেতার বক্তৃতায় বলেছিলেন।[৭১]

Dhaka University Institutional Repository

এরপর জিন্নাহ বেতারে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা পত্রিকাটিতে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বিবৃতির এক স্থানে তিনি বৃটিশ গভর্ণমেন্টের পরিকল্পনাকে একটি আপোষ বা মীমাংসা হিসাবে গ্রহণ করবেন কিনা সে সম্পর্কে বিবেচনা করার কথা বলেছিলেন। তবে তিনি এ ব্যাপারে বড়লাটের ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং বড়লাট যাতে শান্তিপূর্ণভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তর কার্য্য সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হন সে জন্য তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করা লীগের কর্ত্তব্য বলে উল্লেখ করেছিলেন এবং কারো প্রতি কোন রকম দোষারোপ না করে যারা নিহত হয়েছে এবং যারা যাবতীয় কিছু হারিয়ে অশেষ দুঃখ সহ্য করেছে তাদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে পাকিস্তানের স্থায়িত্ব কামনা করেছিলেন।[৭২]

পন্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর প্রদত্ত বেতার বিবৃতিতে ভারত বিভাগ পরিকল্পনার দুটি দিকের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। প্রথমত, ঐ ঘোষণায় ভারতের কয়েকটি অঞ্চলের আত্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়ে, যাতে ভারতের সঙ্গে ঐ অঞ্চলগুলির পৃথক হবার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের পথে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির নিশ্চয়তা। কংগ্রেস কর্তৃক পরিকল্পনাটি গ্রহণ করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে তিনি বৃহত্তর কমিটিগুলিকে তা গ্রহণ করবার জন্য সুপারিশ করেছিলেন।[৭৩]

ভারত বিভাগের পরিকল্পনায় ঢাকার মুসলিম রাজনৈতিক মহলে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে ১৯৪৭ সালের ৪ঠা জুন *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার ঢাকার সংবাদদাতা জানিয়েছিলেনঃ "বৃটিশ সরকারের ৩রা জুনের ভারত বিভাগের পরিকল্পনা, বড়লাটের ও কায়েদে আজম জিন্নাহ ও পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য গতকল্য সন্ধ্যায় ঢাকার প্রত্যেকটি লোক কোনও না কোনও রেডিও যন্ত্রের শরণাপন্ন হয়। তখন আকাশ হইতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। কিন্তু তাহাতেও সর্ব্বসাধারণের উদ্যম কমে নাই।

পরিকল্পনা শ্রবণের পর সর্বসাধারনের মধ্যে আলোচনা হইতে ইহাই বুঝা গেল যে, পরিকল্পনা সন্তোষজনক না হইলেও অন্ততঃ মন্দের ভালো হইয়াছে--এবং ইহার পরে যদি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা থামিয়া যায় তবে তাহারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে"।[৭৪]

'লীগ কাউন্সিল বৃটিশ ঘোষণা মানিয়া লইলেন' এই সংবাদ দিয়ে *মিল্লাত* পত্রিকায় রির্পোট করা হয়েছিল যে, ১৯৪৭ সালের ৯ই জুন দিল্লীতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের এক ঐতিহাসিক অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনে সারা ভারতের মোট ৪৭৫ জন সদস্যের মধ্যে ৪৪৫ জন তাতে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে বাঙলা ও পাঞ্জাব এবং বৃটিশের ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় আলোচনা করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। এর মধ্যে আট জন সদস্য বাঙলা বিভক্তের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করেছিলেন যাঁদের মধ্যে ভারতের প্রবীণ আলেম মওলানা হসরত মোহানী, প্রফেসর আবদুর রহিম, আবুল হাশিম ছিলেন অন্যতম। তবে লীগ কাউন্সিল বাঙলা এবং পাঞ্জাব বিভাগে রাজী না হলেও শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সরকারের ঘোষণাকে আপোষ-মীমাংসার ভিত্তিতে গ্রহণ করেছিল।[৭৫]

'পাকিস্তান' এর দাবীতে মুসলমান জনসাধারণ হাজারো কণ্ঠে যে শ্লোগান তুলেছিল *প্রভাতী* পত্রিকায় তা উল্লেখ করা হয়েছিলঃ "লড়কে লেংগে পাকিস্তান"।... পোষ্টারে লেখা রয়েছে, 'গৃহযুদ্ধ চাই না'। 'ভারত বিভাগ, হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছেদ নয়' 'ইংরাজ রাজের উচ্ছেদ চাই"।[৭৬]

অবশেষে, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট 'পাকিস্তান' রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর *নয়া-জামানা* পত্রিকায় উচ্ছাস ব্যক্ত করে লেখা হয়েছিলঃ "আজাদী' কি মাধুর্য্য, কি শিহরণ, কত-অযুত সম্ভাবনাই না লুকিয়ে আছে এই ছোটট শব্দটির মধ্যে। যে অপরাধ আমরা করেছিলাম ১৭৫৭ সালে দুশো বছর ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত করেছি। প্রায়শ্চিত্তের অবসানে হয়েছে সূর্য্যোদয় আমরা পেয়েছি আজাদী--আমাদের স্বপ্ন রূপায়িত হয়েছে পাকিস্তানে"।[৭৭]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বলগ্নে, বিশেষ করে ১৯৪০-৪৭, এই সময়কালে মুসলিম সাংবাদিকরা চলমান রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ঘটনাবলী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন যার ফলে ১৯৪৭ সালে আগষ্ট মাসে ভারত বিভক্তি এবং পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল, এই বিয়োগান্ত ঘটনা প্রবাহের জন্য ভারতীয় মুসলমানদের এবং তাদের নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্কে এককভাবে দায়ী করা সমীচীন হবে না। মূলত: ১৯১৬ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত জিন্নাহ মুসলমানদের জন্য একটা সম্মানজনক সমঝোতা লাভের প্রচেষ্টা করেছিলেন। আর ১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করে জিন্নাহ 'পাকিস্তান' দাবি থেকে অনেকখানি সরে গিয়েছিলেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জিন্নাহ সমঝোতার ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানে উপনীত হতে চেয়েছিলেন কিন্তু নেহরু প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের অনমনীয় ও অযৌক্তিক মনোভাবের কারণে 'পাকিস্তান' সৃষ্টি অবধারিত হয়ে পড়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলমানদের সার্বিক উন্নতির যে বিরাট সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল বলে তাদের বিশ্বাস জন্মেছিল--সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমে তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. কাজী নজরুল ইসলামের 'ধূমকেতু','নবযুগ','পল্লী-বান্ধব','দেশের কথা', প্রভৃতি পত্রিকায় এ জাতীয় ধারা লক্ষ করা যায়।

২. *দৈনিক আজাদ*, ২৪শে ফেব্রুয়ারী/১৯৪০।

৩. ঐ, ২৫শে ফেব্রুয়ারী/১৯৪০/পৃ:১।

৪. ঐ।

৫. ঐ।

৬. ঐ, ২৩শে মার্চ/১৯৪০/পৃ:১।

৭. ঐ।

৮. ঐ, ২৪শে মার্চ/১৯৪০/পৃ:৮।

৯. ঐ, পৃ: ১-৪।

১০.ঐ।

১১.ঐ, ২৬শে মার্চ/১৯৪০/পৃ:১।

১২.সম্পাদকীয়, *পল্লী-বান্ধব*, ৪ঠা ফাল্গুন/১৩৪৮/১৬ই ফেব্রুয়ারী/১৯৪২/পৃ:২।

১৩.ঐ, ১৬ই চৈত্র/১৩৪৮/৩০শে মার্চ/১৯৪২/পৃ:১।

১৪.ঈদ সংখ্যা *নবযুগ*, ১৯৪৪/পৃ: ৯-১১।

১৫.ঐ।

১৬.ঐ।

১৭.ঐ।

১৮.ঐ, পৃ:১৭।

১৯. *যুগভেরী*, ১২শ বর্ষ/১ম সংখ্যা/সিলেট/১৩ই আষাঢ়/১৩৫০/১৯৪৩/পৃ:৪।

২০.'মুসলিম উদ্দেশ্যের পূর্ণ আন্তরিকতা', ঐ, পৃ:৪।

২১.ঐ, ১২শ বর্ষ/৩য় সংখ্যা/২৭শে আষাঢ়/১৩৫০/পৃ:৪।

২২.এম.এ, জিন্নার বেলুচিস্তান ভ্রমণের পরিণাম: 'মুসলিম জনগণের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা', ঐ, ১২শ বর্ষ/ ৪র্থ সংখ্যা/শ্রাবণ/১৩৫০/পৃ:৩।

২৩.ঐ, ১২শ বর্ষ/১৪শ সংখ্যা/আশ্বিন/১৩৫০/পৃ: ৩।

Dhaka University Institutional Repository

২৪.নিখিল আসাম মুসলিম লীগ কনফারেন্স, ঐ।

২৫.সম্পাদকীয়, ঐ।

২৬.*দেশের কথা*, ১০ম বর্ষ/২৯শ সংখ্যা/১৩৫১/১৬ই জুলাই/১৯৪৪/পৃ:৫।

২৭.ঐ।

২৮.রাজাজীর প্রস্তাব ও সাম্প্রদায়িক আপোষ প্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ, ঐ, ১০ম বর্ষ/৩০শ সংখ্যা/২৩শে জুলাই/ ১৯৪৪/পৃ:১।

২৯.ঐ।

৩০.সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ভিত্তি,ঐ, ১০ম বর্ষ/৩৩শ সংখ্যা/শ্রাবণ/১৩৫১/১৩ই আগষ্ট/১৯৪৪/পৃ:১।

৩১.সাম্প্রদায়িক ঐক্যের মূল্য, ঐ, ১০ম বর্ষ/৩৫শ সংখ্যা/ভাদ্র/১৩৫১/২৭শে আগষ্ট/১৯৪৪/পৃ:১।

৩২.ভারতীয় সমস্যার সমাধানে সিমলায় নেতৃ-সম্মেলন, ঐ, ১১বর্ষ/২০শ সংখ্যা/১লা জুলাই/ ১৯৪৫/ পৃ:৬।

৩৩.ঐ, পৃ: ৭।

৩৪.সিমলা সম্মেলনে অচলাবস্থা,ঐ।

৩৫.মৌলানা আজাদের আবেদন, ঐ, ১১বর্ষ/২১শ সংখ্যা/৮ই জুলাই/১৯৪৫/পৃ:৬।

৩৬.বড়লাটের নিকট মি: হকের তার,ঐ, পৃ:১০-১১।

৩৭.*মিল্লাত*, ১ম বর্ষ/১০ম সংখ্যা/১১ই মাঘ/১৩৫২/পৃ:৩।

৩৮.ঐ, ১১শ বর্ষ/২৩শ সংখ্যা/২২শে জুলাই/১৯৪৫/পৃ:৮-৯।

৩৯.ঐ।

৪০.ঐ।

৪১.ঐ।

৪২.নিপীড়িত জনগণের কণ্ঠে রণিয়া উঠিয়াছে আজাদীর আওয়াজ, *মিল্লাত*, ১ম বর্ষ/১৩শ সংখ্যা/ফাল্গুন/ ১৩৫২/১লা মার্চ্চ/১৯৪৬/পৃ:১।

৪৩.ঐ।

৪৪.মুছলমানকে পাকিস্তান-যুদ্ধে জয়ী হইতে হইবে, *দৈনিক আজাদ* ২২শে ফেব্রুয়ারী/১৯৪৭/পৃ:২।

৪৫.সম্পাদকীয়: নির্ব্বাচনের পর, *মিল্লাত*, ১ম বর্ষ/১৭শ সংখ্যা/১৫ই চৈত্র/১৩৫২/পৃ:২।

৪৬.ঐ, ১ম বর্ষ/১৮শ সংখ্যা/২২শে চৈত্র/১৩৫২/পৃ:১।

৪৭.*দেশের কথা*, ২৭ শে মে/১৯৪৫/পৃ:১১।

Dhaka University Institutional Repository

৪৮.ঐ।

৪৯.*দৈনিক আজাদ*, ৩রা ফেব্রুয়ারী/১৯৪৭/পৃ:২।

৫০.ঐ, ২৪শে মার্চ/১৯৪৭/পৃ:১।

৫১.ঐ, ৮ই এপ্রিল/১৯৪৭/পৃ:২।

৫২.ঐ, ৯ই এপ্রিল/১৯৪৭/পৃ: ১।

৫৩.সম্পাদকীয়: বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন, *মিল্লাত*, ২য় বর্ষ/১৬শ সংখ্যা/১৩৫৩/১১ই এপ্রিল/১৯৪৭/পৃ:২।

৫৪.ঐ, ২য় বর্ষ/১৯শ সংখ্যা/বৈশাখ/১৩৫৪/২রা মে/১৯৪৭/পৃ:২।

৫৫.ঐ, ২য় বর্ষ/২০তম সংখ্যা/২৫শে বৈশাখ/১৩৫৪/৯ই মে/১৯৪৭/পৃ:১।

৫৬.*মিল্লাত*, ৫ই আষাঢ়/১৩৫৪/পৃ:৪।

৫৭.ঐ, ২য় বর্ষ/২৭শ সংখ্যা/আষাঢ়/১৩৫৪/২৭শে জুন/১৯৪৭/পৃ:৩।

৫৮.*দৈনিক আজাদ*, ১১ই মে/১৯৪৭/পৃ:১।

৫৯.ঐ, ১৩ই মে/১৯৪৭/পৃ:১।

৬০.ঐ, ১৯শে মে/১৯৪৭/পৃ:১।

৬১.ঐ, ২১শে মে/১৯৪৭/পৃ:১।

৬২.ঐ।

৬৩.ঐ, ২৪শে মে/১৯৪৭/পৃ:১।

৬৪.ঐ।

৬৫.ঐ।

৬৬.ঐ, ২রা জুন/১৯৪৭/পৃ:১।

৬৭.ঐ, ৩রা জুন/১৯৪৭/পৃ:১।

৬৮.ঐ, পৃ:৩।

৬৯.ঐ, ৪ঠা জুন/১৯৪৭।

৭০.ঐ, পৃ:৫।

৭১.ঐ, পৃ:৩।

৭২.ঐ।

৭৩.ঐ।

৭৪.ভারত বিভাগের পরিকল্পনা, ঐ, ৭ই জুন/১৯৪৭/পৃ:২।

Dhaka University Institutional Repository

৭৫.*নিল্লাত*, ২য় বর্ষ/২৫শ সংখ্যা/জ্যৈষ্ঠ/১৩৫৪/১৩ই জুন/১৯৪৭/পৃ:১।

৭৬.১৬ই আগষ্টের অভূতপূর্ব গণজাগরণ (*প্রভাতীর* নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট), *প্রভাতী*, ৪র্থ বর্ষ/৪র্থ সংখ্যা/আশ্বিন/১৩৫৩/পৃ:৩।

৭৭.জানানা মহফিল: আমাদের কথা, *নয়া-জামানা* স্বাধীনতা সংখ্যা/শ্রাবণ/১৩৫৬/পৃ:১৩।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

মুসলিম সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একজন গবেষকের মত, "বৃটিশ আমলে সাংবাদিকতা শুধু জীবন যাপনের জন্য একটি পেশা ছিল না। বৃটিশ আমলে পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজকে আলোকিত করা ও মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা করাও ছিল কিছু কিছু সংবাদপত্রের দায়িত্ব। ... সংবাদপত্রগুলিতে মুসলমান স্বার্থ চিন্তার প্রকাশ দেখে কারো কারো মনে হতে পারে যে তাঁরা খুব সাম্প্রদায়িক ছিলেন। কিন্তু তা সত্য নয়। সে যুগে মুসলমান নেতাদের মধ্যে অনেকেই প্রগতিশীল ছিলেন। তাঁরা দেশের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজের সমাজের সমৃদ্ধির কথাও ভাবতেন। তবে তা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।"[১] বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার অধিকাংশ লেখকগণ মুসলমানদের অলসতা, বিলাসিতা, জ্ঞান বিমুখতা এবং সর্বোপরী নিজেদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে তাদের যে উদাসীনতা সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন। এসব পত্রিকার লেখক ও পরিচালকগণ নিজ সমাজের বাস্তব দুর্গতি লক্ষ করে তাদের উন্নতি আনয়নে তাই সচেষ্ট হয়েছিলেন—যা কয়েকটি পত্রিকার উদ্ধৃতি থেকে সহজেই বোঝা যায়।

সুতরাং আত্ম উন্নতি সাধনের দ্বারা রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খা পূরণের লক্ষে পত্র-পত্রিকাগুলিতে তাঁরা লেখনীর মাধ্যমে মুসলমান সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

কুড়ি শতকের দ্বিতীয় দশকের একজন বিশিষ্ট মুসলিম সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন এর ভাষায়ঃ "মানব-সমাজের ভাঙ্গা-গড়ার ব্যাপারে যে-সব আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠে, সংবাদ-সাহিত্যই তার শ্রেষ্ঠ বাহন। সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সংবাদ-সাহিত্য একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এখন দুনিয়া ও মানুষ সম্পর্কে আগ্রহশীল মাত্রেরই একে বাদ দিয়ে একপদ অগ্রসর হওয়ারও উপায় নাই। দেশ, সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র প্রভৃতির উন্নতি, সংস্কার, পরিবর্ত্তনের পরিচয় এখন একান্তভাবেই সংবাদ-সাহিত্য-সাপেক্ষ। সংবাদ-সাহিত্যের প্রচারফলে এখন দল ভাঙে গড়ে, নেতৃত্বের হয় উত্থান-পতন, দেশ-জাতি-সম্প্রদায়ের প্রবক্তাদের কথা সর্বত্র প্রসার লাভ করে--এমন কি, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও পতনও এর উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। কাজেই একে যে বলা হয় চতুর্থ শক্তি (ঋড়ঁৎঃয ঝঃধঃব), তা অযথার্থ নয়।"[২]

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান পত্র-পত্রিকার সম্পাদক ও লেখকগণ এই চতুর্থ শক্তির সাহায্যেই কিসে সমাজের মঙ্গল সাধন হবে, সে সমস্যার সমাধানে তাঁরা নিজেদের সাধনায় নিয়োজিত রেখেছিলেন। যার প্রমাণ তাঁদের রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। এছাড়াও চলমান রাজনৈতিক আন্দোলনের খবরাখবর নিয়মিত প্রকাশ ছাড়াও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর বিশ্লেষণে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বিস্ময়কর বাস্তব জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষর তাঁরা রেখেছিলেন। তাঁদের এসব রচনা থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায় স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধ এবং সংস্কৃতি চেতনায় তাঁরা কিরূপ উদ্বুদ্ধ ছিলেন। ফলে মুসলমানদের রাজনৈতিক জাগরণ আনয়নে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁদের প্রবন্ধসমূহ ও চিন্তাধারা বাণীরূপ লাভ করে সফল হয়েছিল।

কুড়ি শতকের প্রথম থেকে মধ্যবর্তী সময়কালে বাঙালি মুসলমানের আত্মা-উপলব্ধি থেকে আত্ম-উন্নতি সাধনের দ্বারা তাদের সার্বিক জাগরণের যে বিশাল বিকাশ পরিলক্ষিত হয়েছিল-এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের প্রজ্ঞাপ্রোজ্জ্বল অবলোকন, তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা এবং সুচিন্তিত ও সুলিখিত অবদান সেখানে বিশিষ্ট ভূমিকা রেখেছে।

সুতরাং, পত্র-পত্রিকাগুলির স্বল্প আয়ু, ক্ষীণ কলেবর হলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এ সকল পত্র-পত্রিকার প্রকাশনার মধ্য দিয়েই উনিশ শতকের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে সাংবাদিকতার সূচনা হয়েছিল।পরিশেষে, ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় এর কথায় বলা যায়-অন্তর সম্পদে যথেষ্ট বলীয়ান হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক দৈন্য এবং পরিচালনাগত নানা ত্রটি বিচ্যুতির ফলে এই সমস্ত পত্র-পত্রিকাগুলির অধিকাংশের ক্ষেত্রে দীর্ঘজীবন লাভ সম্ভব না হলেও এর যে আবেদন তা নবচেতনা আনয়নে গুরত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।[৩] পত্র-পত্রিকাগুলির পাতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়।

তবে, এইসব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বাঙালি মুসলমানদের চিন্তাধারাকে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে মুসলমানের আত্মপরিচয় সম্পর্কে দুইটি ভিন্ন চেতনা লক্ষণীয়- ধর্মীয় দিক থেকে তাদের পরিচয় যেমন 'মুসলমান' তেমনি দেশজ দিক থেকে তাদের পরিচয় বাঙালি। আত্মপরিচয়ের এ অনুসন্ধিৎসা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রাধান্য লাভ করেছে। বাঙালি প্রশ্নে হিন্দু-মুসলমান তাবৎ ধর্মীয় স্রোত এক ধারায় প্রবাহিত হতে দেখা যায়। যেমন শেখ হবিবর রহমান সম্পাদিত 'বঙ্গনূর' (১৯১৯) পত্রিকায় বলা হয়েছিলঃ "তুমি হিন্দু হও বা মুসলমান হও, ব্রাহ্মণ হও বা শূদ্র হও, এই সুজলা সুফলা প্রিয় বাংলা ভূমির কি কাজে লাগিতে পার এই লক্ষ্য নিয়া অগ্রসর হও।"[৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৩২৯ সালে কাজী নজরুল ইসলাম *ধূমকেতু* পত্রিকায় " আমার ধর্ম্ম" নামক এক প্রবন্ধে সর্বপ্রথম মানুষ হিসাবে বাঁচার জন্য জোর আহবান জানিয়ে মন্তব্য করেছিলেনঃ "দেশে একটা কথা উঠেছে যে মুক্তির জন্যে যে আন্দোলন আমরা চালাচ্ছি আমাদের তা ধর্ম্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে নিতে হবে।...যাকে নিজের ঘরে পরে এসে অবহেলায় পশুর মত মেরে ফেলতে পারে, যার ভাইবোন বাপ মাকে মেরে কেল্লেও বাক্যস্ফুট করবার আশা নাই তার আবার ধর্ম্ম কি?

ওরে আমার তরুণ ওরে আমার লক্ষীছাড়ার দল, তোরা আয়; তোরা ছুটে আয় -- অই ভন্ডামি থেকে চলে আয়! তোরা বল আমাদের আগে বাঁচতে হবে।...ওরে অধীন, ওরে ভন্ড তোর আবার ধর্ম্ম কি? যারা তোকে ধর্ম্ম শিখিয়েছে তারা কি শত্রু এলে বেদ নিয়ে পড়ে থাকতো? তারা কি দুষমন এলে কোর্‌আন্ প'ড়তে ব্যস্ত থাক্‌তো? তাদের রণ কোলাহলে বেদমন্ত্র ডুবে যেত, দুষমনের খুনে তাদের মস্‌জিদের ধাপ লাল হোয়ে যেত। তারা আগে বাঁচতো"।[৫] অন্যদিকে ১৩৪৫ সালে *নয়া জামানা* পত্রিকার এক সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিলঃ "কংগ্রেস ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সন্দেহ নাই। কিন্তু কংগ্রেসের সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করিয়া রহিয়াছে, প্যাটেল, দেশাই, রাজেন্দ্র প্রসাদ, বাজাজ প্রভৃতি বুদ্ধিজীবি-ধনীর চর। অন্যদিকে ধর্ম্ম রক্ষার অজুহাতে হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ প্রভৃতি যে সকল প্রতিষ্ঠান সম্প্রদায়িক কল্যাণের মন্ত্র আওড়াইতেছেন, তাহাতেও ভাই পরমানন্দ, সাভার কর, মিঃ জিন্নাহ, মাহ্‌মুদাবাদের রাজা প্রভৃতি ধনীর দল প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন। মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবি বড়লোকের হাতে যত দিন এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান থাকিবে -- ততদিন জনসাধারণের সম্পূর্ণ কল্যাণের আশা বাতুলের পক্ষেই সম্ভব। সৈন্য সামন্ত গোলাবারুদ যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্বেও পলাশীর যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কারণ সৈন্য চালনার ভার ছিল মীরজাফরের উপর। দেশ-কর্ম্মীরা, দেশ সেবকেরা যত ত্যাগব্রতী হউন না কেন, যে পর্য্যন্ত সদর দরজা হইতে এই শ্রেণীর নেতৃত্বের অবসান না হইবে ততদিন সুবিচারের আশা কল্পনা মাত্র।"[৬]

ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 'শিখা' পত্রিকায় এক অভিভাষণে হিন্দু এবং মুসলমানকে শুধু ধর্মক্ষেত্র ছাড়া সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং অন্যান্য বিষয়ে তাদেরকে 'এক জাতি, ভারতীয়' বলে প্রতিপন্ন করতে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল।[৭]

অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ 'জয়তী' পত্রিকার সম্পাদক আবদুল কাদের এর নিকট একটি চিঠি লিখে মুসলমান সমাজ সম্পর্কে এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, মুসলমান সমাজে যে সকল সত্য ও কল্যাণজিজ্ঞাসু ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবেন তাঁরা দেশের ও সমসাময়িক জগত কর্মে আত্মনিয়োগ করবেন জগতের

Dhaka University Institutional Repository

বা দেশের এক সন্তান, মানুষের এক ভাই, এই হিসাবে- যার মধ্যদিয়ে প্রাচীন মুসলমান সাধনার ভিতরে জগতের জন্য কল্যাণকর যদি কিছু থেকে থাকে তা ফুটে উঠবে।[৮] তিনি বলেছিলেনঃ "ইসলাম মুসলমান কথাগুলো এখন আমাদের অভিধান থেকে মুছে ফেলা ভালো। ...'মুসলমান' 'হিন্দু' এদের কথা বহু বলা হ'য়েছে। ও পালা এখন চুকিয়ে দাও। তার পরিবর্তে মুসলমান হিন্দু এইসব নামধারী মানুষের বিচার-বিশ্লেষণ ভালো ক'রে করো। সেই ই আমাদের এখনকার কাজ"।[৯] অন্যদিকে, 'শিখা' (১৯২৭) পত্রিকার সম্পাদক আবুল হোসেন মুসলমান সাহিত্য সমাজের উদ্দেশ্যে 'আমাদের রাজনীতি' সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেনঃ "ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী মিলে' এক অখন্ড রাষ্ট্র গঠন করেছে। ভারতবর্ষের কোলে জন্মলাভ করে' বা আশ্রয় নিয়ে কি হিন্দু কি মুসলমান কি খৃষ্টান কেউই পৃথক্ পৃথক্ রাজনীতির দাবী করতে পারে না। বর্ত্তমান ভারতে মুসলমানের রাজনীতি বা হিন্দুর রাজনীতি বা মুসলমান রাষ্ট্র বা হিন্দু রাষ্ট্র বলে' কোন কথা হতেই পারে না। অতএব আমাদের রাজনীতি বলতে বুঝতে হবে, ভারতের কোলে যাঁরা জন্মেছেন বা আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের 'রাজনীতি'।[১০] 'সত্যাগ্রহী' পত্রিকায় বলা হয়েছিলঃ "আমরা বরাবর জাতীয়তাবাদী এবং হিন্দুদের সহিত মিলিত হইতে সমবেত চেষ্টা দ্বারা স্বাধীনতালাভের পক্ষপাতী। সুতরাং হিন্দুদের সহিত কোনরূপ বিরোধের সম্ভাবনাকে এড়াইয়া চলাই আমরা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।"[১১] উক্ত পত্র-পত্রিকার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ভিত্তিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ রক্ষার জন্য আহবান জানিয়ে জনমত গঠনের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানাবিধ ঐতিহাসিক কারণে অধিকাংশ মুসলমান তাদের দেশজ বাঙালি পরিচয়ের চেয়ে তাদের ধর্মীয় মুসলমান পরিচয়কেই অধিক প্রাধান্য দিতে শুরু করেছিল যারফলে ১৯৪৭ সালে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। সুতরাং, দেখা যায় যে, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত বাঙালি মুসলিম জনমতের চরিত্রকে একটি বিশেষ ধারায় চিহ্নিত করা যায় না।

পরবর্তীকালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে দেশজ ধর্ম নিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয় চেতনা পুনরায় জাগ্রত হতে লক্ষ করা যায় যা অব্যবহিত পরেই স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, *স্মরণীয় সাংবাদিক*, (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৫), পৃ. ১।

২. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, 'আমাদের সংবাদ-সাহিত্য', *দৃষ্টিকোণ*, (ঢাকা: ইষ্টবেঙ্গল পাবলিশার্স,১৩৬৬), পৃঃ ৮৫।

৩. ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ ১৮১৮-১৮৭৮*, (কলিকাতা: সাক্ষরতা, প্রকাশন/পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৭৭), পৃঃ ৩৫৭-৩৫৯।

৪. *বঙ্গদূত*, ১ম বর্ষ। ৩৭ সংখ্যা/ফাল্গুন/১৩৩৩/পৃঃ৫।

৫. *ধূমকেতু*, ১লা অগ্রহায়ণ। ১৩২৯/পৃঃ ৩।

৬. সম্পাদকীয়: অহিংসার নূতন ব্যাখ্যা, *নয়া-জামানা*, ১ম বর্ষ /২য় সংখ্যা/পৌষ/১৩৪৫/পৃঃ ৪৭

৭. অভিভাষণ, *শিখা*, ৪র্থ বর্ষ।/ ১৩৩৭/পৃঃ ১৯।

৮. অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ, 'একখানি পত্র', *জয়তী*, ১ম বর্ষ/ ২য় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ/ ১৩৩৭/পৃঃ৭৭।

৯. *ঐ*, পৃঃ ৭৭-৭৮।

১০. *ঐ*, ১ম বর্ষ/ ১১ শ ও ১২ শ সংখ্যা। ফাল্গুন ও চৈত্র/ ১৩৩৭/ পৃঃ ২৭৪।

১১. আত্মসম্মান ও আত্মপ্রতিষ্ঠা, *সত্যাগ্রহী*, ২য় বর্ষ/২১ শ সংখ্যা। ১৩৪৫ হিজরী। পৃঃ ৩১৪।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ক. প্রাথমিক উৎসসমূহ

১. সংবাদ এবং সাময়িকপত্রসমূহ

আখবারে এসলামিয়া, ১৩০২ সন।

আল এসলাম, ১৩২২, ১৩২৩, ১৩২৪, ১৩২৫, ১৩২৬ সন।

আন্নেসা, ১৩২৮ সন।

আহলে হাদিস, ১৩২৯, ১৩৩০, ১৩৩২, ১৩৩৩, ১৩৩৬, ১৩৪২, ১৩৪৩ সন।

আল্ হক ম্যাগাজিন, ১৩৩৬ সন।

আহমদী, ১৩৩৩ সন।

আল্-ইস্লাহ, ১৩৩৮, ১৩৩৯, ১৩৪০, ১৩৪১, ১৩৪২, ১৩৪৩, ১৩৪৪, ১৩৪৫, ১৩৫৪, সন।

আল-আমান, ১৩৪১, ১৩৪৫, ১৩৪৯ সন।

আল-জ্বালাল, ১৩৪৭, ১৩৫৩ সন।

আল-মোমিন, ১৩৪৯ সন।

ইসলাম প্রচারক, ১২৯৮, ১২৯৯, ১৩১০, ১৩১১, ১৩১২, ১৩১৪, ১৩১৫ সন।

ইসলাম আভা, ১৩১০, ১৩২০ সন।

ইসলাম দর্শন, ১৩২৩, ১৩২৭ সন।

ইসলাম নুর, ১৩৩২ সন।

ইসলাম প্রচার, ১৩৪১, ১৩৪২, ১৩৪৩ সন।

কোহিনুর, ১৩০৫, ১৩১৮ সন।

কৃষক, ১৩৪৬, ১৩৪৭ সন।

গুলিস্তাঁ, ১৩৫৪ সন।

চাষী, ১৩৪৪ সন।

তুন্নত-অল-জামায়াত, ১৩৪১, ১৩৪২, ১৩৪৩, ১৩৪৪, ১৩৪৫, ১৩৪৬, ১৩৪৭ সন।

জাগরণ, ১৩৩৫ সন।

জনশিক্ষা, ১৩৫৪ সন।

জয়তী, ১৩৩৭, ১৩৩৮ সন।

Dhaka University Institutional Repository

তাইদে এছলাম, ১৩৩৪ সন।

তবলিগ, ১৩৩৪, ১৩৩৫ সন।

তরণ, ১৩৩৫ সন।

তরনের ডান্ডা ও ইসলামের ঝান্ডা, ১৩৪৭ সন।

দেশের কথা, ১৯৪৪, ১৯৪৫ সাল।

দৈনিক আজাদ, ১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮, ১৯৩৯, ১৯৪০, ১৯৪১, ১৯৪২, ১৯৪৩, ১৯৪৪, ১৯৪৫, ১৯৪৬, ১৯৪৭ সাল (১৯৩৬-৪৭ সাল)।

দৈনিক ছোলতান, ১৩৩৪ সন।

দৈনিক তরক্কী, ১৩৩৩ সন।

ছোলতান (নব্যপর্যায়), ১৩৩০ সন।

ধূমকেতু, ১৯২২ সাল।

নবনূর, ১৩১০, ১৩১১, ১৩১২ সন।

নূর-অল-ইমান, ১৩০৮ সন।

নূর, ১৩২৬ সন।

নবযুগ (ঈদ সংখ্যা), ১৯৪৪ সাল।

নওরোজ, ১৩৩৪ সন।

নয়া-জামানা, ১৩৪৫, ১৩৫৬ (স্বাধীনতা সংখ্যা)।

নওবেলাল, ১৯৪৯ (১৪ই আগস্ট, স্বাধীনতা সংখ্যা)।

পল্লী বান্ধব, ১৩৪৭, ১৩৪৮ সন।

প্রভাতী, ১৩৫৩ সন।

প্রভাকর, ১৩১৯ সন।

বঙ্গদর্শন, ১২৭৯ সন।

বাসনা, ১৩১৫, ১৩১৬ সন।

বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা, ১৩২৫, ১৩২৬, ১৩২৭, ১৩২৮, ১৩২৯ সন।

বঙ্গনূর, ১৩২৬, ১৩২৭, ১৩২৮, ১৩৩৩ সন।

বার্ষিক সওগাত, ১৩৩৩ সন।

বার্ষিক মোহাম্মদী, ১৩৩৫ সন।

Dhaka University Institutional Repository

বুলবুল, ১৩৪০-১৩৪৫ সন।

মুকুর, ১৩৩৮ সন।

মিহির ও সুধাকর, ১৩০৭, ১৩০৯-১৩১৩ সন।

মাসিক মোহাম্মদী, ১৩৩৪-১৩৫৪ সন।

মোসলেম সুহৃদ, ১৩১৫ সন।

মোহাম্মদী (ঈদ সংখ্যা), ১৩৪২, ১৩৪৫ সন।

মোসলেম দর্পণ, ১৩৩২, ১৩৩৩, ১৩৩৪ সন।

মোসলেম ভারত, ১৩২৭, ১৩২৮ সন।

মোয়াজ্জিন, ১৩৩৫-১৩৪৫ সন।

মিল্লাত, ১৯৪৫, ১৯৪৬, ১৯৪৭ সাল।

যুগভেরী, ১৩৫০, ১৩৫১ সন।

রওশন হেদায়েত, ১৩৩২-১৩৪৫ সন।

লাঙ্গল, ১৩৩২ সন।

সত্যাগ্রহী, ১৩৩৩, ১৩৪৩-১৩৪৬ সন।

সাম্যবাদী, ১৩২৯-১৩৩১ সন।

সাধনা, ১৩২৬,১৩২৭,১৩২৮ সন।

সওগাত, ১৩২৬-১৩৫৪ সন।

সওগাত, (নারী সংখ্যা),১৩৩৬,১৩৪০,১৩৪২ সন।

সুধাকর, ১২৯৬ সন।

সুনীতি, ১৩৩৪ সন।

সবুজের সুর, ১৩৪৯ সন।

সহচর, ১৩২০,১৩২৮,১৩২৯ সন।

শরিয়ত, ১৩৩১,১৩৩২ সন

শিখা, ১৩৩৩,১৩৩৫,১৩৩৭,১৩৩৮ খৃষ্টাব্দ।

শরিয়তে-এসলাম,১৩৩৩-১৩৪২, ১৩৪৪, ১৩৪৫ সন।

হাফেজ, ১৮৯৭ সন।

হানাফী, ১৩৪২,১৩৪৩ সন।

হেদায়াত, ১৩৪২,১৩৪৩,১৩৪৫,১৩৪৬ সন।

Dhaka University Institutional Repository

২. সাক্ষাৎকার

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, 'সওগাত' সম্পাদক, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ঃ সওদাগর প্রেস, ঢাকা।

সময়কাল ঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২।

৩. সরকারী রিপোর্ট, রেকর্ডসমূহ।

Adam. William, *First Report on the State of Education in Bengal,* Published by the Order of Government. (Calcutta: G.H. Huttmann, Bengal Military orphan Press, 1835).

Second Report on the State of Education in Bengal, District of Rajshahi, Published by the Order of Government, 1836.

Third Report on the state of Education in Bengal, (Calcutta : G.H. Huttman, Bengal Military Orphan Press, 1838.

Adams Reports on Vernacular Education in Bengal and Behar. by Rev, J. Long (Calcutta: Printed at the Home Secretariat Press, 1868)

Annual Report on the Progress of Education, Rajshahi Division, 1917-18 (Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot, 1918).

Bengal District Gazetteers, Mymansingh. By F.A.Sachse (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1917).

Bengal District Administration Committee, 1913-1914, (Calcutta: Bengal Secretariat Press. 1915)

Census of India, 1901, Vol, VI. The Lower Provinces of Bengal and their feudatories. Part-I, Report by E.A. Gait, (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1902);

Indian Statutory Commission, Vol, VIII, Memorandum, Submitted by the Government of Bengal To the Indian statutory Commission, (London1930).

Primary Education in Bengal, (Calutta: Bengal Publicity Board, 1934).

Progress of Education in Bengal, 1902-03 to 1906-07. Third Quinquennial Review by W.W, Hornell (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1907).

Report on the Administration of Bengal, 1871-72, Cal: Printed at the Bengal Secretariat Press, 1872).

Report on the Census of Bengal, 1872 . By H.Beverly. (Calcutta : Printed at the Bengal Secretariat Press, 1872)

Report of the Moslem Education Advisory Committee, 1935. Government of Bengal (Alipore: Bengal Secretariat Press, 1935)

Report on the Public Instruction in Bengal for 1909-1910. (Calcutta : The Bengal Secretariat Book Depot, 1910)

Report on the Public Instruction in Bengal for 1917-1918, (Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot, 1919).

Dhaka University Institutional Repository

Report on the Administration of Bangal, 1880-81, (Calcutta : Printed at the Bengal Secretariat Press, 1881).

Report on the Administration of Bangal, 1884-85, (Calcutta : Printed at the Bengal Secretariat Press, 1886).

Seventh Quinquennial Review on the Progress of Education in Bengal for the years 1922-23 to 1926-27 by K.Zachariah. ((Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1928).

Supplement to the Progress of Education in Bengal 1912-13 to 1916-17, Fifth quinquennial Review (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1918).

The Calcutta Review. Vol.II, October-December. 1844, (Calcutta:1844).

The Bengal Presidency Moslem League Report for 1916-17 and Proceedings of the second Annual Session held on Burdwan on the 24th April 1916.

The Indian Annual Register, July-December 1946. Vol-II. Editor. Nripendra Nath Mitra, (Calcutta : Published By The Annual Register Office).

খ. সহায়ক উৎস

১. ইংরেজীতে লিখিত গ্রন্থসমূহ।

Ahmed, A.F. Salahuddin, Bangladesh : *Tradition and Transformation,* (Dhaka: University Press Limited, 1987)

Ansari, Iqbal A (ed.) *The Muslim situation in India,* (Dhaka: Academic Publishers, 1989)

Ahmed, Rafiuddin, *The Bengal Muslims 1871-1906: A Quest for Identity,* (Delhi: Oxford University Press: Oxford, New York, 1981)

Ahmed, Sufia, *Muslim Community in Bengal: 1884-1912,* (Bangladesh: Oxford University Press, 1974

Ahsan , Syed Qamarul, Birth of Pakistan-Step By Step, (Sylhet: 1952)

Aziz, K.K., *Ameer Ali : His Life and Work,* (Lahore : 1968)

Banerjee, Surendranath, *A Nation in Making*

Bolitho, Hector, *Jinnah : Creator of Pakistan,* (Karachi : John Murray, Allies Book Corporation, 1954).

Broomfield. J.H. *Elite Conflict in a Plural Society : Twentieth-Century Bengal,* (University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1968).

Callard, Keith, *Pakistan : A Political Study,* (London : George Allen and Unwin Ltd., 1957).

Chand, Tara, *History of the Freedom Movement in India,* Vol. Three and four (Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1972).

Coupland, Sir Reginald, *The Indian problem : 1833, 1935* (Oxford : At the Clarendon Press, first published : 1942).

Dhaka University Institutional Repository

Chatterji, Joya, *Bengal divided : Hindu Communalism and partition, 1932-1947,* (Cambridge University Press, 1995).

Chakraborti, Smarajit, *The Bengali press : 1818-1868, A Study in the Growth of Public Opinion,* (Calcutta: Firma KLM Private Limited, 1976).

Campbell Ker, I.C.S., James, *Political Trouble in India, 1907-1917,* (India : 1973)

Chirol, Valentine, *Indian Unrest,* (London : 1910)

De, Amalendu, *Roots of Separatism in nineteenth Century Bengal,* (Calcutta : Ratna Prakashan, 1974).

De, Amalendu, *Religious Fundamentalism and Secularism in India,* (India : Suryasena Prakashani, West Bengal, 1996).

Dodwell, H.H., *A Sketch of the history of India from 1858-1918,* (London : 1925)

Griffiths, C.I.E., Sir Percival, *The British Impact on India* (London : Frank Cass & Company, Ltd., 1965).

Gopal, Ram, *Indian Muslims : A Political History 1858-1947,* (Asia Publishing House, Bombay, Calcutta, NewDelhi, Madras, Lucknow, London, New York, 1959).

Hamid, Abdul, *Muslim Separatism in India : A brief Survey 1858-1947,* (Panjab : Oxford University press, 1967).

Hodson, H.V. *The Great Divide,* (Hutchinson & Co (Publishers) Ltd,. first published 1969).

Haq, Mushir U., *Muslim Politics in Modern India, 1857-1947,* (Meerut : Mecnakshi Prakashan, 1970)

Hardy, P., *The Muslims of British India,* (Cambridge : At the University press, 1972).

Husain, Dr. S. Sajjad (ed.) *East Pakistan : A Profile,* (Dacca : Orient Longmans Limited, 1962).

Hunter, W.W., *The Indian Mussalmans,* (Reprint Dhaka : Published by W. Rahman, 1975).

Kanitkar, V.P. (Hemant), *The Partition of India,* (Wayland : 1987).

Khan, Bazlur Rahman, *Politics in Bengal : 1927-1936,* (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1987).

Khan, Wali, Facts are facts : *The Untold story of India's Partition,* Translation by Dr. Syeda Saiyidain Hameed (Bangladesh : University Press Limited, 1987).

Kabir, Humayun, *Muslim Polities : 1906-42,* Second ed., (Calcutta : K.C. Banerjee, Gupta Rahman and Gupta, 1944).

N.S. Bose, *Indian Awakening and Bengal,* (Calcutta: 1976).

Dhaka University Institutional Repository

Pandey, B.N. *The Break-up of British India*, (London : macmillan, and St. martin's Press, New York : 1969).

Pirzada, Syed Sharifuddin, *Evolution of Pakistan*, (Lahore : 1963).

Philips, C.H., *The Evolution of India and Pakistan 1858 to 1947*, (Select Documents) (London : The English Language Book Society and Oxford University press, 1962_.

Philips, C.H. (ed), *The Partition of India : Policies and Perspectives (1935-1947*, (London : George Allen and Unwin Ltd, 1970).

Qureshi, I.H. (General Editor), *A short History of Pakistan*, (University of Karachi, 1967).

Rahman, Hossainur, *Hindu-Muslim Relations in Bengal 1905-47*, (Bombay : nachiketa Publicatioons Limited, 1974)

Qureshi, I.H. *The Struggle for Pakistan* (University of Karachi : 1965).

Rahim, Muhammad Abdur, *The Muslim Society and Politics in Bengal : 1757-1947*, (Published by the University of Dacca : 1978).

Rashid, Harun-or, *The Foreshadowing of Bangladesh : Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1936-1947*, (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1987)

R.C. Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*, Vol.I, p.433.

Sarkar, Chandiprasad, *The Bengali Muslims : A study in their politicization 1912-1929*, (Calcutta, new Delhi : K.P. Bagchi and Company, 1991).

Saiyid, Matlubul Hasan, *Mohammad Ali Jinnah : A Political Study*, Lahore : 1945 (First Edition).

Sen, Shila, *Muslim Politics in Bengal : 1937-1947*, (Impex India, New Delhi : 1976).

Saxena, Dr. Vinod Kumar, *The partition of Bengal : 1905-1911*, (Delhi:Kanishka Publishing House, 1987).

Symonds, Richard, *The Making of Pakistan*, (Karachi-Hyderabad : Allies Book Corporation, 1966).

Salik, Sultan Jahan (ed.), *Muslim Modernism in Bengal : Selected Writings of Delawarr Hosaen Ahmed Meerza 1840-1913.*, Vol. 1 (Centre for Social Studies, Dacca, University, 1980).

Tinker, Hugh, *India and pakistan*, (London and Dunmow : 1962)

Wolseley, Roland E. (ed.), *Journalism in Modern India*, (Asia Publishing House, Bombay, London, New York : First Edition,1 953).

Wasti, Syed Razi, *Lord Minto and the Indian Nationalist Movement : 1905-1910*, (Oxford : Clarendon Press, 1964).

Zaman, Dr.,Waheed-Uz, *Towards Pakistan*, (Lahore : Publishers United Ltd, 1969).

Dhaka University Institutional Repository

২. ইংরেজীতে লিখিত প্রবন্ধসমূহ

Husain, Dr. Syed Anwar, *Muslim communaism and Separatism in Colonial India,* ২৯ শে আগষ্ট, ২০০১ সালে Asiatic Society of Bangladesh সেমিনার-এ পঠিত।

Imam, Abu, 'Some Aspects of Muslim Politics and Personalities in India in the later Nineteenth Century', *Journal of the Institute of Bangladesh Studies,* Rajshahi University, Vol.II, 1977.

Khan, Muinuddin Ahmad, 'Muslim struggle for Freedom in Bengal', *East pakistan : A profile,* Edited By Dr. s. Sajjad Husain, (Orient Longmans Limited, Published 8th June, 1962).

Quaiyum, M. Nurul, 'Efforts of the Bengali Muslim Journalists to Promote Hindu-Muslim relations in Bengal in the first half of the Twentieth Century', *The Rajshahi University* Studies (Part A), Vol. XVI, 1988.

Role of the Azad in the Development of Muslim nationalism in Bengal : 1936-1940. Journal of the Pakistan Historical Society, April, 1992.

Rahman, Matiur 'The Simla Deputation, 1906', *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* Vol. XV, No.1, Published by the Asiatic Society of Pakistan.

Salik, Moulana Abdul majid, 'Growth of Muslim Journalism', *A History of the Freedom Movement,* Vol. III, 1906-1935. Part II, Prepared by the Board of Editors, Karachi : Pakistan historical Society, 1963.

Wadud, Kazi Abdul, 'The Musalmans of bengal', *Visva Bharati Quarterly,* Editor : Kshitis Roy, Vol. XIV, May-July, 1948.

৩. অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ

Quaiyum, M. Nurul, *Role of bengali Muslim Press in Awakening the Muslims of Bengal : 1900-1040,* Ph.D. Thesis, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi : 1990.

৪. বাংলায় লিখিত গ্রন্থসমূহঃ

আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র,* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯)।

ঐ, *স্বরূপের সন্ধানে,* (ঢাকাঃজাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯১)

ঐ, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য,* (ঢাকাঃ লেখক সঙ্ঘ প্রকাশনী, ১৯৬৪)

আহমদ, এ.এফ, সালাহউদ্দীন, *বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা গণতন্ত্র* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩)।

ঐ, *বাংলাদেশঃ অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ,* (ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০)।

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ, এ. এফ. সালাহউদ্দীন (সম্পাদিত), *কথ্য ইতিহাসের রূপরেখা*, কথ্য ইতিহাস প্রকল্পের সাক্ষাৎকার বিবরণীসমূহের সার-সংক্ষেপ, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ১৯৯১)।

আহমদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা*, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩)।

ঐ, *মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী ১৮৭৪-১৯৩৩ই*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯)।

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক*, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন)।

ঐ, *মুসলিম সম্পাদিত বাংলা সাময়িকপত্রে ধর্ম ও সমাজ-চিন্তা ১৯০১-১৯৪৭*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫)।

ঐ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকাঃ ১৯০৫-১৯৪৭*, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশঃ ১৯৯৫)।

ঐ, *ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী*, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশঃ ১৯৯১)।

ঐ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ্ঃ জীবন ও কর্ম*, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশঃ ১৯৮৬)।

আহমদ, *আবুল মনসুর, আমার-দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৫, তৃতীয় বর্ধিত মুদ্রণ)।

আহমদ, মুজফ্ফর, *কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা*, (মুক্তধারাঃ ১৯৭৩)।

আউয়াল, আবু হেনা আবদুল, *নজরুলের রাষ্ট্রচিন্তা ও রাজনীতি*, (ঢাকাঃ নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯৯)।

আজাদ, মওলানা আবুল কালাম, *ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম*, অনুবাদঃ আসমা চৌধুরী, লিয়াকত আলি, (ঢাকাঃ স্বপ্নিল প্রকাশনী, ১৯৮৯)।

আলী, মোবাশ্বের, *নজরুল ও সাময়িকপত্র*, (ঢাকা নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯৪)।

আলম, তাহ্মিনা, *বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙ্গালি মুসলিম নারীসমাজঃ ১৯০০-১৯৪৭*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮)।

ইসলাম, মুস্তাফা নূরউল, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমতঃ ১৯০১-১৯৩০*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭)।

ইসলাম, রফিকুল, *আবদুল কাদির ১৯০৬-১৯৮৪*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭)।

ইসলাম, আজহার, *মোজাম্মেল হক ১৮৬০-১৯৩৩*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)।

উমর, বদরুদ্দীন, *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন*, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৭)।

ওয়ালিউল্লাহ্, মোহাম্মদ, *যুগ-বিচিত্রা*, (ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৬৭)।

ওদুদ, কাজী আবদুল, *বাংলার জাগরণ*, (কলিকাতাঃ বিশ্বভারতী, ১৯৫৬)

করিম, সরদার ফজলুল (সম্পাদিত), *পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য*, (ঢাকাঃবাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৮)।

Dhaka University Institutional Repository

কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল (সংকলিত ও সম্পাদিত), *সাময়িকপত্রে সাহিত্যিক প্রসঙ্গ*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯০)।

কবিরাজ, নরহরি, *স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা*, (কলিকাতাঃ মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম প্রকাশ, ১৯৮৬)।

খান, মোশাররফ হোসেন (সম্পাদিত), *বাংলাভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮)।

গঙ্গোপাধ্যায়, মনোমহন, *বাংলার নবজাগরণের সাক্ষর*, (কলিকাতাঃ ১৯৬৩)

ঘোষ, বিনয়, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, ১ম খন্ড, (কলিকাতাঃ ১৯৬২)

চন্দ্র, বিপান, *আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ*, (কলকাতাঃ কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৯)।

চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী, *মুসলিম বাংলার মনীষা*, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বংলাদেশ, ১৯৮৭)।

চৌধুরী, আবুল আহসান, *মীর মশাররফ হোসেন ১৮৪৭-১৯১১*, (ঢাকাঃবাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)।

চট্টোপাধ্যায়, গৌতম (সম্পাদক), *ইতিহাস-চর্চাঃ জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা*, (কলকাতা, কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৫)।

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ*, (কলিকাতাঃ ১৯৭৭)

ছফা, আহমদ, *সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস*, (ঢাকাঃ বাংলাবাজার, ১৯৭৯)।

জাহাঙ্গীর, মুহম্মদ, *স্মরণীয় সাংবাদিক*, (ঢাকাঃ ইউনির্ভারসিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৫)।

জামান, লায়লা, *সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকাঃ ১৯১৮-৫০*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯)।

জামান, ডঃহাসান (সম্পাদিত), *শতাব্দী পরিক্রমা*, (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪)।

দত্ত, অমর, *উনিশ শতকের মুসলিম মানস ও বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫)*, (কলকাতাঃ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৫)।

দাস, নিতাই, *পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)।

দে,অমলেন্দু, *বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, (কলিকাতাঃ রত্না প্রকাশন, ১৯৭৪)।

ঐ, *পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক*, (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯)।

ঐ, *স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনাঃ প্রয়াস ও পরিণতি*, (কলিকাতাঃ রত্না প্রকাশন, ১৯৭৫)

দে, সুনীল কান্তি, *মুসলিম সমাজচিত্রঃ সাম্যবাদী সাময়িকপত্রে*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪)।

নাসিরউদ্দীন, মোহাম্মদ, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, (ঢাকা : সওগাত প্রেস, ১৯৮৫)।

ফারুকী, রশিদ আল, *বাংলার জাগরণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)।

ঐ, *ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯)।

ঐ, *বাংলা সাময়িক সাহিত্য ১৮১৮-১৮৬৭*, (কলিকাতাঃ বিশ্ব ভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫১)।

Dhaka University Institutional Repository

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, *বাংলা সাময়িকপত্রঃ ১৮১৮-১৮৬৮*, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, (কলিকাতাঃবঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ,১৩৭৯)।

বেগম, রাশিদা, *মোহাম্মদ মোদাব্বের ১৯০৮-১৯৮৪*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯০)।

বদিউজ্জামান, *ইসমাইল হোসেন শিরাজী ১৮৭৯-১৯৩১*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত), *সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম খন্ড)ঃ ১৮১৮-১৮৩০*, (কলিকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ,১৩৫৬)।

ঐ, দ্বিতীয় খন্ড ১৮৩০-১৮৪০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশকুমার, *জিন্নাঃ পাকিস্তান, নতুন ভাবনা*, (কলিকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯৪)।

মাহ্‌ফুজুল্লাহ, মোহাম্মদ, *মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন*, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন,১৯৮৩)।

মামুন, মুনতাসির, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)।

মুসা, মনসুর, *মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ১৮৮৫-১৯৬৯*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)।

মনির, শাহজাহান, *বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)।

মল্লিক, ডক্টর আজিজুর রহমান, *বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমানঃ ১৭৫৭-১৮৫৬*, দিলওয়ার হোসেন অনুদিত, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী,১৯৮২)।

মোদাব্বের, মোহাম্মদ, *ইতিহাস কথা কয়*, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮১)।

মান্নান, কাজী আবদুল, *আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা* (১ম খন্ড), (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ বাঙলা বিভাগ, ১৯৬১)।

মান্নান, মোহাম্মদ সিরাজ, *বাংলার মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক দলীলঃ১৯৩৬-৪৭*, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮)।

রহমান, চৌধুরী শামসুর, *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র* (ঢাকাঃ পাকিস্তান প্রকাশন, ১৯৬৬)

রহমান, এ.টি.এম. আতিকুর, *বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁঃ ১৯০৫-১৯৪৭*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী,১৯৯৫)।

রহমান, ডঃ ফজলুর, *তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বঃ ১৯৪৭-৭১*, অনুবাদঃ মুহাম্মদ বাকের হোসাইন, (প্রকাশকঃ এম.এ.গণি, ১৭২/১, ওয়াপদা রোড, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা ১৯৯৮)।

রায়,শান্তিময়, *ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ও মুসলিম অবদান*, (মুক্তধারাঃ১৩৯৫)।

রহিম, ডক্টর মুহম্মদ আবদুর, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৭৫৭-১৯৪৭*, (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৪(চতুর্থ প্রকাশ)।

Dhaka University Institutional Repository

রহিম, এনায়েতুর, *বাংলার স্ব-শাসন, ১৯৩৭-১৯৪৩*, অনুবাদঃ জাকারিয়া শিরাজী, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০১)

রশীদ, ইমানুর, *খালেকদাদ চৌধুরী ১৯০৭-১৯৮৫*, (ঢাকাঃ বাংলাএকাডেমী, ১৯৯৭)।

শর্মা, নন্দলাল, *মুহম্মদ নূরুল হক ১৯০৭-১৯৮৭*, (ঢাকাঃ বাংলাএকাডেমী, ১৯৯৩)।

শামসুদ্দীন, আবু জাফর, *আত্মস্মৃতি*, প্রথম খন্ড, (প্রকাশকালঃ ১৯৮৯)।

শাসমল, বিমলানন্দ, *ভারত কী করে ভাগ হলো*, (কলকাতাঃ হিন্দুস্তান বুক সার্ভিস, ১৯৯১)।

ঐ, *স্বাধীনতার ফাঁকি*, (কলকাতাঃ হিন্দুস্তান বুক সার্ভিস, ১৯৯১)।

শামসুদ্দীন, আবুল কালাম, *দৃষ্টিকোণ*, (ঢাকাঃ ইস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৬)।

সৈয়দ, আবদুল মান্নান, *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ১৮৯৬-১৯৫৪*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪)।

হক, মুহাম্মদ ইনাম-উল, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন ১৭০৭-১৯৪৭*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ,১৯৯৩)।

হক, ফজলুল, *মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী ১৮৫৮-১৯২০*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯)।

হক, খোন্দকার সিরাজুল, *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ ঃ সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪)

হামিদ,মোহাম্মদ আবদুল, *কালজয়ী নূরুল হক*, (সিলেটঃ কাফেলা প্রকাশনী, ১৯৮৯)।

হাশিম, আবুল, *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, (ঢাকাঃনওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৭)।

হাসান, দেলওয়ার, *সৈয়দ এমদাদ আলী ১৮৭৬-১৯৫৬*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭)।

হাসানউজ্জামান, *উপমহাদেশে রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তাঃ স্রোতের বিপরীতে মূল্যায়ন*, (ঢাকাঃ বুক হাউস, ১৯৮৯)।

হোসেন, ইমরান, *বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবীঃ চিন্তা ও কর্ম ১৯০৫-১৯৪৭*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী,১৯৯৩)।

হোসেন,শওকত আরা, *বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ১৯২১-১৯৩৬ঃ অবিভক্ত বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ১৯৯০)।

৫. বাংলায় লিখিত প্রবন্ধসমূহঃ

আহমদ,আ,ফ, সালাহউদ্দীন, 'উনিশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও কর্মকান্ড', *বাংলাদেশের ইতিহাসঃ ১৭০৪-১৯৭১*, প্রথম খন্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস, সম্পাদকঃ সিরাজুল ইসলাম, (এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯২)।

আহমদ, ওয়াকিল, 'বাংলার মুসলিম এলিটঃ উনিশ শতকের প্রথমার্ধ', 'সুন্দরন, সম্পাদকঃ মুন্তাফা নূরউল ইসলাম, বসন্ত সংখ্যা ১১শ বর্ষ/৩য় সংখ্যা/ফাল্গুন/১৪০৩-বৈশাখ ১৪০৪; ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল ১৯৯৭)

Dhaka University Institutional Repository

ওদুদ, কাজী আবদুল, 'বাংলার মুসলমানের কথা', *বাংলাদেশঃ বাঙ্গালী আত্ম-পরিচয়ের সন্ধানে*, সম্পাদনাঃ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (ঢাকাঃ ১৯৯০)।

কাইউম, মুহম্মদ নূরুল 'বঙ্গীয় মুসলিম সাংবাদিকতার উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য', *বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, চতুর্দশ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ/১৪০৩,ডিসেম্বর ১৯৯৬)।

খান,মুজীবুর রহমান, 'পাকিস্তানের সৃষ্টি', *পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য*, সম্পাদনাঃ সরদার ফজলুল করিম, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮)।

গফুর, আবদুল, 'পাকিস্তান আন্দোলন', *শতাব্দী পরিক্রমা*, সম্পাদকঃ ডঃ হাসান জামান, (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান,১৯৭৪)।

চৌধুরী, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'উনিশ'শ ছয় থেকে ছত্রিশ' *শতাব্দী পরিক্রমা*, সম্পাদকঃ ডঃ হাসান জামান, (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪)।

দে, অমলেন্দু, 'মুসলিম লীগ রাজনীতিঃ কয়েকটি প্রশ্নের বিশ্লেষণ' *ইতিহাস অনুসন্ধান-৫*, সম্পাদকঃ গৌতম চট্টোপাধ্যায়, (১৯৯০)।

ঐ, 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফজলুল হকের আবির্ভাব', *শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক*, সম্পাদকঃ মুহম্মদ আবদুল খালেক, (ঢাকাঃ ১৯৭৬)।

ঐ, 'ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুসলিম সমাজ', *চতুরঙ্গ* ৪৮বর্ষ/৭ম সংখ্যা/কার্ত্তিক/১৩৯৪/ কলিকাতা/নভেম্বর/১৯৮৭।

মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুগোপাল, 'গান্ধী, দেশবন্ধু ও অসহযোগ', *ইতিহাস অনুসন্ধান-৪*, সম্মাদকঃ গৌতম চট্টোপাধ্যায়, (কলিকাতাঃ পশ্চিম বঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ১৯৮৯)।

সরকার, চন্ডী প্রসাদ, 'আল-এসলাম' ও বাঙালী উলেমা ভাবনা-চিন্তা', *ইতিহাস অনুসন্ধান-৩*, সম্পাদকঃ গৌতম চট্টোপাধ্যায়, (কলিকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ১৯৮৮)।

ঐ,'ইংরেজ-আনুগত্য নয়, ইংরেজ বিরোধিতাঃ নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাঙালী মুসলমান, ১৯১২-১৯১৮', *ইতিহাস-অনুসন্ধান-২*, সম্পাদকঃ গৌতম চট্টোপাধ্যায়, (কলিকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ,১৯৮৭)।

সরকার, প্রসাদ, 'বেঙ্গল প্যাক্ট ও বাঙালী মুসলমান', *ইতিহাস-অনুসন্ধান* , সম্পাদকঃ গৌতম চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিম বঙ্গ ইতিহাস সংসদের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাবলী, (কলকাতাঃ কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, ১৯৮৬)।

হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার, 'বঙ্গভঙ্গ রদের প্রক্রিয়াঃ শাসনতান্ত্রিক বিশ্লেষণ', *বঙ্গভঙ্গ*, সম্পাদকঃ মুনতাসীর মামুন, (সমাজ নিরীক্ষা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

রহিম, এনায়েতুর 'বাংলার রাজনীতিতে নেতৃত্বের সংকট', *সুন্দরম*, সম্পাদকঃ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, শরৎ সংখ্যা/৭ম বর্ষ/১ম সংখ্যা/ভাদ্র-কার্ত্তিক' ৯৯; আগষ্ট অক্টোবর' ৯২)